পরাশর
সমগ্র
pathagar.net
প্রেমেন্দ্র মিত্র

হার মানলেন পরাশর বর্মা

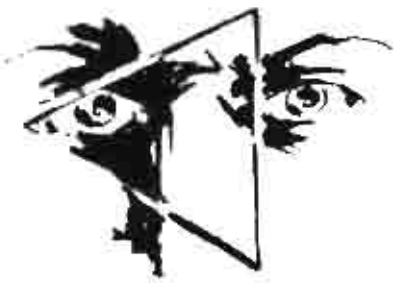

pathagar.net

হার মানলেন পরাশর বর্মা

নেহাত সে বয়সটা পার হয়ে এসেছি, তাই, নইলে চোখ-মুখ নিশ্চয় লাল হয়ে উঠত, আর সেই সঙ্গে নাড়িটা প্যাসেঞ্জারের বদলে মেল ট্রেন হয়ে আর থামতে চাইত না।

তা সত্ত্বেও যা দেখছি চোখ দুটো তাতে আঠা দিয়েই আটকে থাকত বোধহয়। নামাতে পারতাম বলে তো মনে হয় না।

এখনও যে গঁদের চেয়ে জোরালো ফেভিকল গোছের কিছুতে চোখটা লেপটে থাকতে চাইছিল না, তা নয়। তবে তারই সঙ্গে অস্বস্তি ক্ষোভ আর বিরক্তির মিশেল থাকার দরুন দুরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে মুখটা ঘরের ভেতর ঘুরিয়ে ঝংকার দিতে পারলাম, 'এই দেখবার জন্যে রাত বারোটায় তুমি আমায় এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছ?'

ঝংকারটা যার বিরুদ্ধে দেওয়া সে তখন বেডল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নিজের বিছানার ওপরই উপুড় হয়ে শুয়ে কবিতার মিলই খুঁজছে বোধহয়।

বেশ অন্যমনস্কভাবে আমার ক্ষুব্ধ অভিযোগের উত্তরে কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। কেন? দেখতে পাচ্ছ না কিছু?'

'পাচ্ছি! পাচ্ছি!' ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'কী দেখতে পাচ্ছি তা জানো?'

'হয়ে গেছে! মার দিয়া কেল্লা!'

এ আবার কী রকম জবাব? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি পরাশরের? একটু উদ্‌বেগ নিয়েই তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বাজে বকছ?'

'বাজে বকব কেন?' পরাশর সোৎসাহে বিছানার ওপর উঠে বসল। 'ওই---কেল্লা দিয়েই কেল্লা ফতে।'

'তার মানে?'

আমি ক্ষুব্ধ হলেও রীতিমতো বিমূঢ়।

'তার মানে,' পরাশর আমায় ধাঁধাটা ব্যাখ্যা করে শোনালে, 'কেল্লার মধ্যেই এমন আটকে পড়েছিলাম যে বেরোবার রাস্তা পাচ্ছিলাম না। শেষকালে অমন একটা কেল্লা বসিয়েও ঘষে তুলতে হবে বলে ভয় হচ্ছিল।'

পরাশরের ব্যাখ্যাটা যে তার ধাঁধার চেয়েও ধোঁয়াটে! সে কি কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলছে? কিন্তু তা নিয়েও এমন উদ্ভট প্রলাপ তো তার মুখে শুনিনি কখনও!

যেমন বিরক্ত তেমনই হতভম্ব হয়ে প্রায় ধমকের সুরে তাই বললাম, 'কেল্লা বসানো, তাতে আটকানো, তা আবার ঘষে তোলা—কী সব আবোলতাবোল বকছ?'

'এই সোজা কথাগুলো তোমার কাছে আবোলতাবোল মনে হচ্ছে?' পরাশর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে আমার দিকে তাকাল। 'লাইনটা শোনো, তা হলে বুঝতে পারবে। "তাসের ঘর তো নয়। লোহার এ কেল্লা।" এমন একটা চমক দেওয়া পদ মাথা থেকে বার হবার পর একেবারে ফাঁপরে পড়ে গেলাম।'

'কেন, কেল্লার মিল খুঁজে পাচ্ছিলে না?' পরাশরের মিলের দুর্ভিক্ষে অবাক হয়ে বললাম।

'আহা, মিল খুঁজে পাব না কেন?' পরাশর যেন অপমানিত হয়ে বললে, 'কেল্লার সঙ্গে সোজা

pathagar.net

মিলই তো রয়েছে জেল্লা। কিন্তু শুধু মিল হলেই তো হবে না, মানেও তো চাই।'

'চাই নাকি?'

'নিশ্চয় চাই।' আমার বিদ্রূপের খোঁচাটুকু গ্রাহ্য না করে পরাশর উৎসাহভরে বললে, 'সেই মানে আর মিল একাধারে পেয়ে গিয়েই তো বলছি, কেল্লা ফতে! শুনবে পরের লাইনটা?'

কত যেন আমার সম্মতির অপেক্ষা। আমি শুনব না বললেই যেন সে থেমে যাবে! গড়গড় করে পরাশর তার কবিতার দুটো লাইনই পর পর এবার আউড়ে গেল—

'তাসের ঘর তো নয়। লোহার এ কেল্লা।
গাল দিয়ে গলাবি কি? যত খুশি চেল্লা।'

আমার মুখে এ হেন কবিতার প্রতিক্রিয়াটা বোঝবার চেষ্টা করে পরাশর দু-সেকেন্ড থেমে বললে, 'কেল্লার সঙ্গে ওই চেল্লাই হল মোক্ষম মিল।'

অন্য সময় হলে ওই মোক্ষম মিল আর কবিতা শুনেই হয়তো থ হয়ে থাকতাম আমি, কিন্তু তখন মনের ক্ষুব্ধ অভিযোগটা ভেতর থেকে ঠেলছে। তেতো গলাতেই বললাম, 'তোমার কবিতা তো শুনলাম। আমার কথাগুলো কানে গেছে কিছু?'

'বা! কেন যাবে না? রাত বারোটায় কেন তোমায় দূরবিন নিয়ে ওই ব্যালকনিতে লুকিয়ে দাঁড়াতে বলেছি তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলে? এর আর জিজ্ঞাসা করবার কী আছে? দাঁড়াতে বলেছি দূরের ওই স্কাইস্ক্রেপারটার চুড়োর ফ্ল্যাটটার দিকে নজর রাখতে। তা দেখতে পেলে তেমন কিছু?'

'হ্যাঁ, পেলাম।' প্রায় খিঁচিয়ে উঠলাম, 'কী দেখতে পেলাম তা জানো?'

'আহা, দূরবিন তো আর আমার চোখে নেই। তুমি না বললে জানব কী করে?'

'তা হলে যা দেখেছি তা এককথায় বলছি শোনো। দেখলাম একটা আধা-উলঙ্গ মেয়ের বেহায়াপনা।'

পরাশর আমার মুখ থেকে এরকম একটা খবর নিশ্চয় আশা করেনি। সে-ও খানিক যেন হতভম্ব হয়ে থেকে চাপা গলায় সচকিত হয়ে বললে, 'জ্যানেট?'

'হ্যাঁ, তোমার জ্যানেট, যমুনা, নাজমা যে নামই হোক,' বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললাম, 'এবার কলকাতা থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ ভূপাল হয়ে এই দিল্লি পর্যন্ত যাঁর পেছনে ঘোড়দৌড় করিয়ে এনেছ, সেই বহুরূপিণীর কথাই বলছি। তিনি গত আধ ঘণ্টা ধরে তাঁর বারোতলার সুইট-এর ভেতর, একবার জানলায় দাঁড়ালেন, একবার ড্রেসিং টেবলে গিয়ে হেলেদুলে অঙ্গভঙ্গি করে নিজেকে নিরীক্ষণ করলেন। খানিক ফ্রি-হ্যান্ড না যৌগিক জানি না দেহলতা পাকানো দোমড়ানো ব্যায়াম করলেন—'

'তা তিনি নিজের খুশিতে যা-ই করুন না,' পরাশর আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলে, 'তাতে দোষের কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'চোখে দূরবিন লাগিয়ে আমার মতো খাড়া পাহারায় থাকতে হলে পেতে।' ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'তিনি যা যা করলেন সব টপলেস অবস্থায়।'

পরাশরের মুখে চোখে যে চমকটা আশা করেছিলাম তা ঠিক ফুটল কি?

ক-সেকেন্ড মুখে কোনও রা অবশ্য শোনা গেল না। তারপর আমার দিকে একটু কেমন বেয়াড়াভাবে চেয়ে বললে, 'তা বারোতলায় নিজের ঘরে কার জন্যে সে আব্রু রাখতে যাবে? সে তো জানে না, কেউ তার ঘরে দূরবিন কষে দাঁড়িয়ে আছে!'

শেষের মন্তব্যটা রীতিমতো হিটিং বিলো দ্য বেল্ট। তবু সেটা আর পরাশরের চোখে কৌতুকের ঝলকানিটুকু তখনকার মতো অগ্রাহ্য করে বললাম, 'তা না জানতে পারেন, কিন্তু তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও প্রবাল দ্বীপের একলা বাসিন্দা তো নন। আলো না নেভান, জানলাগুলো বন্ধ করতে কী হয়েছিল? তিনি যে শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই বিছানার ওপর

একবার উপুড় একবার চিত হয়ে গড়াগড়ি করতে করতে ফোন নিয়ে—'

আর কিছু বলার সুযোগ হল না।

'ফোন!' পরাশর যেন ককিয়ে উঠল, 'ফোন করেছে জ্যানেট? তা তো এতক্ষণ বলোনি?'

কোথায় গেল গলার সেই চাপা ঠাট্টার সুর! চোখে মুখে সেই একটু হাসির ঝিলিক! এক মুহূর্তে পরাশর একেবারে অন্য মানুষ। ঢিলে ধনুকের ছিলে হঠাৎ যেন টান করে বাঁধা।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই পরাশর গায়ের গেঞ্জিটার ওপর হাওয়াই শার্টটা চাপিয়ে ফেলেছে। তারপর আমায় টেনে নিয়ে একেবারে বাইরের করিডরে। বারান্দার টানা কাচের পাল্লা দুটো কোনওরকমে বন্ধ করে তার ওপর ভারী পরদাটা টানবার সময়ও পাইনি।

'থাক, থাক! যেমন আছে তেমনই থাক' বলে পরাশর তখনই আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলেছে, 'আমাদের কামরায় দূরবিন কষেও কেউ কিছু দেখতে পাবে না। সুতরাং পরদা না টানলেও চলবে।'

কী ভাগ্যি বেরোবার দরজাটায় ইয়েল লক। তালা-চাবি লাগাতে তাই সময় নষ্ট করতে হল না। পাল্লা দুটোয় টান দিতেই সে কাজ সারা হল।

তবু, যেটুকু দেরি দরজা টানতে আমার হয়েছে, তারই মধ্যে পরাশর প্রায় ছুটে লিফটের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বোতাম টেপা শুরু করেছে। একটা মুহূর্তও তার নষ্ট করবার নেই। পারলে সে যেন এই ন-তলা থেকে ঝাঁপ দিয়েই নীচে পড়ে।

ভাগ্যটা তখনকার মতো ভাল। পরাশরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই লিফটটা নীচে থেকে উঠে এসে থামল।

লিফটম্যানের তো হবারই কথা, আমিই পরাশরের কাণ্ড দেখে তখন অবাক। লিফটের দরজাটা খোলার অপেক্ষা পর্যন্ত করার সময় আর যেন নেই। কোল্যাপসিবল দরজাটা পুরো টানতে না টানতেই সে ভেতরে যেন ঝাঁপিয়ে গিয়ে ঢুকল। ঢুকেই তৎক্ষণাৎ বন্ধ করবার জন্যে দরজায় টান। আমি ভেতরে ঢুকতে পারলাম কি না পারলাম সে বিষয়েও যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কোনওরকমে শরীরটা তখন ভেতরে গলিয়েছি। না গলাতে পারলে দরজাতেই বোধহয় চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যেতাম। ভেতরে গিয়ে টাল সামলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দেখলাম লিফট নীচে নামতে শুরু করেছে। লিফটম্যান নয়, নীচে নামবার বোতাম টিপেছে পরাশর নিজেই।

নামতে নামতে আড়চোখে একবার লিফটম্যানের মুখটা দেখে নিলাম। রাতদুপুরে এমন উন্মাদের পাল্লায় পড়ে তার অবস্থাটা কী হয়েছে তাই বোঝবার কৌতূহল। সে কৌতূহল কিন্তু মিটল না।

লিফটম্যান একেবারে যেন কলের পুতুল। ভাবলেশহীন মুখে নিজের জায়গায় কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হয় লিফট নামানো-ওঠানোর চাকরিতে এরকম পাগল দেখা তার কাছে নতুন নয়, নতুবা হোটেলের বোর্ডারের সাত খুন মাপ এই নির্দেশের শাসনেই নিজেকে নির্বিকার করে রেখেছে।

হোটেলের বয় বা লিফটম্যান ইত্যাদির বেলায় সাধারণত উর্দিটাই আমাদের চোখে পড়ে। নেহাত অসাধারণ কোনও বিশেষত্ব না থাকলে চেহারাটা আমরা তেমন লক্ষই করি না। বেঢপ বেঁটে কি লম্বা, দারুণ মোটা কি রোগা এসব একটু-আধটু খেয়াল করলেও মুখের আদল আমাদের নজরের বাইরে থাকে।

অবস্থাটা একটু অস্বাভাবিক ও লিফটম্যানের আত্মসংযমটা একটু বেশিরকম তারিফ করবার মতো অদ্ভুত না হলে উর্দি ছাড়িয়ে তার মুখ পর্যন্ত এবারেও দৃষ্টি নিশ্চয় পৌঁছত না।

মুখের দিকে চেয়ে তার যান্ত্রিক নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবের সঙ্গে আর-একটা ব্যাপারে কিন্তু একটু বিস্মিত হলাম। চেহারায় অবশ্য বিশেষত্ব বলে কিছু নেই—সাধারণ দোহারা লম্বা গড়ন, তামাটে রংয়ের দাড়ি-গোঁফওয়ালা মুখটা এদেশের এই ধরনের পেশার আরও দশজন থেকে

এমন আলাদা কিছু নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখটা চোখে পড়বামাত্র এক মুহূর্তের জন্য অমন দারুণ চেনা লাগল কেন!

লাগল অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যই শুধু। প্রথম চমকের পরই আবার ভাল করে চেয়ে দেখে আগের মনে হওয়াটা নেহাত ভুল বলেই বুঝলাম।

না। ও মুখ কোথাও আমি দেখিনি। দেখবার কথাও নয়।

হোটেলের এই লিফটে এ ক-দিনে যে দু-জনকে বেশির ভাগ দেখেছি, ভাল করে লক্ষ না করলেও তাদের কারও সঙ্গে এই লোকটির মিল নেই।

সেদিক দিয়ে লিফটম্যান হিসাবেও লোকটা বরং একেবারে নতুন। হয়তো নাইট শিফটেই তার কাজ। এর আগে এত রাত্রে কোনওদিন লিফট ব্যবহার করতে হয়নি বলে তাকে দেখিনি।

এরকম লোককে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যও অমন চেনা বলে ভুল করাটাই আশ্চর্য। কেন অমন ভুল হল তা নিয়ে ভাববার সময় অবশ্য পেলাম না।

লিফট তখন নীচে পৌঁছে গেছে। খাঁচাটা নীচের মেঝে ছুঁতে না ছুঁতে নিজেই টান দিয়ে দরজাটা খুলে পরাশর ছুটে বেরিয়ে গেল আমার দিকে শুধু একটু চোখের ইশারা ছুড়ে দিয়ে।

রাত প্রায় একটা বাজতে চলেছে। হোটেলের লবি নির্জন নিস্তব্ধ। রিসেপশন কাউন্টারের পেছনে একজন কর্মচারী শুধু তার উঁচু আসনে বসে একটা খোলা খাতায় কী সব টুকছে।

পরাশর আর তার পেছনে আমার প্রায় ছুটে যাওয়ার শব্দ পুরু কার্পেটে বেশ কিছুটা চাপা পড়লেও নিস্তব্ধ লবিতে একেবারে অশ্রুত রইল না।

তবু শব্দে যতটা নয়, হোটেল-ক্লার্ক আমাদের ছোটার ধরনে তার চেয়ে বেশি সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে উদ্‌বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে স্যার? আমি সাহায্য করতে পারি?'

সে প্রশ্নের উত্তর আর হোটেল-ক্লার্ক পেল না। উত্তর যার পক্ষে দেওয়া সম্ভব সেই পরাশর তখন হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে ড্রাইভওয়েতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে ঈষৎ হাঁপাতে হাঁপাতে আমিও।

নেহাত কাউন্টার ছেড়ে আসা সম্ভব নয় বলেই বোধহয় হোটেল ক্লার্ক আমাদের পিছু নেয়নি। কিন্তু বাইরে হোটেলের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ লবির কাউন্টার থেকে তার ব্যাকুলভাবে ফোনে কাউকে ডাকার আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছিলাম।

'হ্যালো, হ্যালো—হ্যাঁ হ্যাঁ, মেহরা বলছি, মেহরা।'

বাকিটা আর শোনবার অবসর মিলল না।

টুলে বসে হোটেলের নাইট ওয়াচম্যানের একটু বোধহয় ঝিমুনি এসেছিল। আমাদের দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসাটা প্রথমে সে ঠিক টের পায়নি।

কিন্তু সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যেই চটকা ভেঙে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে তখন এত রাত্রে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে-বার হওয়া বোর্ডারদের একমাত্র প্রয়োজন কী হতে পারে তা অনুমান করে নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তার হুইসল বাজাতে শুরু করেছে।

হুইসল বাজানোটা অবশ্য ট্যাক্সির জন্য। হোটেল কম্পাউন্ডের বাইরে দিনে-রাত্রে প্রায় সব সময়েই কিছু-না-কিছু ট্যাক্সি অপেক্ষা করে থাকেই। হোটেলের দরোয়ানের হুইসলই তাদের ডাকার সংকেত।

রাতের দরোয়ানের হুইসলে কিন্তু কোনও ট্যাক্সি এল না। তার বদলে যা এল সে গাড়ি আর তার ড্রাইভারকে দেখে আমি চমকিত।

গাড়িটি বিদেশি তো বটেই, তার ওপর ঠিক যাকে বলে চলতি বছরের লেটেস্ট মডেল না হলেও মোটরের রাজ্যের এমন একটি খানদানি ঘরানার যে শুধু বাইরের গড়ন দেখেই তার বিরল আভিজাত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কিন্তু দরোয়ানের হুইসলে হঠাৎ এরকম গাড়ির উদয় হবার মানে কী? নিজের কাগজের

জন্যই দুনিয়ার মোটর ব্যবসা সম্বন্ধে একটা টানা ফিচার লেখবার দরুন গাড়িটাড়ি সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল হতে হয়েছে। লম্বা নিচু বিশেষ গড়ন আর পেছনে এরোপ্লেনের ডানার মতো কানা-তোলা চেহারা দেখেই গাড়িটা ক্রাইসলার ইম্পিরিয়াল বলে সন্দেহ হল। দিল্লি শহরে কেন, বোম্বাই কলকাতা মাদ্রাজ মিলিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষেও এ গাড়ির ক'টা দোসর আছে তা ভাববার বিষয়।

সেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে আর কেউ নয়, দিভেচা। দিভেচারও এ ব্যাপারের মধ্যে এমন ঘড়ি ধরে যথাসময়ে আবির্ভাব হয় কী করে?

সমস্ত ব্যাপারটা তা হলে কি আগে থাকতে সাজিয়ে প্রস্তুত করে রাখা?

দিভেচা গাড়ির দরজা খুলে, নীরবে মুখে একটু রহস্যময় হাসি মাখিয়ে, যেন অনুগত ড্রাইভারের মতো তখন দাঁড়িয়ে।

পরাশরের সঙ্গে সামনের সিটে দিভেচার পাশে উঠে বসলাম। তিনজন সওয়ারি স্বচ্ছন্দে বসবার মতোই প্রশস্ত সিট।

রাতের দরোয়ানের বিমূঢ় সেলামের সামনে দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে গাড়িটা বাইরের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর মুখ খুলতে গিয়ে নিজেকে রুখতে হল। পরাশর যেরকম গম্ভীর উদ্‌গ্রীব মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, আর দিভেচা যেভাবে একেবারে তন্ময় হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে তাতে বাক্যালাপের মেজাজ বা ফুরসতও তাদের নেই বলেই মনে হল।

কোথায় কেন যাচ্ছি ভাল করে না বুঝে দু-জনের মাঝখানে বসে দিভেচার এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব আর তার আগের খানিকটা খাপছাড়া হলেও ধারাবাহিক ব্যাপারগুলো ভেবে নেবার চেষ্টা করলাম।

মনের প্রথম প্রশ্ন অবশ্য দিভেচাকে নিয়ে।

দিভেচা মানেই তো গোলমেলে কিছু। শুধু গোলমেলে নয়, একেবারে খোদ দিল্লির টনক নড়বার মতো ব্যাপার।

দিভেচা পরাশরের পুরনো বন্ধু। বলতে গেলে প্রায় নীচের ধাপ থেকে শুধু নিজের কৃতিত্বে প্রাদেশিক সব বেড়া টপকে একেবারে কেন্দ্রের ওপর সারিতে পৌঁছেছে। এখন কোনও বাঁধাধরা বিভাগও নেই। ইংরেজিতে যাকে ট্রাবল শুটার বলে, ও তা ই। যখন যেখানে খুব বড়গোছের কোনও সমস্যা দেখা দেয়, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স থেকে বেশির ভাগ, আর-কিছু না হোক, শুধু সরেজমিন তদারকিতে যে যায় সে হল দিভেচা।

দিভেচার সঙ্গে আমার আলাপ খুব কম দিনের নয়। বোম্বাইয়ে একরকম বলতে গেলে শুধু নাকে শুঁকে পরাশর যেবার ভারতবর্ষের একটা বড় গুপ্তচর চক্রের ঘাঁটি বার করে ফেলে, সেবারে দিভেচাই ছিল তার সরকারি সহায়।

দিভেচা মহারাষ্ট্র সরকারের অধীনে সে পদ থেকে দিল্লির সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্সে উঠে আসবার পর দু-চারবার তার সঙ্গে যে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তা সবই একটা না একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে।

আজ এত রাত্রে আমাদের হোটেলের বাইরে শুধু যেন আমাদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় এমন একটা রাজকীয় গাড়ি নিয়ে তার তৈরি থাকা নেহাত আকস্মিক নিশ্চয় নয়। কিন্তু কারণটা তার কী হতে পারে?

জ্যানেট, নাজমা বা যমুনা—নাম যা ই হোক, ওই বহুরূপিণীর সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত বলেই ধরে নিতে হয়। আজ তার ফোন করার খবরটা পেয়েই পরাশরের প্রায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে বার হওয়ার সঙ্গে ঘটনার একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়।

কিন্তু সম্পর্কটা এমন কী হতে পারে যার জন্য দিভেচাকে ক্রাইসলার ইম্পিরিয়াল নিয়ে রাত বারোটার সময় আগে থাকতে অপেক্ষা করতে হয়?

pathagar.net

রাগ করে তখন হোটেলের কামরায় পরাশরকে যা বলেছি সে কথাটা মিথ্যে কিছু নয়। সত্যিই মেয়েটির পেছনে সেই কলকাতা থেকে বোম্বাই ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ ভূপাল আমরা গত পনেরো দিন ছিনেজোঁকের মতো লেগে আছি। কিন্তু অনুসরণটা পরাশরের একরকম মজার খেয়াল বলেই তো এ পর্যন্ত মনে হয়েছে। স্বয়ং দিভেচার নাক গলানো দরকার হয় এমন গুরুতর কিছুর আভাস তো ব্যাপারটায় এ পর্যন্ত পাইনি।

অনুসরণের পালাটা শুরু হয় সেই কলকাতায়।

সেদিন বিকেলবেলা কাগজের কাজ সেরে নিজের ঘরে গিয়ে সবে এক পেয়ালা কফিতে মুখ দিয়েছি, এমন সময় ফোন।

বিরক্ত হয়েই ফোনটা ধরতে গেলাম।

অফিসে আমার কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে যে, বিকেলের কাজ শেষ করবার পর রাত্তির আটটার আগে কোনও ফোন আমার ভেতরের ঘরে চালান করবে না। আমায় এখন পাওয়া যাবে না বলে অফিস থেকেই ফোন কেটে দেবে। অফিসের পর এই তিনটে ঘণ্টা আমি সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে বিশ্রাম করতে চাই। আমার আত্মীয় বন্ধুরা সবাই সে কথা জানে ও মানে। যারা জানে না সেই নাছোড়বান্দা হবু লেখকদের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমার কড়া নির্দেশ অমান্য করে কেন যে কানেকশনটা আমার ভেতর মহলে দেওয়া হয়েছে, ফোন তুলেই তা বুঝলাম।

ফোনে পরাশরের গলা এবং সে গলায় প্রথমেই তীব্র অভিযোগ, 'কী করছিলে কী? তাড়াতাড়ি এসে ফোনটা ধরতে পারো না! আর তুমি কোন শাহানশাহ খাঞ্জা খাঁ মিনিস্টার বাহাদুর যে পাঁচ দফা বেজা না ডিঙোলে তোমার নাগাল পাওয়া যায় না!'

হেসে বললাম, 'মিনিস্টার ছাড়া সাধারণ নাগরিকদেরও দু-দণ্ড একটু নিরিবিলিতে থাকবার অধিকার কি নেই? তুমি তো জানো এই সময়টায় আমি বাইরের কোনও ফোন ধরি না! অবশ্য—

'থামো এখন,' পরাশর আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, 'আজকের অমৃতবাজারের পার্সোন্যাল কলামের বিজ্ঞাপনগুলো দেখো। সব দেখতে হবে না। ওপরের দুটো বিজ্ঞাপনের পরেই তৃতীয়টার কথা বলছি। বিজ্ঞাপনটা দেখে যা লেখা আছে এখুনি করবে। ঠিকানা ওখানেই দেওয়া আছে। দেরি কোরো না। আধঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছনো চাই।'

'আরে, শোনো শোনো—'

অস্থির হয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

কিন্তু কে শুনছে? পরাশর তখন ওধারে ফোনটা নামিয়ে দিয়েছে।

পরাশরের এ অন্যায় আবদারে দস্তুরমতো রেগে গিয়ে তার নম্বরটা আবার ডায়াল করলাম তক্ষণাৎ।

কিন্তু ফোন কি গাছের ফল যে ইচ্ছে হলেই পাড়া যায়? নেহাত কপালজোর আর দৈবের দয়া না হলে একবার ডায়াল করে কারও ফোন পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া দোষ হয়তো ফোনেরও নয়, পরাশরই হয়তো আমায় ফোন করা সেরেই আবার অন্য কোথাও কনেকশন নিয়েছে। তাই মিনিট পাঁচেক ধরে ধরবার চেষ্টা করেও এনগেজড আওয়াজই পেলাম।

কী করব এখন? আধঘণ্টার পাঁচ মিনিট তো কেটে গেছে। পরাশর যা বলেছে সেই মতো অমৃতবাজার খুঁজে বিজ্ঞাপনটা বার করে তার নির্দেশমতো কোনও-না-কোনও ঠিকানায় কী-না-কী কাজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাব? পরাশরের এই আহ্লাদে জুলুম সত্যি মানতে হবে?

মনে মনে যখন গজরাচ্ছি তখন হাত-পায়ের কাজ কিন্তু থামিয়ে রাখিনি।

pathagar.net

অমৃতবাজারটা খুঁজে পার্সোন্যাল কলামের তিন নম্বর বিজ্ঞাপনটা দেখেছি।

আর তা দেখে মাথাটা বেশ চক্কর দিয়ে উঠলেও, বিজ্ঞাপনের কথাটাই ভাবতে ভাবতে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে ত্রুটি করিনি।

বিজ্ঞাপনের টুকরোটা কেটে নিয়ে রাস্তায় নেমে যখন ট্যাক্সি ধরেছি তখনও একই কথা হতভম্ব হয়ে ভাবছি। ভাবছি অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের ততোধিক অদ্ভুত নির্দেশের কথা।

বিজ্ঞাপনটা বড় নয়। মাত্র সাত-আট লাইনের। কে এক জ্যানেট রো—তাকে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় জায়গা দেখাবার ও বোঝাবার জন্যে একজন বিজ্ঞ বিদ্বান ওয়াকিবহাল গাইড চায়। পারিশ্রমিক প্রচুর। অবিলম্বে দেখা করবার ঠিকানা দেওয়া হয়েছে একটি নামকরা হোটেল ও সময় সেইদিনই সন্ধে ছ-টা থেকে সাড়ে ছ-টা।

ট্যাক্সিতে বসে তো বটেই, হোটেলের ভেতরের দরজায় ট্যাক্সি থেকে ভাড়া চুকিয়ে নামবার পরও মনে হচ্ছিল, তখনই আর একটা ট্যাক্সি ডেকে বা শুধু পায়ে হেঁটেই সেখান থেকে কেটে পড়ি। এরকম আজগুবি দায় কেউ বন্ধুর ওপর চাপায়? আর চাপালেও তা ঘাড়ে নেওয়া উচিত?

মনের ভেতর বিদ্রোহের বারুদ যতই জমে উঠুক কাজটা ফেলে চলে আসতে পারলাম না। সুবোধ বালকের মতো হোটেল কাউন্টারে গিয়ে মিস জ্যানেট রো-র খোঁজ করে জানালাম যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছি।

এক-একজনের সঙ্গে রাশির গরমিল গোছের এমন কিছু থাকে যাতে প্রথম দেখাতেই দু-জনের পরস্পরকে বিষ লাগে।

এ হোটেলের রিসেপশনিস্টের সঙ্গে আমার বোধহয় সেই রাশির গরমিল।

কাউন্টারে এসে দাঁড়াবার পর থেকেই লোকটা আমায় দেখে এমন একটা উদ্ধত ঔদাসীন্যের ভঙ্গি করেছিল যে মিস জ্যানেট রো র নামটা আর তাঁর বক্তব্যটা পর পর তিনবার বলে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়েছে।

তিনবারের বার সবটা শোনবার পর তাকিয়ে অবাঞ্ছিত কোনও সংক্রামক রুগির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে চাইছেন?'

ভাষাটা ইংরেজি বলেই আপনি-তুমির ভেদটা সেখানে ছিল না, কিন্তু তার বলার ধরনে আর স্বরে সে স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলে যে আপনি বলার যোগ্য সে আমায় মনে করে না।

রাগে তখন সমস্ত শরীর জ্বলছে। বিশেষ করে যার জন্য এই অকারণ লাঞ্ছনা সেই পরাশরের তখন মনে মনে মুণ্ডপাত করছি।

তবু কাউন্টার থেকে তখন ফিরে যাওয়া যায় না। সবকিছু অগ্রাহ্য করে নামটা তাই আবার বললাম, 'মিস জ্যানেট রো।'

'মিস নয়, বলো মিসেস।' লোকটা অবজ্ঞাভরে আমায় সংশোধনের ছলে যেন কানমলা দিয়ে বললে, 'তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।'

'দেখা হবে না।' এবার আমি গরম, 'তিনি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাতে এই সময় দেখা করতে আসার কথা আছে।' আমি জোর দিয়ে কথাগুলো বলে পকেট থেকে কাটা বিজ্ঞাপনের টুকরোটা বার করে তার সামনেই ধরলাম।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সে আগের মতোই তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, 'বিজ্ঞাপনে যা ই থাক, জেনে রাখো যে দেখা হবে না। এখন যেতে পারো।'

'যেতে পারি!'

আমার মাথায় তখন সব রক্ত চড়ে গেছে। রাগে প্রায় বোমার মতো ফাটতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে একটা ডাক শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকাতে হল।

'আরে, মি. ভদ্র না।'

যিনি ওই সম্ভাষণ করেছেন ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে বিহ্বল বিমূঢ়তায় আমি ভদ্র কি না

pathagar.net

নিজেরই সন্দেহ হল। মুখ দিয়ে অন্তত কোনও কথাই বার হল না কয়েক সেকেন্ড।

আমার পেছন থেকে ও সম্ভাষণ করেছে, আর কেউ নয়, স্বয়ং পরাশর।

পরাশরের ওই বিস্মিত প্রশ্নের কপট অভিনয়েই হতভম্ব হওয়ার কথা, তার ওপর তার বেশভূষা দেখে তো একেবারে তাজ্জব।

পরাশর একেবারে বাবুবিলাসের যুগ থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে। পায়ে পাম্প শু, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরি, গায়ে গিলে করা হিরে বসানো সোনার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবি, তার ওপর আতরে সমস্ত লবি আমোদ করে তোলা উড়ুনির বাহার।

একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। পরাশরের এই আদর্শ বাবু সাজের ঠিক যেন উলটো জবাব হিসেবে তার পাশে জাঁদরেল চেহারার এক সাহেব, যার দশাসই বপুখানি কোট-প্যান্টের শাসন যেন আর মানতে চাইছে না।

পরাশরকে এ বেশে দেখে আর তার প্রশ্ন শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে তার উদ্দেশ্যটা বুঝলাম।

আমার সঙ্গে তার যেন হঠাৎ হোটেলের লবিতে দেখা এই ভাবটাই সে দেখাতে চায়। তার সুরেই সুর মেলালাম আসল কারণটা না বুঝলেও।

কিন্তু বেশ একটু তিক্তভাবেই হোটেলের কর্মচারীর ব্যবহারটা জানাবার জন্য ভূমিকাটুকু করতে না করতেই দেখলাম হাওয়া একেবারে বদলে গেছে। হোটেলের সেই কর্মচারীর তখন আর এক চেহারা।

'হোটেলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম—' এই পর্যন্ত সব পৌঁছেছি, এমন সময় হাত কচলাতে কচলাতে সেই কর্মচারী ওপর-পড়া হয়ে বাকি পাদপূরণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আমাদের একজন বোর্ডারের খোঁজ করছিলেন, তাতে আমি বললাম তিনি এ হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

'হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন? কে?'

তাজ্জব হয়ে হোটেলের কর্মচারীর ভোল বদলানো মুখটা ভাল করে নিরীক্ষণ করতে-না করতেই পরাশরের প্রশ্নটা কানে এল।

উত্তর আর আমার দেবার দরকার হল না। পরাশরের সঙ্গী সেই ভীমকায় সাহেবই ঈষৎ হেসে আমায় বললেন, 'ও, আপনি মিসেস জ্যানেট রো র খোঁজ করছেন? তাঁর বিজ্ঞাপন দেখেই এসেছেন? না, তিনি আজ সকালেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। যদিও অমন হঠাৎ যাবার কথা ছিল না।'

'তা হলে হঠাৎ চলে যাবার মানে!' পরাশর ভুরু কুঁচকে বললে, 'তোমরা যেন হেঁয়ালিতে কথা বলছ, পিটার! কে এই মিসেস জ্যানেট রো? তাঁর রহস্যটা কী?'

'আজ্ঞে, রহস্য কিছু নেই,' পিটার একেবারে যেন কেউটে থেকে কেঁচো হয়ে গেছে তখন। 'মিসেস রো আমাদের বোর্ডার ছিলেন। আজ সকালেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। তাই এঁকে বলছিলাম যে মিসেস রো-র সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই। ইনি কিন্তু নাছোড়বান্দা।'

রাগে তখন জ্বলছি। পিটারের হাত কচলানো খোশামুদির প্রতিবাদে তার অভদ্রতা আর ঔদ্ধত্য নিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না।

পরাশর মাঝখান থেকে বাধা দিয়ে যেন আকাশ থেকে পড়ার ভান করে আমাকেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু তুমি হঠাৎ—ওই কী নাম—মিসেস জ্যানেটের খোঁজ করতে এখানে এসেছ কেন? চেনাশোনা আছে নাকি?'

পরাশর কিছু না জেনে ন্যাকা সাজবার যে ভান করছে সেটা হয়তো এ পরিস্থিতিতে দরকার। কিন্তু মেজাজ তখন এমন গরম হয়ে আছে যে তার সঙ্গে তাল দিয়ে জুতসই একটা উত্তর বানিয়ে

pathagar.net

বলতে পারলাম না। চাপা রাগে ঝাঁঝালো গলায় বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, আজ দশ বছরের চেনাশোনা। তা না হলে আর এই অখদ্দে হোটেলে ছুটে আসি?'

'তা ঠিক! তা ঠিক!' আমার ক্রুদ্ধ বিদ্রুপটাই অকাতরে মেনে নিয়ে পরাশর যেন হোটেলের সাফাই গেয়ে আমায় বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কিন্তু হোটেলের ওপর রাগ করা তোমার উচিত নয়। তোমার মিসেস রো-র চলে যাওয়াটা তো ওঁদের দোষ নয়। কোথায় গেছেন জানতে পারলে অবশ্য তোমার একটু সুবিধে হত। সেরকম কিছু জানিয়ে গেছেন নাকি?'

শেষ প্রশ্নটা আমাকে নয়, হোটেল-ক্লার্ক পিটারকে। এতক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত মুখে যিনি নীরবে আমাদের কথা শুনছিলেন, পরাশরের প্রশ্নটাকে সেই হোটেল ম্যানেজারও জোরদার করে তুললেন, 'হ্যাঁ, মিসেস রো তো হঠাৎ চলে গেছেন দেখতে পাচ্ছি। দেখো না, তাঁর বন্ধুর জন্যে কোনও খবর রেখে গেছেন কি না!'

স্মৃতিচারণটা ওই পর্যন্ত পৌঁছতেই থামাতে হল।

এ আমরা চলছি কোথায়?

দিল্লির পথঘাট সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশ অবুঝ। এতবার এ শহরে যাতায়াত করা সত্ত্বেও রাস্তার নাম আর ছকটা ঠিক আয়ত্ত করতে পারিনি।

জ্যানেট নামটার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়কার কথাগুলো মনের ভেতর আওড়াতে-আওড়াতে, কোন দিকে চলেছি মোটামুটি সে বিষয়ে একটা খেয়াল রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এইবার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

হোটেল কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসফ আলি রোডের আজমির গেট পর্যন্ত চেনা রাস্তাই পড়েছে। কিন্তু সেখান থেকে পর পর ডাইনে দুবার বাঁক নিয়ে আবার সেই আসফ আলি রোডেই এসে পড়ল কি না ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এতক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে সেই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আর-এক অতর্কিত বিস্ময়ে প্রশ্নটা মনের মধ্যেই চাপা রইল।

এদিকের রাস্তা একরকম ফাঁকা। রাত্রে তাতে ট্রাফিক নেই বললেই হয়। সেই ফাঁকা রাস্তায় সবেগে চালাতে চালাতে দিভেচা হঠাৎ এমনভাবে গাড়িটা কষল যে, মনে হল সামনে কেউ চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

হঠাৎ ব্রেক কষায় সামনের ড্যাশ বোর্ডে মাথাটা তখন ঠুকে গেছে। সে সামান্য যন্ত্রণাটা গ্রাহ্য না করেই মাথা তুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল কী?'

উত্তর পেলাম না। তার বদলে বিমূঢ় হয়ে দেখলাম রাস্তার ধারেই একটা কারখানা গোছের বাড়ির খোলা গেটের মধ্যে আমাদের গাড়িটা ব্যাক করিয়ে ঢোকাচ্ছে দিভেচা।

এটা কীসের কারখানা? এখানে হঠাৎ গাড়ি ঢোকানোর মানে কী?

এসব প্রশ্নও মনের মধ্যে অনুচ্চারিত রয়ে গেল। আমাদের গাড়িটা ভেতরে ঢোকানোর পর মোটরের ইঞ্জিন চালু রেখেই দিভেচা তার নিজের দিকের দরজা খুলে নেমে গেল।

কিন্তু সে যাবে কোথায়?

একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! প্রায় অন্ধকার কারখানা-কম্পাউন্ডের মধ্যে আর-একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

এই অজানা রাস্তার ধারের কারখানা-কম্পাউন্ডের ভেতর হঠাৎ গাড়ি ঢোকানো আর সেখানে আর-একটা গাড়ি মজুত থাকা যদি আশ্চর্য ব্যাপার হয়, তা হলে ততোধিক আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য সেখানে যে গাড়িটি রয়েছে তার চেহারা পরিচয়। সে গাড়িটি আমাদের গাড়ির ঠিক যমজের মতো আর একটি ক্রাইসলার ইম্পিরিয়াল।

দিভেচা সেই গাড়িতে উঠে আমাদের দিকে ফিরে নীরবে একবার হাত তুলে যেন বিদায়

সম্ভাষণ জানালে। তারপর কারখানা কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকেই গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

সত্যি কথা বলতে গেলে, সব কিছু মিলিয়ে তখন এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছি যে পরাশরকে কোন প্রশ্ন আগে করব তা-ই যেন ঠিক করতে পারলাম না।

জ্যানেট, যমুনা বা নজমা যে নামই হোক, মেয়েটির পেছনে পরাশরের তাগিদে বেশ কিছু দিন ধরে ঘুরে মরতে বাধ্য হয়েছি বটে, কিন্তু আজ রাত্রের মতো এমন গুরুতর রহস্যের জট তার মধ্যে আছে বলে সন্দেহ করবার কোনও কারণ তো আগে পাইনি।

মেয়েটির নগ্নতা-বিলাস থেকে শুরু করে তার ফোন করা আর তাতে পরাশরের হঠাৎ এমন উত্তেজিত হওয়া, তার পর ক্রাইস্‌লার ইম্পিরিয়ালের মতো গাড়ি নিয়ে দিভেচার হঠাৎ আবির্ভাব আর সেই সঙ্গে দু দুটো এক চেহারা আর মডেলের গাড়ির রাস্তার ধারের এক কারখানা-কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকার যোগাযোগ তো দারুণ কোনও রহস্যের ইঙ্গিত দেয়।

পরাশরকে সে ইঙ্গিত এখন ব্যাখ্যা করতে বলা বৃথা জেনে সব কৌতূহল চেপে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী করবে এখন? এখানেই থাকবে?'

মুখে আঙুল ঠেকিয়ে নীরবতার নির্দেশ দিয়ে পরাশর চাপা গলায় বললে, 'বেশিক্ষণ না।'

বেশিক্ষণ না তো বুঝলাম, কিন্তু কার জন্য কী জন্য অপেক্ষা? এ অপেক্ষা করার সঙ্গে জ্যানেটের মাঝরাত্রের ফোনের কি কিছু সম্পর্ক আছে? তা যদি থাকে তা হলে দিভেচা হঠাৎ গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল কেন? তার গাড়িটা আমাদের গাড়ির যমজ হওয়ারই বা মানে কী? আজেবাজে তো নয়, এরকম খানদানি দু দুটো গাড়ি একসঙ্গে জোগাড় করা তো চাট্টিখানি কথা নয়! দিভেচার গাড়িটা আবার এরকম একটা কারখানা-কম্পাউন্ডের মধ্যেই বা কেন রাখা ছিল? রেখেই বা গেছে কে? গাড়িটার বা কম্পাউন্ডের মালিক আর জনমনিষ্যিকে তো এখনও দেখতে পাইনি। কারখানাটা এখন তো বন্ধ বলেই মনে হচ্ছে। এরকম একটা জায়গা আজকের এই ধান্দার জন্য আগে থাকতে বেছে রাখার মধ্যে যে রীতিমতো আয়োজন উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ওই জ্যানেট মেয়েটিই কি তার মূল?

তা ছাড়া আর কিছু হওয়া তো সম্ভব নয়।

সবকিছু মিলিয়ে সেই নির্দেশই তো পাওয়া যাচ্ছে।

এরকম কোনও নির্দেশ আগে কেন পাইনি ভাবতে গিয়ে মনটা গোড়ার দিকের ঘটনাগুলোয় আবার ফিরে গেল।

মিসেস জ্যানেট রো-র সন্ধান নেওয়ার ব্যাপারে পরাশর তখন যা-যা করেছিল তা একটু অদ্ভুত আর মাত্রা ছাড়া বটে, কিন্তু পরাশরের স্বভাবই তো তা-ই। কোন কাজটা সে সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো করে। জ্যানেটের খোঁজ করা নিয়ে তার বাড়াবাড়িটায় তাই কখনও একটু বিরক্তি, আর বেশির ভাগ কৌতুক বোধ করলেও গভীর কোনও সন্দেহ মনে জাগেনি। সন্দেহ যেটুকু হয়েছিল তা জ্যানেটের মাথার সুস্থতা নিয়ে। তা না হলে ওই বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে একা একা গোটা ভারতবর্ষটার শহর থেকে শহরে নাম বদলে বদলে ছুটে বেড়ায়! সুন্দরী শুধু নয়, মেয়েটার পয়সাকড়িরও অভাব নেই নিশ্চয়। এ পর্যন্ত সব শহরেই একেবারে সেরা হোটেলে না হোক, আজেবাজে কোনও হোটেলে সে ওঠেনি। মেয়েটার এই খামখেয়ালি বাউন্ডুলেপনাই হয়তো পরাশরকে কৌতূহলী করেছে বলে মনে হয়েছিল। বিদেশি কোনও বড়ঘরের এরকম পাগলাটে মেয়ের ওপর নজর আর পাহারা রাখার ফরমাশই হয়তো তাদের কাছে পেয়েছে এমন ধারণাও তখন হয়েছিল।

সে ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। জ্যানেটের হোটেল থেকে সেদিন ব্যর্থ হয়ে ফেরার পর পরাশর কথায় ও কাজে তার স্পষ্ট আভাসও দিয়েছিল।

ম্যানেজারের সাহায্য ও সমর্থন সত্ত্বেও পরাশর ও আমাকে সেদিন জ্যানেটের হোটেল থেকে

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। জ্যানেটের রেখে-যাওয়া কোনও চিঠি হোটেল-ক্লার্ক পিটার বার করতে পারেনি। তা যে পারবে না তা অবশ্য জানা কথা। কিন্তু তার পর হোটেল-ম্যানেজার পরাশরের প্রায় অন্যায় একটা আবদার মেনে নিলেও, তাতেও ফল কিছু হয়নি।

'আচ্ছা, মিসেস রো ভুলে তাঁর কামরায় তো চিঠিটা ফেলে যেতে পারেন!' বলে পরাশর হঠাৎ অনুরোধ করে বসেছিল, 'তাঁর কামরাটা একবার দেখে এলে হয় না? অবশ্য যদি আর কেউ সেখানে না এসে থাকেন।'

অনুরোধটা দস্তুরমতো মাত্রছাড়া। কেঁচো হয়ে যাওয়া হোটেল-ক্লার্ক পিটারের চোখ দুটোয় রাগ আর আক্রোশের ঝিলিকটা আমার অন্তত চোখ এড়ায়নি।

হোটেল ম্যানেজার কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক কথায় সায় দিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখে আসুন-না। কী পিটার, কামরাটা খালি আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে,' অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিটার স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলেছিল, 'কিন্তু কাল একজনের বুক করা আছে। কামরাটা তাই পরিষ্কার করতে লোক পাঠিয়েছি।'

'পাঠিয়েছ!' হোটেল-ম্যানেজারই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমাদের হয়ে, 'তাদের কাজ বন্ধ করতে বলো গিয়ে। এঁদেরও সঙ্গে করে নিয়ে যাও।'

'আজ্ঞে এখানকার কাজ?' পিটার মৃদু একটু আপত্তি জানিয়েছিল।

'এখানকার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না,' কড়া গলায় বলেছিলেন হোটেল-ম্যানেজার, 'যা বলছি করো।'

পিটার তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের লিফটে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। জ্যানেটের কামরায় গিয়ে যা ভেবেছিলাম, পরাশর কিছুই তা কিন্তু করেনি। কেন যে এ কামরা দেখার জন্য অমন অন্যায় আবদার পর্যন্ত করতে তার বাধেনি সেটাই বুঝতে না পেরে তখন অবাক হয়েছি।

খোঁজাখুঁজি দূরের কথা, পরাশর সে কামরায় ওয়ার্ডরোবের একটা পাল্লা কি ড্রেসিং টেবলের একটা ড্রয়ার টেনেও দেখেনি। তার বদলে ঘরে ঢুকে যা করেছিল তা তো একরকম আদেখলেপনা বলা যায়। ঘরের ভেতর পা দিয়েই সোজা অন্যদিকের খোলা জানলাটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর উচ্ছ্বসিত মুখে পিটারকেই উদ্দেশ করে বলেছিল, 'চমৎকার কামরা তো! এ জানলা দিয়ে তো মস্ত বড় একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে। কী নাম পার্কটার?'

নেহাত চাকরির খাতিরেই বোধহয় মুখের চেহারার সঙ্গে গলাটা যথাসম্ভব ভদ্র রেখে পিটার জবাব দিয়েছিল, 'জানি না। আপনারা কী দেখতে চান, দেখুন!'

'না না, আর দেখবার কী আছে?' পরাশর সুর পালটে একেবারে উদাসীন হয়ে বলেছিল, 'ওরকম চিঠি কামরায় কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবার জিনিস তো নয়! ভুল করে ফেলে গিয়ে থাকলে চোখের ওপরই কোথাও পড়ে থাকত। আপনি এখন কামরা সাফ করাতে পারেন।'

পিটার পুতুলের মতো ভাবলেশহীন মুখ করে ঘরের টেলিফোনে নীচের অফিসকেই সে কথা জানাতে যাচ্ছিল বোধহয়। আমার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে গিয়ে পরাশর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আচ্ছা, আপনাদের এই কামরার বোর্ডার অমন সাতসকালে হোটেল ছেড়ে কোথায় গেছেন বলুন তো?'

'জানি না।' পিটারের সেই ভাবলেশহীন মুখ—কিন্তু কথাটা যেন দাঁতে দাঁতে চেপে বলেছে বলে মনে হয়েছে।

'জানেন না?' পরাশরের গলায় আর মুখে চোখে যেন বিমূঢ় বিস্ময়।

'না।' মুখটা নির্বিকার রেখে শুধু গলার স্বরেই যতখানি সম্ভব তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা মিশিয়ে পিটার বলেছে, 'হোটেলের বোর্ডাররা কোথায় যান কোথা থেকে আসেন সে খবর রাখা আমাদের নিয়ম নয়।'

হোটেল-ম্যানেজার সামনে নেই বলেই গলায় অতটা অপমানের সুর ফোটাবার সাহস পিটারের হয়েছে বুঝলেও তখন করার কিছু নেই। উত্তর সে যা দিয়েছে ওপর থেকে দেখতে তা নির্দোষ।

'ও, নিয়ম নয় বুঝি?' বলে পরাশর কয়েক সেকেন্ড যেন মুখে বোকা-বোকা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যা করে বসল তা কোনও সাধারণ সুস্থ মানুষের পক্ষে অন্তত সম্ভব নয়।

হঠাৎ আমাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও সে কামরায় ঢুকে দরজাটা দিলে বন্ধ করে। তারপর আগের মতোই বোকা-বোকা মুখে পিটারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি খুব নিয়ম মেনে চলেন, তাই না?'

পিটার কোনও জবাব দিলে না। তার বদলে আমাদের, বিশেষ করে পরাশরের দিকে চেয়ে সে তখন মিটিমিটি হাসছে।

তার সে হাসিটা রহস্যময় কিছু নয়। বরং তার মানেটা যুক্তাক্ষর বর্জিত গদ্যের মতোই সরল। সত্যি কথা স্বীকার করছি, পিটারের মুখের সে হাসি দেখে আমি ভয় পেয়েছি। লোকটা পরাশরের চেয়েও অন্তত এক বিঘত লম্বা। রোগাটে হলেও চেহারাটা যেন পাকানো লোহার তারে তৈরি।

এই মানুষটার তখনকার হাসির মধ্যে স্পষ্ট যে ভাবটা আমি টের পেলাম তা হল নিজের খাঁচার মধ্যেই আহাম্মক একটা হরিণকে শিং বাগিয়ে ঢুকতে দেখলে হিংস্র বাঘের মুখে যা ফুটে ওঠে কতকটা যেন তাই।

পিটারের কাছে জবাব না পেলেও পরাশর থামল না। আরও যেন অন্তরঙ্গ হয়ে বললে, 'নিয়ম যারা মানে তাদের বেনিয়মের দামটা একটু বেশি, কেমন? কত দাম আপনার?'

মিটিমিটি হাসিটা মুছে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মুখের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে পিটারের দু-চোখে আগুনের যে ঝিলিকটা সেই মুহূর্তে দেখা গেল তাতে আমি তখন প্রমাদ গুনছি।

পিটারের কথায় সে শঙ্কিত উদ্বেগ আরও বাড়ল। নিজের চেহারার পক্ষে সুর-মেলানো গলায় পিটার তখন বলছে, 'দরজাটা নিজেরাই খুলে বেরিয়ে যাবেন, না আপনাদের সাহায্য করতে হবে।'

'না, না, সাহায্যের দরকার কী?' পরাশর আগের মতোই অমায়িক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বললে, 'দরজা আমরা নিজেরাই খুলে যেতে পারব। কিন্তু একটা মিটমাট না হলে দরজা খোলা কি উচিত হবে? তার চেয়ে চটপট বলেই ফেলুন না আপনার দামটা! একশো? দুশো? তিনশো? পাঁচশো? হাজার?'

আমি তখন বিস্ফারিত চোখে পরাশরের কাণ্ডটা দেখছি। সত্যি করছে কী সে! প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে ডান হাতে একটা করে সবুজ নোট পকেট থেকে বার করে বাঁ হাতের পুঁজিটা বাড়াচ্ছে।

শুধু আমারই একার নয়, পিটারের মুখ চোখের অবস্থাও তখন দেখবার মতো। যে চোখে আগুন ঠিকরে বার হচ্ছিল তা এখন প্রায় ছানাবড়া।

হাতের দশ-দশখানা একশো টাকার নোট পিটারের দিকে এগিয়ে ধরে পরাশর তখন মধুর স্বরে একটানা তাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, 'এমন কিছু গর্হিত কাজ তো নয়। কারও সঙ্গে দুশমনি বা বেইমানি কিছুই করতে বলছি না। একজন বোর্ডার হঠাৎ সকালবেলা হোটেল ছেড়ে কোথায় গেলেন সেই খবরটুকু শুধু চাইছি। বুঝতেই পারছেন, গরজ বড় বালাই। নইলে এই খবরটুকুর জন্যে হাজার টাকা পর্যন্ত উঠি।'

'কীসের এত গরজ?' পিটারের গলাটা তার চোখের দৃষ্টির মতোই সন্দেহে তীক্ষ্ণ।

'তা-ও আপনাকে বলতে হবে?' পরাশর যেন ক্ষুণ্ণ! 'এ দশখানা সবুজ নোটেই ওসব জবাবদিহির দায় ঘুচে যায়নি? তবু শুনতে চাইছেন যখন, শুনুন। আপনাদের এই বোর্ডারটির

মাথায় ছিট আছে। উনি নিজের ঘর-সংসার ফেলে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে খ্যাপার মতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওঁকে চোখে চোখে রেখে সব খবর ওঁর স্বামীকে পাঠানোই আমার কাজ। বুঝতেই পারছেন এ হাজার টাকা দিতে আমার পকেট তাই ফুটো হচ্ছে না। কিন্তু খবর আমার চাই-ই।'

'চাই-ই।' পিটারের মুখে আবার সেই আগেকার বিশ্রী হাসি ফুটে উঠেছে। পিটার তারপর হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে পরাশরের হাত থেকে নোটগুলোয় টান মেরেছে।

পরাশর নোটগুলো প্রথম টানে ছাড়েনি। কিন্তু পিটারের মুখের হাসিটা তখন আরও কুৎসিত হয়ে উঠেছে। পরাশরের হাতটা সবলে মুচড়ে নোটগুলো কেড়ে নিতে নিতে সে বলেছে, 'ভাগ্যিস দরজাটা বন্ধ করেছেন! আমাদের এ লেনদেনের কোনও সাক্ষী তাই রইল না।'

পিটারের কথাটা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য অপেক্ষা করিনি। পরাশরের হাত মুচড়ে নোটগুলো টেনে নেবার চেষ্টা দেখেই, নিষ্ফল জেনেও পিটারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছি রাগে। কিন্তু পরাশরই বাধা দিয়েছে।

মোচড়ানো হাতটা অন্য হাতে ডলতে ডলতে শান্ত স্বরে বলেছে, 'থাক, কৃত্তিবাস। কোনও লাভ নেই ওতে। খবরটা আপনি তা হলে দেবেন না?'

শেষ প্রশ্নটা পিটারকে।

নোটগুলো ভাঁজ করে ভেতরের পকেটে রাখতে রাখতে পিটার আবার যেন বিনয়ের অবতার হয়ে উঠেছে। 'বাঃ, দেব না কেন,' পিটারের গলা যেন কৃতজ্ঞতায় গলে যাচ্ছে, 'হাজার টাকার বদলে এই সামান্য খবরটুকু দেব না? মিসেস রো কোথায় আছেন জানতে চান তো, তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে চৌরঙ্গীর রাস্তায় গেছেন, এটুকু নিশ্চিত খবর আপনাদের দিতে পারি।'

পিটারের এই বাজে চ্যাংড়া রসিকতাটাই তখন চাবুকের মতো জ্বালা ধরিয়েছে আমাদের মনে। সমস্ত শরীরের রক্ত তখন ফুটছে। আমার প্রায় দেড়া লম্বা পিটারের মতো ইস্পাতের মানুষের কাছে আমি একটা মিমের পুতুল। এ জেনেও তার এ শয়তানির কিছু একটা জবাব দেবার চেষ্টা না করে কখনও আমি ছাড়তাম না, কিন্তু শুধু পরাশরের মুখ চেয়ে নিজেকে সামলে রাখতে হয়েছে।

পরাশরের আত্মসংযমের কারণটা একেবারে যে বুঝিনি তা নয়। পিটারের মতো দুশমন দানবের সঙ্গে হোটেলের একটা বন্ধ ঘরে মারামারি করতে যাওয়া নিষ্ফল শুধু নয়, সেই সূত্রে হাজার টাকা ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারটাও জানাজানি হওয়া বিপজ্জনক বলেই পরাশরকে সাবধান হতে হচ্ছে। এসব যুক্তি মেনেও সমস্ত ব্যাপারটায় নিজেদের কাপুরুষতার গ্লানি মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

চাপা তিক্ত স্বরে তাই বলেছি, 'কী করতে চাও এবার?'

'করতে।' পরাশর বেশ একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলেছে, 'চলে যাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে এখন? শুধু ফোনটা একবার করে দেখতে পারি অবশ্য।' পরাশর ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু তার আগেই ফোনটা তুলে নিয়ে পিটার তখন নীচের অফিসকে ডাকছে, 'হ্যালো, হ্যাঁ, আমি পিটার বলছি। তেত্রিশ নম্বর কামরা সাফ করবার লোক পাঠাও। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের তদারক শেষ হয়েছে।'

তার ফোনে আলাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি পরাশর। আমায় নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে।

স্মৃতির পাতাটা আবার মুড়ে রাখতে হল।

এত রাত্রেও দু-একটা গাড়ি এর আগে খোলা গেটের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে দেখেছি, কিন্তু

এখন দূর থেকে একটা মোটরের একবার হর্নের আওয়াজ পেয়েই পরাশর যেন টান হয়ে বসে গাড়িটায় স্টার্ট দিলে।

তারপর মোটরটা সবেগে আমাদের গেটের সামনে দিয়ে চলে যাবার পরই দেখলাম আমাদের গাড়িও নিঃশব্দে গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরছে।

সামনের গাড়িটা ততক্ষণে বহু দূরে চলে গিয়েছে। তার পেছনের লাইটগুলো মাঝরাতের পাতলা কুয়াশায় প্রায় মুছে যেতে আর বিশেষ দেরি নেই।

গাড়িটা যে প্রচণ্ড বেগে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের গাড়িটা সবে তখন বাঁক নিয়ে সোজা রাস্তা ধরেছে। সামনের গাড়িটাই যদি পরাশরের লক্ষ্য হয় তা হলে আর তার নাগাল পাওয়া কি সম্ভব হবে!

অনেকখানি সময় ও বেশ দীর্ঘ পথ সেই উদ্‌বেগেই কাটল।

এদিকের রাস্তাগুলো ছোটখাটো নয়। তাই খানিক যাবার পরই আর অচেনা তখন লাগছে না। ঠিকমতো চিনতে পেরেছি রয়েস অ্যাভেনিউ-এ পড়বার পর। সেখান থেকে মথুরা রোড হয়ে কিচ্‌লু রোডের অংশটুকু ছাড়িয়ে প্রথম লাজপত রায় মার্গ, তার পর রিং রোড ধরে যেতে যেতে হতাশই বোধ করলাম।

সামনের গাড়িটা এখনও একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়নি বটে, কিন্তু আমাদের মাঝখানকার ব্যবধানও এতটুকু কমেছে বলে মনে হচ্ছে না। যেদিকে যাচ্ছি সেখানে দিল্লি শহর ক্রমেই ফাঁকা হয়ে ধু ধু প্রান্তরে হারিয়ে যাবার উপক্রম করছে। তার ওপর কুয়াশাটা যেরকম ঘন হয়ে আসছে তাতে কিছুক্ষণ বাদে সামনের গাড়ির চিহ্নও তো আর দেখা যাবে না।

সামনের গাড়িতে কাকে কী উদ্দেশ্যে পরাশর আজকের রাতে এত তোড়জোড় করে অনুসরণ করতে বেরিয়েছে জানি না, কিন্তু নজর যা দেখা যাচ্ছে তাতে আমাদের সফল হবার তো কোনও আশা নেই।

রিং রোড থেকে হঠাৎ বাঁয়ে ঘুরে একটা অজানা রাস্তা ধরবার পর সে আশা আরও ক্ষীণ মনে হল। যার পেছনে লেগে ছিলাম সে গাড়ি তো তখন সোজা সামনের রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নাম-না-জানা রাস্তা খানিকদূর গিয়ে ডাইনে বেঁকতে বেঁকতে যে রাস্তায় গিয়ে মিশল সেটা চিনতে খুব দেরি হল না। এর আগের আগের বারে হাউস খাস এনক্লেভে মাঝে মাঝে আসতে হয়েছে বলে রাস্তাটা চেনা। রাস্তাটার নতুন নামকরণ হয়েছে অরবিন্দ আশ্রম মার্গ। গ্রিনপার্ক ও হাউস খাস এনক্লেভ ডাইনে পড়ে। সেসব ছাড়িয়ে রাস্তাটা কুতব মিনারের দিকেই গিয়েছে।

গাড়িটাকে অনুসরণ করতে করতে পরাশর তাকে ছেড়ে হঠাৎ এ রাস্তা নিল কেন? প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঠতে না উঠতেই উত্তরটা পেয়ে গেলাম।

আমাদের সামনে সেই গাড়িটাই দেখা যাচ্ছে। এবার আগের মতো দূরেও নয়।

পরাশর বুদ্ধি খাটিয়ে শর্টকাট-এ এসে গাড়িটার আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু গাড়িটা যে এ রাস্তাতেই বাঁক নেবে কী করে বুদ্ধি খাটিয়ে তা আগে থাকতে বুঝল? সত্যিকার কোনও গণনা, না নেহাত আন্দাজে অন্ধকারে ঢিল?

বুদ্ধি খাটানো অনুমান বা আন্দাজে ঢিল যা-ই হোক, গাড়িটার নাগাল পাওয়াটা শুধু শর্টকাট নেওয়ার দরুন বোধহয় না। এগিয়ে যেতে যেতেই মনে হচ্ছিল আগের গাড়িটার বেগ বেশ কিছুটা কমে গেছে। খানিক বাদেই সন্দেহ করবারও আর কিছু রইল না। গাড়িটা তখন রাস্তার ধারে থেমে দাঁড়িয়ে গেছে।

পরাশর তার জোরালো হেডলাইট দুটো যেন নির্মমভাবে সে গাড়িটার ওপর ফেলে এবার এগিয়ে গেল। গাড়িটার কাছে পৌঁছতে দেরিও হল না।

কিন্তু পরাশর এ কী করল, যার পিছনে এত ছোটাছুটি, হাতে পেয়েও সে গাড়িটাকে অগ্রাহ্য করেই বেরিয়ে চলে এল।

আমাদের গাড়ির জোরালো হেডলাইটে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো অন্য গাড়িটা ভাল করে লক্ষ করবার সুবিধে অবশ্য তখন হয়েছে। গাড়িটার নম্বর দেখে নিয়েছি। দিল্লিরই নম্বর। গাড়িটাও যে আজেবাজে নয় তা বুঝেছি। তখনকার নাম-করা পনটিয়াক কনভারটিবল।

ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে আর কাউকে দেখতে পাইনি। ড্রাইভারকেও যা দেখেছি তা নেহাত আভাসে। প্রথমত টুপিসমেত রেনকোটে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। দ্বিতীয়ত আমরা যখন পার হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি তখন সে গাড়ির বাঁ ধারে নেমে নিচু হয়ে টায়ার পরীক্ষার মতো কিছু যেন করছে।

বাগে পেয়েও পরাশরের পক্ষে গাড়িটাকে ফেলে চলে আসা বেশ একটু অদ্ভুত লেগেছিল, তবে তার একটা সোজা কারণও থাকতে পারে বলে মনে হল। এতদূর অনুসরণ করবার পর পরাশর হয়তো কাছে থেকে দেখে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে। যা ভেবে পিছু নিয়েছিল গাড়িটা তা নয়।

আর খানিকটা যাবার পর আবার হঠাৎ ব্রেক কষে তাকে গাড়ি থামাতে দেখে একটু খটকা লাগল। সে খটকা অবশ্য ক্ষণিকের জন্য।

পরাশরের পরের কথাতেই সেটা কেটে গেল।

না, অন্য কোনও কারণে নয়। নিছক কর্তব্যবোধেই পরাশর গাড়িটা এবার রুখেছে।

গাড়িটা থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে নিজের মনের সেই বিস্ময়ের প্রশ্নটাই সে প্রকাশ করলে, 'আচ্ছা, আমাদের একটু অন্যায় হয়ে গেল না?'

'কী অন্যায়?' ঠিক বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

'অন্যায় মানে,' পরাশর চিন্তিতভাবে বললে, 'ফেলো-মোটরিস্ট হিসেবে আমাদের একটু দাঁড়িয়ে খবর নেওয়া উচিত ছিল না কি? নির্জন রাস্তায় এরকম কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে সাহায্যের চেষ্টা করা তো আমাদের কর্তব্য।'

কথাগুলো বলতে বলতেই পরাশর তখন আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাচ্ছে।

মনে মনে বললাম, এই সাহায্যের জন্যে কর্তব্যবোধেই নয়, ফেরবার অন্য গরজও তোমার আছে। গাড়িটা সম্বন্ধে তুমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে চাও। সত্যি নির্দোষ হলে গাড়িটাকে রাস্তার ধারেই এখনও দেখতে পাবে। আর তা না হলে তোমার এবারের ভুলের সুযোগ নিয়ে সে গাড়ি এতক্ষণে পগার পার।

গাড়ির ভেতর বেশ একটু উদ্বিগ্ন মন নিয়েই সামনের রাস্তায় একাগ্র দৃষ্টি রেখে তাই এগিয়ে গেলাম। কুয়াশা এখন আরও একটু গাঢ় হয়েছে। তার ভেতর গাড়িটা না-ও চোখে পড়তে পারে। চোখে কিন্তু ঠিকই পড়ল।

সত্যিই আমাদের অনুসরণ করা পনটিয়্যাক কনভারটিব্‌লের পেছনে ও সামনে আর একটি জিপ আর মোটরবাইক দাঁড়িয়ে।

সে জিপ ও মোটরবাইক যে পুলিশের তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না।

কিন্তু মোটরটা রাস্তার ধারে থামতে না থামতে জিপ ও বাইকে পুলিশ হাজির হল কোথা থেকে? কেমন করে?

গাড়িটা কার? তার ড্রাইভারই বা গেল কোথায়?

পরাশরের গাড়িটা ওই গাড়িটার কাছে গিয়ে থামবার পর ওসব প্রশ্নের যে জবাব পাওয়া গেল তা ও সত্যি চমকে দেওয়ার মতো।

ড্রাইভারের দেখা ওই গাড়ির পাশেই পেলাম। আরও তার বর্ষাতির টুপির নীচে যে মুখখানা দেখলাম সেটা আর কারও নয়—জ্যানেট রো-র।

জ্যানেট রো! তারই গাড়ি এতক্ষণ ধরে আমরা অনুসরণ করছি! আর তার পর এরকম একটা জনমানবহীন মাঝরাস্তায় তাকে থেমে পড়তে দেখেও পরাশর ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে চলে যাচ্ছিল!

পরাশর সত্যিই তা হলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

তার এখনকার ব্যবহার দেখে তাই অন্তত মনে হয়।

পরাশর তার গাড়িটা থামিয়ে নামবার পর জিপের পুলিশ অফিসারের চোখে একটু ভ্রুকুটি দেখা গেল।

'দয়া করে এখানে দাঁড়াবেন না। যেখানে যাচ্ছেন যান।' অনুরোধ ভদ্রতার হলেও গলাটা বেশ রূঢ়।

পরাশর তার উত্তরে মুখে কিছু না বলে শুধু পকেট থেকে কী একটা চাকতি ক্ষণিকের জন্য দেখিয়েছে।

আমি পেছনে দাঁড়িয়েও সেটা ভাল করে দেখতে পাইনি। কিন্তু অফিসার ঠিকই দেখেছেন নিশ্চয়, নইলে এক মুহূর্তে তাঁর রূঢ় চেহারা ও গলা অত মোলায়েম হয়ে উঠবে কী করে। 'মাফ করবেন। অত্যন্ত দুঃখিত।' বলেছেন অফিসার, 'এখানে আপনি আসবেন আশা করতে পারিনি।'

'ব্যাপারটা কী বলুন তো!' পরাশর সামান্য একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছে, 'গোলমেলে কিছু নাকি? আমি তো খানিক আগে এই রাস্তা দিয়েই চলে যাবার সময় গাড়িটাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—আরে আপনি? এ আপনার গাড়ি! আপনাকে আমি কোথায় যেন আগে দেখেছি।'

পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শেষের সম্ভাষণগুলো হঠাৎ যেন চোখে পড়ে যাওয়ায় জ্যানেটকে উদ্দেশ করে বলা।

তার নামাবলি আর গতিবিধি জানা থাকলেও জ্যানেটের সঙ্গে আমাদের এখনও যাকে বলে সামাজিক পরিচয় হয়নি। পরাশরকে তাই একটু ঘুরপথে আলাপ করতে হচ্ছে বুঝলাম।

মাথার হুডসমেত গায়ের ওয়াটারপ্রুফ খুলে জ্যানেট তখন স্ব-রূপে আবির্ভূত। নামটা এখন জ্যানেট কি না তা বলা শক্ত, কারণ গাউনটাউন নয়, পোশাকটা এখন পুরো ভারতীয়।

পরাশরের সম্ভাষণে জ্যানেটের মুখে চোখে কৌতুকের ঝিলিক কতটা ফুটল, জিপের ও মোটরবাইকের হেডলাইটের আলো থাকা সত্ত্বেও আবছা কুয়াশায় তা ভাল বোঝা গেল না। তার স্পষ্ট আভাস কিন্তু পাওয়া গেল কণ্ঠস্বরে। সেই হালকা একটু হাসির শব্দও। বললে, 'আমাকে কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না! আমি তো আপনাকে বোম্বে ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ সব জায়গাতেই দেখেছি মনে হচ্ছে। আপনাকে শুধু নয়, আপনার এই সঙ্গীটিকেও।'

একেবারে হাত-পা অবশ করিয়ে দেবার মতো কথা। আর কেউ হলে আচমকা এই অপ্রত্যাশিত চালে একেবারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে যেত। কারও দেখা সম্ভব ছিল না তাই। নইলে আমি তো তখন লজ্জায় অস্বস্তিতে বেগনি হয়ে গেছি।

পরাশর কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া। এ ধাক্কা অনায়াসে সামলে নেহাত সহজভাবেই বললে, 'তাই নাকি! খুব আশ্চর্য বলতে হবে, বিশেষ এই দিল্লিতে আবার এরকম দেখা হয়ে যাওয়া। তা আপনার হয়েছে কী? এঁরা কেন?'

'আমার যা হয়েছে তা আপনাকে বলতে পারি।' জ্যানেটের গলায় কৌতুকের সুরটা এবার যেন বিদ্রূপের দিকে এগোচ্ছে। 'হঠাৎ টায়ারটা পাংচার হওয়ায় এখানে গাড়িটা থামিয়েছি। তার পরেই এঁরা কেন হঠাৎ উদয় হয়েছেন তা ওঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন। আমার টায়ার চেঞ্জে সাহায্য করতে এসেছেন কি না, এখনও জানি না।'

পুলিশ অফিসার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে থামিয়ে পরাশর জ্যানেটের জন্য হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'আপনার টায়ার পাংচার হয়ে গেছে? কী কাণ্ড! আর আমরা আপনার সঙ্গে বাজে বকে সময় নষ্ট করছি! চলুন চলুন, দেখি—'

পুলিশ অফিসারের দ্বিতীয়বারের কী যেন বলার চেষ্টাও হাত নেড়ে থামিয়ে পরাশর গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে অফিসারের সঙ্গে আমাকেও যেতে হল পিছু পিছু।

আমার ও পুলিশ অফিসারের মুখে তখন পরাশরের কাণ্ড দেখে যদি বিমূঢ় বিস্ময় ফুটে থাকে, জ্যানেটের মুখের হালকা কৌতুকের হাসির পিছনে একটা সন্দিগ্ধ ভয়ের আভাস কি পেলাম!

জিপের হেডলাইটটা তখন জ্যানেটের গাড়ির পিছন দিকে আমাদের ওপরই ফেলা, জ্যানেটকে কাছে থেকে লক্ষ করবার সুযোগও সেখানে মিলেছে। তা সত্ত্বেও তার মুখের ভাব ও চোখের দৃষ্টির সঠিক মানেটা যেন ধরতে পারলাম না।

পরাশর তখন গাড়ির জখম টায়ারটা দেখতেই তন্ময়।

'টায়ারটা তো এখানে নয়, আগেই কোথাও ফুটো হয়েছে দেখছি, আর সেই ফাটা টায়ার নিয়ে অনেকখানি চালিয়ে এসেছেন বলেই জখম হয়েছে আরও!' টায়ার দেখা সেরে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার স্পেয়ার নেই?'

'আছে।' এবার পরাশরের সহানুভূতির স্বরে জ্যানেটের ভঙ্গিটা আর কৌতুক কি বিদ্রূপের নয়। 'কিন্তু খোলা পরানো অনেক ঝামেলা বলে ওই টায়ারেই খানিকটা টেনে নিয়ে যেতে পারব ভেবেছিলাম।'

'খানিকটা মানে কতদূর?' পরাশর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাছাকাছি কোথাও যাচ্ছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, মানে—' জ্যানেটকে এই প্রথম একটু যেন হতভম্ব করতে দেখা গেল।

'কিন্তু কাছাকাছি যাবার মতো জায়গা তো এই এক হাউজ খাস।' পুলিশ অফিসার এবার নিজেকে যেন আর রুখতে না পেরে জ্যানেটকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেখানে কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'যেখানেই যাই,' মুহূর্তেই জ্যানেটের চোখে আর গলায় আগুন, 'তাতে আপনাদের কী দরকার? কাউকে আমার গতিবিধির রিপোর্ট দিতে হবে নাকি?'

'না, না,' পরাশর অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে মাফ চাইলে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আমাদের অফিসারের কথা আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। উনি সেরকম কিছু বলতে চাননি।'

'কী বলতে চেয়েছেন তা হলে?' জ্যানেটের মেজাজ তখনও চড়া, 'টায়ার ফেটে আমার গাড়ি অচল হবার পর ওঁদের হঠাৎ উদয় হবার মানেই বা কী?'

'নিশ্চয়ই কিছু একটা ভুল হয়েছে,' পরাশর যেন অপরাধীর মতো কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হল, 'ওঁরা এ রাস্তায় কোনও একটি বিশেষ কারণে নিশ্চয় টহল দিচ্ছেন। তার মধ্যে আপনাকে গাড়ি থামাতে দেখে দাঁড়িয়েছেন। তাই না?'

শেষ প্রশ্নে পুলিশ অফিসারের কাছেই সমর্থনটা চাওয়া হল।

অফিসার কিন্তু সায় দিলেন না।

একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মাফ করবেন মিস্টার—'

নামটা না জানার জন্যে অফিসার একটু থামতেই পরাশর তাড়াতাড়ি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাঁকটা পূরণ করল। এই সুযোগটির জন্যই যেন সে মুখিয়ে ছিল এমনভাবে সে বললে, 'ভার্মা, পরাশর ভার্মা। আর আমার এই বন্ধুটি হলেন কৃত্তিবাস ভদ্র, যে সে লোক নয়, মস্ত এক কাগজের সম্পাদক। আমরা অল ইন্ডিয়া ট্যুরে বেরিয়েছি।'

পরাশরের এই মাত্রাজ্ঞানের অভাবে আমি তো অপ্রস্তুত ও বিরক্ত বটেই, অফিসারের মুখে অধৈর্যের রেখাটাও খুব অস্পষ্ট তখন নয়।

pathagar.net

পরাশরকে তার উচ্ছ্বাস থামাবার সুযোগ দিয়ে এবার বেশ একটু শুকনো গলাতেই তিনি বললেন, 'শুনুন মি. ভার্মা আর মি. ভদ্র, আমাদের ওপর ইনস্ট্রাকশন যা আছে তা একটু আলাদা, ঠিক রুটিনমাফিক আমরা এখানে এসে দাঁড়াইনি।'

'তা হলে?' পরাশরকে বেশ অবাক ও অসন্তুষ্টই মনে হল।

'আমাদের এ গাড়িটা একটু তল্লাশি করতে হবে।'

'এ গাড়ি তল্লাসি করতে হবে!' পরাশর যেন স্তম্ভিত। 'এইরকম আপনাদের ওপরে নির্দেশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' অফিসারের গলায় একটু ভুয়ো খাতিরের বিদ্রুপ মেশানো সুরই শোনা গেল, 'ওঁকে টায়ার ফাটার দরুন গাড়িটা এখানে দাঁড় করাতে হয়েছে। তা না হলে আমাদেরই ওঁর গাড়ি থামিয়ে সার্চ করতে হত।'

'তার মানে ওঁর গাড়ির বর্ণনা, নম্বর সব আপনাদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল!' পরাশরের গলায় স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'শুধু তা-ই নয়', অফিসার যেন পরাশরকে কায়দায় পেয়ে বেশ একটু বিঁধিয়ে বললেন, 'উনি যে এই রাস্তায় আজ রাত্রে এরকম সময় আসবেন, তা-ও।'

'নির্দেশটা কি মৌখিক?' পরাশরকে রীতিমতো সন্দিগ্ধ মনে হল।

'না, মৌখিক হবে কেন!' অফিসার পরাশরকে অপ্রস্তুত করবার সুযোগটা পুরোপুরি নিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পরাশরের সামনে ধরলেন।

পুলিশ থানার সরকারি নির্দেশের কাগজ যেমন হয় তেমনই কার্বন দিয়ে কপি করা অর্ডার। পরাশরের পাশে থেকে উঁকি দিয়ে ভাল করে সবটা পড়তে পারলাম না। তবু সামান্য একটু বর্ণনার অংশ আর গাড়ির নম্বরটা চোখে পড়ল। বর্ণনার অংশটুকুতে একজন মহিলা ড্রাইভারের কথা আছে আর নম্বর যা দেখলাম তা জ্যানেটের গাড়ির।

পরাশর কাগজটা হাতে নিয়ে যেভাবে কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাতে মনে হল, এরকম একটা সম্ভাবনা সে কল্পনাই করতে পারেনি।

তারপর কাগজটা অফিসারের হাতে ফেরিয়ে দিলেও সে কিন্তু ভালমানুষের মতো ব্যাপারটা মেনে নিলে না।

বরং রোখটা বাড়িয়েই বললে, 'অর্ডার আপনাদের আছে ঠিকই, কিন্তু আমি প্রতিবাদ করে জানাচ্ছি যে এ আপনাদের অন্যায় জুলুম। এ ভদ্রমহিলাকে এভাবে বিব্রত করবার আপনাদের কোনও অধিকার নেই।'

'আপনার সব কথাই মানলাম।' কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে অফিসার এবার একটু হেসে তাঁর বিদ্রুপটাকে আরও অসহ্য করে তুলে বললেন, 'কিন্তু আমরা হুকুমের চাকর।'

'হুঁ, হুকুমের চাকর।' পরাশর কী যেন একটু ভেবে নিয়ে এবার বললেন, 'বেশ হুকুম যা পেয়েছেন তা-ই আপনারা তামিল করবেন। কিন্তু গাড়ি সার্চ করবার আগে ওঁর ফাটা টায়ারটা বদলাতে আপনাদের সাহায্য করতে হবে।'

'সাহায্য করতে হবে!' অফিসার এক মুহূর্তের জন্য গরম হয়ে উঠে যেন প্রতিবাদই করতে যাচ্ছিলেন মনে হল। তার পরই কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে আবার একটু হেসেই বললেন, 'বেশ, তা-ই করব। আমাদের নিজের গরজেই ফাটা টায়ারটা বদলানো দরকার হতে পারে।'

'হ্যাঁ, সেটাই তো আপনাদের আগে ভাবা উচিত ছিল।' পরাশর তেতো গলায় জানালে, 'তল্লাশিতে কিছু যদি পান তা হলে গাড়িটা থানায় টেনে নিয়ে যাবার জন্যেও তো চাকাটা পাল্টানো দরকার। বেশ দেখুন, কী দেখতে চান।'

'না!'

শান্ত কঠিন ঠান্ডা অথচ তীব্র গলাটা শুনে চমকে গেলাম। এতক্ষণ নিজেদের আলোচনাতেই তন্ময় থাকার দরুন জ্যানেটের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তারও যে এ

বিষয়ে একটা নিজস্ব বক্তব্য থাকতে পারে সে কথাটা মনেই হয়নি।

জ্যানেটের এখন সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা, সে চটুল লাস্যময়ী মেয়ে আর নয়। একেবারে যেন ধারালো ইস্পাতের ফলা। দাঁড়াবার ভঙ্গিটাই এখন অন্যরকম। পুলিশ অফিসার আর সেই সঙ্গে আমাদের দিকেও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে তখন সে বলে যাচ্ছে, 'শুধু একটা চোখা কাগজ দেখিয়েই আমার গাড়ি সার্চ করবার কোনও এক্তিয়ার আপনাদের নেই। আপনাদের ওই পুলিশ দপ্তরের অর্ডার আমার ওপর খাটে না। এ দেশের মেয়েদের পোশাক পরলেও আমি আপনাদের মতো ভারতীয় নাগরিক নই। অন্য দেশ থেকে এসেছি। আমায় কোনওরকম অপমান করলে আপনাদের বৈদেশিক দপ্তর পর্যন্ত তার ধাক্কা পৌঁছবে—তা বুঝে যা করবার করবেন।'

কথা যা শোনবার শুনেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার চোখ দুটোই মুগ্ধ বিস্ময়ে মেয়েটিকে যে লক্ষ করছে এ কথা অস্বীকার করব না। আজই ঘণ্টাখানেক আগে যাকে প্রায় নিরাবরণা দেখে একটা অবজ্ঞা মেশানো কৌতুক অনুভব করেছি, তারই ভেতর এমন আগুনের হলকা লুকিয়ে ছিল!

নিজের পরিচয় যা দিচ্ছে তা সত্য হলেও, তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিটা সত্যিকার অপরাধ ঢাকবার একটা অভিনয় হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু অভিনয় হলেও দেখবার মতো আর দেখে মনে রাখবার মতো।

আমাদের পুলিশ অফিসার সাহেবের অবস্থা তো এই জ্বলন্ত ভাষণ শুনে বেশ কাহিল। 'না, মানে –' অফিসার সাহেবের জিভ তখন তাঁর বক্তব্য বোঝাতে জড়িয়ে যাচ্ছে, 'আমাদের ওপর আপনি মিছে রাগ করবেন না। আমরা মানে জানতাম না তো।'

পরাশর এবার যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'জানতেন না।' পরাশর একেবারে আগুন! 'না জেনে এরকম কাজে আসেন কেন? আপনাদের পাঠায়ই বা কারা? তাদের স্পর্ধার একটা উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত।'

অফিসারকে চোখ রাঙাতে রাঙাতে হঠাৎ থেমে গলাটা নামিয়ে পরাশর একেবারে ভিন্ন সুরে জ্যানেটকে যেন উসকানি দিয়ে, 'আমার কী মনে হয় জানেন, ঠেলাটা বোঝাবার জন্যেই আপনার গাড়িটা ওদের সার্চ করতে দিলে বোধহয় ভাল হয়। অকারণ যে জ্বালাতন ওরা আপনাকে করেছে অমিত তার সাক্ষী। তল্লাশি করতে দিয়ে এ বেয়াদবিকে চরমে উঠতে দিন। তারপর যা করবার, আপনি করবেন।'

পরাশরের এ উসকানি বৃথাই গেল।

'না!' জ্যানেটের সেই এক কথা। 'নিজে থেকে আমার গাড়ি ছুঁতে আমি দেব না। তা সত্ত্বেও জোর করে যদি ওঁরা সার্চ করতে চান তো করুন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ আমার মতের বিরুদ্ধে করতে হবে।'

'দেখুন, আমি নিরুপায়,' জাঁদরেল অফিসার একেবারে কাঁচমাচু মুখ করে হাত দুটো শুধু কচলাতে বাকি রেখে বললেন, 'আপনি যা বলছেন তাতে ফলাফল কী দাঁড়াবে বুঝেও আপনার মতের বিরুদ্ধেই সার্চ আমায় করতেই হবে।'

জ্যানেট গুম হয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর হঠাৎ পরাশরের দিকে ফিরে বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?'

'নিশ্চয় পারেন। খুব পারেন!' পরাশর বাধিত হয়ে তৎক্ষণাৎ যেন হুজুরে হাজির। হেসে বললে, 'বলুন, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'আপনার গাড়িতে আমায় একটু লিফট দেবেন।'

'লিফট!' পরাশরের নিজেকে একটু বুঝি সামলাতে হল। জ্যানেটের কাছ থেকে এরকম অনুরোধ আসতে পারে সে ও ভাবতে পারেনি বোধহয়। সামলাতে তার যে এক কি দু সেকেন্ড লাগল তা পরাশর অবশ্য ভুলিয়ে দিলে উচ্ছ্বসিত ভাষণে, 'আপনি লিফট চাইছেন, এ তো

আমার পরম সৌভাগ্য। নেহাত অগম্য না হলে যেখানে বলবেন সেখানে আপনাকে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত।'

'না, অসম্ভব কোনও আবদার আমার নেই।' গম্ভীর ভাবেই কথাটা বলে জ্যানেট পুলিশ অফিসারের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আবার ফিরল। তারপর ব্যাগ খুলে একটা চাবি বার করে যেন ঘৃণাভরে সেটা হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললে, 'নিন, এই আমার গাড়ির চাবি। যত খুশি তল্লাশি করে গাড়িটা শুধু আমার ঠিকানায় পৌঁছে দেবেন।'

কিন্তু গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে অফিসার একটু দ্বিধাভরে বলতে গেলেন, 'আমি বলছিলাম কী—'

তাঁকে কথার মাঝখানেই থামিয়ে জ্যানেট প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'কী বলতে চান, কী? আমার ঠিকানা আপনারা জানেন না? না, গাড়ি সার্চের সঙ্গে আমার গ্রেফতারি পরোয়ানাও এনেছেন?'

'না, না, সেসব কিছু নয়।' কোনওরকমে তাড়াতাড়ি অফিসার কথাগুলো বলে ফেললেন, 'আপনাকে গ্রেফতারের কোনও প্রশ্নই নেই। তবে গাড়িটা সার্চ করবার সময় আপনার নিজের থাকাই উচিত। নিরপেক্ষ সাক্ষীও দু-একজন থাকলে ভাল হয়।'

'অত ভালয় আমার দরকার নেই!' ঝাঁঝিয়ে উঠল জ্যানেট। 'আপনারা মনের সুখে নিজেরাই যত খুশি তল্লাশি করুন। পারেন তো সেরকম মাল ভেতরে কোথাও লুকিয়ে রেখে দিন। আমার যা করবার আমি যথাসময়ে করব। আসুন, মিঃ ভার্মা' বলে জ্যানেট অফিসারের দিকে শেষবার চরম অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে নিজেই আগে আমাদের গাড়িতে গিয়ে উঠল।

জ্যানেট সামনেই গিয়ে উঠেছিল। পরাশরকেও গাড়ি চালাবার জন্য সামনেই বসতে হবে। আমি তাই দরজা খুলে পেছনেই বসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু জ্যানেট বাধা দিলে, 'ও কী! পেছনে কেন? সামনে এসে বসুন!'

'না, আমি এইখানেই বসছি' বলে বসতে গিয়েও আবার নামতে হল।

'কথা শুনছেন না কেন?' জ্যানেটের প্রতিবাদ এবার অস্বাভাবিক রকম তীব্র! 'সামনে কি জায়গার অভাব আছে! ওখানে একা বসলে আমায় অপমান করা হয়, তা জানেন?'

'জানতাম না।' সামনে গিয়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসার বদলে কোনও মহিলাকে একটু আরামে বসবার সুবিধে দেওয়াটা কোন দিক দিয়ে অপমান তা-ও বুঝতে পারলাম না। তা সত্ত্বেও সামনে গিয়েই বসতে হল। জ্যানেট নিজেই তখন দরজা খুলে ধরেছে।

দরজাটা বন্ধ করে বসবার পর পরাশর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'বলুন, কোথায় যাব?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানে পৌঁছে দিন।' জ্যানেট টমসন রোডের একটা ঠিকানা দিলে তারপর।

ঠিকানাটা অবশ্য আমাদের অজানা নয়। পরাশরের নির্দেশে ওই ঠিকানার স্কাইস্ক্রেপারের চুড়োর ফ্ল্যাটটাই আমায় নজরবন্দি রাখতে হয়েছে।

পরাশর তবু ন্যাকা সাজল। বললে, 'আপনি ওইখানেই থাকেন বুঝি?'

জ্যানেট পরাশরের দিকে ফিরে তাকাল। তার চাউনিটা দেখতে পেলাম না, কিন্তু গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাসই যেন পেলাম। বললে, 'হ্যাঁ, দিন দুয়েক অন্তত আছি, আর আজ রাতটা অন্তত থাকব।'

কিন্তু পরাশর জ্যানেটের কথার প্রচ্ছন্ন খোঁচাটা যেন বুঝতে না পেরে বললে, 'আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানেও তো আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। এতদূর এসে আবার ফিরে যাবেন কেন?'

'যাব,' এবার জ্যানেট স্পষ্ট হেসে বললে, 'আমার যাবার গোপন জায়গাটা আপনাদের জানাতে চাই না বলে। তা ছাড়া আপনাদের পুলিশ যখন একবার পিছু লেগেছে তখন

পালাবার মতলব যে আমার নেই, বাসস্থ থেকে সেটাও প্রমাণ করতে চাই।'

ফাঁকা অরবিন্দ আশ্রম মার্গ ধরে পরাশর তখন প্রায় পুরো বেগে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। জ্যানেটের দিকে না ফিরে সোজা সামনের দিকেই চোখ রেখে সে গলায় বেশ একটু ক্ষোভ মিশিয়ে জ্যানেটের প্রতি সহানুভূতি জানালে, 'সত্যি, পুলিশের এ ব্যবহারটার মানে আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি পারছি।'

অবাক হয়ে জ্যানেটের দিকে তাকালাম। পরাশরের পা-টাও তখন বুঝি অ্যাকসেলারেটরের ওপর থেকে সরে গেছে। গাড়িটার গতি মন্থর হয়ে এল।

'বুঝতে পারছেন আপনি?' পরাশরের গলায় আমার প্রশ্নটাই ধ্বনিত হল।

'হ্যাঁ, ওরা আমাকে চোরা চালানদার বলে ভেবেছে।'

'আপনাকে চোরা চালানদার!' পরাশর যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'না, না, নিশ্চয়ই ওদের ভুল হয়েছে। যা-তা অমনই ভাবলেই হল?'

'ঠিক যা-তা ভেবেছে বলা চলে না,' জ্যানেট নিজের বিরুদ্ধেই যেন ওকালতি করলে, 'ওদের এ রকম ভাববার কারণ একেবারে যে নেই তা নয়।'

'কারণ আছে? কী কারণ?' পরাশর যেন ক্ষুব্ধ।

'কারণ আপনারাও খানিকটা জানেন।'

'আমরা জানি!' পরাশরের বদলে এবার আমিই সবিস্ময়ে না বলে পারলাম না।

'হ্যাঁ, আপনারা তো বলতে গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।' জ্যানেট যেন নেহাত সহজভাবে কিছু না জেনে খোঁচাটা দিয়ে বললে, 'আমি যে কলকাতা, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, ভূপাল নানা জায়গায় এরকম মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি তা তো আপনারাই জানেন। আপনারা যা জানেন পুলিশ কি আর সে খবর রাখে না? তারা হয়তো আপনাদের চেয়ে বেশি কিছু জানে। জানে যে আমি শুধু নানা জায়গায় ঘুরেই বেড়াচ্ছি না, নানা পোশাকে নানা নামে এমন কিছু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করছি যাদের অদ্ভুত রহস্যময় বলেই মনে হয়।'

আমি তো সত্যিই এবার বিস্ময়ে স্তব্ধ। পরাশরকেও ভিন্ন কারণে খানিকটা সেইরকম ভান করে চুপ করে থাকতে হল। তার পর বেশ যেন একটু বিমূঢ় স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তা হলে নিজেই স্বীকার করছেন যে পুলিশের সন্দেহ হবার মতো কিছু গতিবিধি আপনার ছিল?'

'একটু খোঁজ করলেই যার প্রমাণ পাওয়া যাবে তা অস্বীকার করে তো কোনও লাভ নেই।' জ্যানেট যেন উদাসীন।

'কিন্তু আপনি যা করেছেন,' আমিই উদগ্রীব হয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে সবের একটা সংগত ব্যাখ্যা তো আছে?'

'গোপন চোরা চালানই সেই ব্যাখ্যা বলে পুলিশ মনে করে।' জ্যানেট একটু হাসল। 'তাই বলেছিলাম, পুলিশের আমার পেছনে লাগার মানেটা অন্তত আমি বুঝতে পারছি।'

পুলিশ যা ই ভাবুক, আপনার আসল ব্যাখ্যাটা তা হলে কী? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও হঠাৎ একটু শিউরে ও সচকিত হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

এ কী, করছে কী জ্যানেট!

পরাশর তখন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলছে, 'আপনি যা-ই বলুন, পুলিশের কাজ আমি সমর্থন করতে পারছি না। কাকে কান নিয়ে গেছে শুনে কাকের পেছনে দৌড়োনো তো কাজ নয়। বাইরে থেকে যতই সন্দেহের ব্যাপার মনে হোক, শুধু তারই ওপর নির্ভর করে আপনার মতো কাউকে এরকম হয়রান করবার ওদের কোনও অধিকারই নেই।'

পরাশর যখন তার কথা বলে যাচ্ছে তখন তার দিকে ফিরে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আমায় অমন করে ঠেলছে কেন জ্যানেট?

প্রথমে তার হাতটা কোমরের কাছে ঠেকায় হঠাৎ অসাবধানে অজান্তে লেগে গেছে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা তো নয়! হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ঠেলে সে স্পষ্ট আমায় কী যেন ইঙ্গিত করতে চাইছে।

খানিক আগেই কথা বলতে বলতে নিজের ব্যাগটা থেকে ছোট আয়না আর লিপস্টিকটা বার করে সে ঠোঁটে একটু-আধটু লাগাচ্ছিল।

লিপস্টিক লাগানো শেষ করে হ্যান্ডব্যাগটা কোলের কাছে নামানোর ছল করেই এই আঙুলের ইশারা শুরু।

মথুরা রোড থেকে বাঁক নিয়ে পরাশর তখন তিলক ব্রিজ পেরিয়ে কাউল অ্যাভেনিউ ধরেছে।

আর খানিক বাদেই জ্যানেটের টমসন রোডের আস্তানায় পৌঁছে যাব।

সেখানে গিয়ে না থামা পর্যন্ত আঙুলের এই গোপন ইশারা চলবে নাকি?

এরপর জ্যানেট যা করলে তা আরও বেশি অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত। আমি হাতটা নামাতেই খপ করে ধরে ফেলে সে তাতে যা গুঁজে দিলে, ঠান্ডা মসৃণ স্পর্শ আর আকার থেকে সেটা তার লিপস্টিকের খাপ বলেই মনে হল।

আমারই বা এ অবস্থায় কর্তব্য কী?

মন স্থির করবার সময় পেলাম না। তার আগেই একটা বিরাট স্কাইস্ক্রেপার বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে পরাশর গাড়িটা ঢুকিয়ে বিরাট পোর্টিকোর নীচে থামিয়েছে। কিছু বলা বা করা আর হল না। বাধ্য হয়ে জ্যানেটকে নামতে দেবার জন্য দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

'অনেক ধন্যবাদ!' বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জ্যানেট নেমে ভেতরে চলে গেল।

জ্যানেটের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে আমাদের হোটেল বিশেষ দূর নয়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেলাম।

গেটম্যান এবার আর ঘুমোচ্ছে না। ভেতরে যাবার রাস্তার কাছেই দাঁড়িয়ে।

পরাশর আমায় গেটে নামিয়ে গাড়ি কম্পাউন্ডের ভেতর রেখে আসতে গেল। গেটম্যানের সেলামের ঘটাটা এবার দেখবার মতো।

সম্মানটা আমাদের চেয়ে গাড়িটার জন্যই যে দেওয়া তা বুঝে একটু অস্বস্তি বোধ করে পরাশরের জন্য অপেক্ষা না করে ভেতরের লবিতে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লবি একেবারে খালি। আমরা বেরিয়ে যাবার সময় যাকে দেখেছিলাম সেই হোটেল-ক্লার্কও সেখানে নেই।

অথচ অফিসের টেলিফোনটা সমানে বেজে যাচ্ছে।

এ টেলিফোন ধরা আমার দায় নয়। তবু সামনে একটা টেলিফোন এ রকম অবিরাম বেজে যেতে শুনলে অত্যন্ত অস্বস্তি লাগে। কিন্তু করবই বা কী?

একেবারে নিজেদের কামরাতেই কি চলে যাব?

তাই বা যাব কী করে? কামরার চাবিটা তো পরাশরের কাছে। আবার কম্পাউন্ডে ফিরে গিয়ে পরাশরের দেরি হবার কারণটা দেখব কি না ভাবছি, এমন সময়ে পরাশরকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখলাম।

ফোনটা তখনও থামেনি। বললাম, 'অনেকক্ষণ থেকে বাজছে। আমি তো ঢোকার পর থেকে শুনছি। হোটেল-ক্লার্ক কোথায় গেছে কে জানে!'

হঠাৎ পরাশর যা করে বসল তাতে আমি অবাক। কাউন্টারে হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে বললে, 'হ্যালো, মেহরা বলছি।'

ওদিকের কথাটা শুনতে পেলাম না, কিন্তু আওয়াজ থেকে বুঝলাম কথাটা ধমকের সঙ্গে ক্রুদ্ধ একটা গালগাল।

পরাশর নির্বিকার মোটেই নয়, একেবারে যেন লজ্জায় দুঃখে কাতর।

জড়ানো ধরা গলায় প্রায় করুণ স্বরে বললে, 'ভেরি সরি।'

ওদিক থেকে আর একটা ধমক এল। পরাশর তাতে নিরুত্তর।

এবারে খুব জবরদস্ত গলায় কোনও জিজ্ঞাসার আওয়াজ পাওয়া গেল।

জিজ্ঞাসাটা যে কী পরাশরের জবাবেই তা বুঝলাম। বেশ চোস্ত হিন্দিতে সে বলছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এইমাত্র এসেছে, হ্যাঁ, দুজনেই। লিফটের দিকে যাচ্ছে।' পরাশরকে ফোন নামাতে দেখে বুঝলাম ওদিকের বার্তা দেওয়া শেষ হয়েছে।

কাউন্টারের পেছনে সার্ভিস উইং-এর দিক থেকে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তার পর যে লোকটি এসে ঢুকল সে সেই হোটেলের ক্লার্ক। কোনও অনিবার্য কারণে ভেতরের বাথরুম-টাথরুমে গিয়েছিল নিশ্চয়।

'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?' হোটেলের ক্লার্ক অফিসে এসে ঢুকতেই পরাশর খেঁকিয়ে উঠল, 'কী রকমের হোটেল এটা, বোর্ডাররা সামান্য একটু সার্ভিস পায় না! দশ মিনিট ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি জানেন।'

'অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। মাফ করবেন,' হোটেল-ক্লার্ক মিনতির স্বরে বললে, 'আমি কিন্তু মিনিট পাঁচেক মাত্র একটু ভেতরে গেছলাম।'

পরাশর গরম গলায় বললে, 'আপনার সঙ্গে এখন তর্ক করতে চাই না, আমাদের ডুপ্লিকেট চাবিটা দিন।'

'ডুপ্লিকেট চাবি!' হোটেল-ক্লার্ককে রীতিমতো বিব্রত মনে হল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি!' পরাশর প্রায় ধমকে উঠল।

'না, না, কৈফিয়ত দেবার কথা কেন বলছেন।' হোটেল-ক্লার্ক একেবারে কাঁচুমাচু। 'আমি তো আপনাদের হুকুম তামিল করবার জন্যেই আছি,' বলে হোটেল-ক্লার্ক ডুপ্লিকেট চাবি বার করতেই অফিসের অন্য দিকে গিয়ে একটা দেরাজ খুললে।

কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! ডুপ্লিকেট চাবি সেখানে নেই।

হোটেল-ক্লার্ক ছাইয়ের মতো মুখ করে তাই জানালে, 'আজ্ঞে, আপনাদের ডুপ্লিকেট চাবিটা তো পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছেন না?' পরাশরের গলায় যেন আর্তনাদ, 'বলেন কী!' বলতে বলতে পরাশর তখন কাউন্টারটা ঘুরে অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। সেখানে নিজেই গিয়ে ড্রয়ারটা দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে বললে, 'এই তো আপনাদের সব ডুপ্লিকেট নম্বর দিয়ে রাখা আছে। শুধু আমাদেরটাই নেই!'

ফিরে দাঁড়িয়ে আর অগ্নিমূর্তি নয়, একেবারে গভীর হতাশার চেহারা নিয়ে সে বললে, 'এখন আমাদের উপায়?'

উপায় হোটেল ক্লার্কও তখনই কিছু বাতলাতে পারল না।

পরাশর বললে, 'আমাদের তা হলে অন্য খালি কোনও একটা কামরা দিন। এই নিশুতি রাতে আপনাদের লবির সোফায় শুয়ে তো রাত কাটাতে পারব না। যেখানে আছি সেই পাঁচতলায় হলেই ভাল হয়।'

হোটেল ক্লার্ককে উত্তরে কিছু বলবার অবসরই দিলে না পরাশর। হোটেলের আটঘাট সবই যেন তার জানা, এমনভাবে হঠাৎ কাউন্টারের কাছে এসে একটা চার্টের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে সে বললে, 'এই তো পাঁচশো পনেরো নম্বরটা খালি, দেখছি। ওইটেই আমাদের দিন-না।'

'আজ্ঞে, ওইটে মানে—' হোটেল-ক্লার্ক ওইটুকু বলবার আগেই দেখলাম পরাশর নম্বর দেওয়া বোর্ড থেকে চাবিটা তুলে নিয়েছে।

বাইরে এসে আমায় নিয়ে পরাশর ভেতরের লিফটের দিকেই পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু ক-পা গিয়েই থামতে হল।

'প্লিজ স্যার, একটু শুনুন!' বলে হোটেল-ক্লার্ক করুণভাবে পেছন থেকে ডাকছে।

হোটেল-ক্লার্কের পিছু ডাকাটা কিন্তু এবার জোর করে নিয়ে আসা নতুন কামরার চাবি সম্পর্কে নয়। আমাদের শুধু একটু সাবধান করবার জন্যই সে পিছু ডেকেছে। আমরা পশ্চিম দিকের লিফটে যেন না যাই, এই তার অনুরোধ।

'কেন? কী হয়েছে সে লিফটের?' পরাশরের একটু সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, 'দু-ঘণ্টা আগেই তো সেটা দিয়ে নেমেছি।'

'আজ্ঞে, তারপর বিকল হয়েছে।' হোটেল-ক্লার্ক অপরাধীর মতো জানালে, 'আপনারা অনুগ্রহ করে ইস্ট ব্লকের লিফটটা দিয়ে যান।'

'বেশ, তাই যাচ্ছি' বলে পরাশর ইস্ট ব্লকের করিডরের দিকে অগ্রসর হল।

হোটেল কাউন্টার থেকে একটু দূরে আসবার পরই, আর কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারলাম না। 'ঘরের চাবি কি সত্যি তুমি হারিয়েছ?'

'হারাব কেন?' পরাশর প্যান্টের পকেট থেকে চাবিটা বার করেই দেখালে।

'তা হলে হারিয়েছ বলে অন্য কামরার চাবি নেবার মানে?'

'মানেটা ওপরে গেলেই আশা করি বোঝা যাবে।'

ওপর থেকে লিফট তখন নেমে আসায় লিফটম্যান তার দরজা খুলেছে আর পরাশর লিফটে ঢুকতে না ঢুকতেই তার সঙ্গে আলাপে মগ্ন হয়ে গেছে।

'বড় অসময়ে বিরক্ত করছি, না লিফটম্যানজি?'

লিফটম্যান শুকনো গলায় জানায়, 'আমার তো ওই ডিউটি সাব!'

'তবু এত রাত্রে আমাদের মতো বেশি কেউ জ্বালায়?'

'জ্বালাবার কথা কেন বলছেন, সাব?' লিফটম্যানকে মৃদু প্রতিবাদ জানাতেই হয়, 'যাঁরই দরকার পড়ে তিনিই এ সময়ে লিফট ব্যবহার করেন।'

লোকটিকে এতক্ষণ ভাল করেই লক্ষ করেছি। আমাদের পশ্চিম ব্লকের লিফটে লোকটিকে এক-আধবারের বেশি দেখিনি, তবু আগের লিফটের দাড়িওয়ালা লিফটম্যানের মতো একে একেবারে নতুন মনে হয় না।

হঠাৎ কী খেয়ালে সেই লিফটম্যানের কথাই এ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, 'আচ্ছা, দাড়িওয়ালা একজন নতুন কেউ তোমাদের কাজে ঢুকেছে?'

আমার প্রশ্নে একটু চমকে ফিরে তাকিয়ে লিফটম্যান ভুরু কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করলে, 'দাড়িওয়ালা লিফটম্যান।'

'হ্যাঁ, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, আজই রাত একটা নাগাদ ওদিকের লিফটে আমাদের নীচে নামিয়েছে।'

এ লিফটম্যানের চোখ তখন আরও একটু বিস্ফারিত। সবিস্ময়ে বললে, 'কিন্তু—ও লিফট তো রাত দশটা থেকে খারাপ হয়ে আছে।'

'রাত দশটা থেকে খারাপ? কী বলছ কী?' এতক্ষণে লিফটের দরজাটা খোলার পর বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম, 'এটা কি ভৌতিক ব্যাপার নাকি? রাত একটায় ওই লিফটেই সেই দাড়িওয়ালা লিফটম্যান যে আমাদের নামিয়েছে।'

'কী জানি, সাব!' পরাশরও বেরিয়ে আসার পর লোকটা অসহায় ভঙ্গি করে বললে, 'ওরকম দাড়িওয়ালা কেউ আমাদের মধ্যে তো নেই।'

লিফটম্যান দরজা টেনে বন্ধ করে নীচে নেমে গেল।

হতবুদ্ধি হয়ে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা শুনলে?'

'শুনলাম। মনে হচ্ছে অঙ্কগুলো সব মিলে যাবার মতো হয়ে এসেছে।'

পাঁচশো পনেরো নম্বর কামরাটা পাঁচতলায় আমাদের কামরারই পাশে। যাবার পথে নজর পড়ল, দিনেরবেলাতেই আমাদের বারান্দার ওপরের ছাদে সিলিং লাগাবার জন্য মিস্ত্রিদের কাজ করতে দেখেছি, তারা কাজ করে চলে যাবার পর সে ছুতোরের কাজের আবর্জনা আর পরিষ্কার করা হয়নি।

কাঠচাঁচা আবর্জনাই একমাত্র নালিশের বস্তু নয়, বারান্দার এদিকটায় কোনও আলোই নেই। মিস্ত্রিরা কাজ করবার সময় আলোর কনেকশন নিশ্চয় কাটিয়ে রেখেছিল। সে কনেকশন আর চালু করবার খেয়াল কারও হয়নি।

মনের ভেতর একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল। কনেকশন না দিয়ে এদিকটা অন্ধকার রাখা কি কারও ভুল, গাফিলতি, না স্বেচ্ছাকৃত ব্যবস্থা?

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পাঁচশো পনেরো নম্বর ঘরের দরজাটা খোলা গেল। কিন্তু ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপতে গিয়ে আবার সেই হতাশা। কামরাটায় আলোর কনেকশন কাটা। অত্যন্ত রেগে গিয়ে তখনই নীচে রুম সার্ভিসে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরাশরই বাধা দিলে।

ঘরের দরজাটা সে তখন বন্ধ করে দিয়েছে। চাপা গলায় আমাকে একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করে সে এবার যা করলে তাতে আমি স্তম্ভিত।

ওপরের এই পাঁচতলার প্রত্যেকটি কামরার পেছনে একটি করে নিজস্ব গোল ব্যালকনি। পেছনের পরদা দিয়ে ঢাকা লম্বা কাচের পাল্লা দেওয়া দরজা খুলে সে ব্যালকনিতে যেতে হয়।

এক কামরার খোলা ব্যালকনি থেকে অন্য ব্যালকনিতে হনুমানের প্রতিভা নিয়েও লাফিয়ে যাওয়া যায় না, কিন্তু এক ব্যালকনির সঙ্গে আর-এক ব্যালকনি তলার দিকে লম্বা সরু চ্যাপটা লোহার পাতের মতো একটা টানা কংক্রিটে যুক্ত। আমাকে ঘরের ভেতর বসিয়ে রেখে পরাশর কাচের পাল্লা খুলে বেরিয়ে বারান্দাটা একটু দেখে আসতে গিয়েছিল।

আলোর জন্য রুম সার্ভিসকে ফোন করবার জন্য আমি তখন উসখুস করছি। নিজেদের কামরায় তো ঢুকতেই পারিনি। তার বদলে মালপত্র বিহনে অন্য একটা কামরায় বিনা আলোয় ভূতের মতো বসে থাকার কী অর্থ তা আমি সত্যি বুঝতে পারছিলাম না।

পরাশর খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়েই বা দেখছে কী? কামরার মতো ঘুপসি অন্ধকার সেখানে অবশ্য নয়। বাইরের রাস্তাঘাট থেকে দূরে ক-টা স্কাইস্ক্রেপারের আলোয় সেখানে অন্তত নিজের হাত-পাগুলো দেখা যায়। আলাদাভাবে আমাদের হোটেলবাড়ির পেছন দিকটার ওপরও নজর রাখা চলে। কিন্তু তাই করতেই কি চাবি হারাবার ভান করে পরাশর এই পাশের কামরায় জেগে রাত কাটাতে এসেছে!

হোটেল ক্লার্ক ডুপ্লিকেট চাবিটা দিতে পারলে অবশ্য এ কামরায় আসতে হত না। এ কামরায় পরাশর কায়দা করে এসেছে তাই বলা যায় না। হোটেলের ডুপ্লিকেট চাবি যে পাওয়া যাবে না তা সে আর আগে থাকতে জানবে কী করে?

ডুপ্লিকেট চাবিটা না থাকা কিন্তু বেশ একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। এত বড় হোটেলে এরকম একটা কাণ্ড তো হবার কথা নয়। আর সব কামরা থাকতে শুধু আমাদের ডুপ্লিকেট চাবিটিই উধাও? এই ব্যাপারেরও কোনও তাৎপর্য আছে কি?

অন্ধকার ঘরে এমন করে বসে থাকা এক অশান্তি।

একটু হাঁফ ছাড়বার জন্যই তাই খোলা ব্যালকনিতে পরাশরের কাছে যাবার জন্য উঠে পড়লাম। কাচের পাল্লা দেওয়া দেওয়ালজোড়া জানলাটা পরাশর এসে খুলেই দিয়েছিল। সে পরদা সরিয়ে ব্যালকনির দিকে পা বাড়িয়েই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

পরাশর কই! ব্যালকনিতে সে তো নেই!

প্রায় অবশ হাত পা নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যা দেখলাম তাতে বুকের ভেতরটা একেবারে হিম।

সেই ছ-তলার ওপরে ব্যালকনি থেকে আমাদের কামরার ব্যালকনির সঙ্গে জোড়া কংক্রিটের লম্বা চ্যাপটা পাতটার ওপর দিয়ে সার্কাসের দড়ির ওপর হাঁটা খেলোয়াড়ের চেয়েও দুঃসাহসে ভর দিয়ে পরাশর পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে!

আতঙ্কের যে চিৎকারটা গলা পর্যন্ত ঠেলে এসেছিল পরাশরকে চমকে দেবার ভয়ে কোনওমতে সেটা চেপে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বদ্ধ পাগলের মতো পরাশর এমন একটা গোঁয়ারতুমি করতে পারে তা কল্পনাতেও আসেনি। দড়ির খেলোয়াড়ের দুঃসাহসের সঙ্গেও তুলনা করা আমার ভুল। তারা তো সারা জীবন ওই সাধনাই করে পাকা হয়েছে। আর পরাশরের এ বিষয়ে কিছু দক্ষতা যদি থাকেও তা তো এমন সত্যিকার ছ-তলার উচ্চতায় পরীক্ষা করবার নয়। একটু পা ফসকালে যে তার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরাশরের পা ফসকাল না।

কয়েক সেকেন্ড বাদে নিরাপদেই অন্য ব্যালকনির কাছে পৌঁছে তার কার্নিশটা সে ধরে ফেললে।

তার পর ব্যালকনির কোমর-ভর দেওয়ালটা টপকে ভেতরে গিয়ে ঢোকার পর এতক্ষণের চাপা উদ্‌বেগের যন্ত্রণার শোধ হিসাবে যখন তাকে যা-নয়-তাই বলতে যাচ্ছি তখন সে আমার দিকে ফিরে অত্যন্ত কড়াভাবে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করবার ইশারা করলে।

চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু পরাশর তারপর যা করলে তার কোনও মানেই বুঝতে পারলাম না।

কাচের পাল্লা দেওয়া বিরাট জানলাটা বাইরে থেকেই কী কৌশলে খুলে সে ভেতরে ঢুকে পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিলে।

আমাদের কামরাতেই যদি ঢুকবে, তা হলে সোজাসুজি সামনে থেকেই দরজা খুলে তো ঢোকা যেত! এমন চোরের মতো পেছন দিয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ঢোকবার কী দরকার ছিল বুঝলাম না।

কিছুই না বুঝে বোকার মতো বাইরের বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মন-মেজাজ ওরকম খিঁচড়ে না থাকলে দৃশ্যটা সত্যি উপভোগ করবার মতো। দিল্লি শহরের আবহাওয়া তখন অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রায় সারা রাতের অবসরে ধোঁয়া ধুলো একটু থিতিয়ে যেতে পেরেছে। বাতাস যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে তাই। ছ-তলার ওপর থেকে রাস্তাঘাট আর নতুন গড়ে-ওঠা আকাশছোঁয়া সব স্কাইস্ক্রেপারের আকাশ আর মাটির ঝকঝকে আলোয় যেন রূপকথার শহরের মতো দেখাচ্ছে।

চোখে দেখলেও এসব উপভোগ করবার মতো তখন মন নেই। একে তো সেই কলকাতায় হোটেলে জ্যানেটের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর থেকে ধাঁধার পর ধাঁধায় মাথাটা গুলিয়ে আছে, তার ওপর পরাশরের এই এখনকার কাণ্ডটা অবাক করার চেয়েও ভাবিয়ে তুলেছে আরও বেশি।

পরাশর খেয়ালি হতে পারে, কিন্তু একেবারে কোনওরকম উদ্দেশ্য ছাড়া সে আজকের মতো পাগলামি করতে পারে কি!

নিজেদের কামরায় পেছন থেকে কৌশলে ঢোকার জন্য সামান্য পা ফসকালে নীচে পড়ে গিয়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার মতো বিপদের ঝুঁকি সে মিছিমিছি শুধু খেয়ালভরে নিয়েছে বলে মনে হয় না।

কারণটা তার কী হতে পারে?

ও ঘরে এতক্ষণ ধরে করছেই বা কী?

জটিল সব রহস্যের উত্তরগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাব তা অবশ্য তখন ভাবতে পারিনি।

সেই মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত ব্যাপারেও প্রথমটা দিশাহারা হয়ে গেলাম। এত রাত্রে ফোন বাজছে। অন্য কোথাও নয়, ফোন বাজছে যে কামরা বদলি হিসেবে পরাশর একরকম জোর করে নিয়েছে তাইতেই।

বেশ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই ভেতরে গেলাম।

এখন কী করা আমার উচিত? কার না কার কী কারণে ফোন তা-ও জানি না। এ ফোন ধরলে এ কামরায় আমাদের থাকার কথা তো জানিয়ে দেওয়া হবে। পরাশর থাকলে তা কি জানতে দিত? আমাদের এ ঘর নেওয়ার গোপনতাই তো তা হলে ফাঁস হয়ে যায়।

বিরুদ্ধে যেমন, ফোন ধরবার পক্ষেও তেমনই যুক্তি যে নেই তা নয়। আমাদের এ কামরা নেওয়ার কথা একমাত্র হোটেল ক্লার্কই জানে।

কোনও দরকারে সে ও তো ফোন করতে পারে।

সেরকম জরুরি কিছু খবর থাকলে ফোনটা ধরাই ভাল। শেষ পর্যন্ত পরাশরের খানিক আগেকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ফোনটা তুলেই ফেললাম।

তুলে ওধারের সম্ভাষণ শুনে একেবারে তাজ্জব! 'কী করছিলে? এর মধ্যেই ঘুমোচ্ছিলে নাকি?' বেশ বিরক্ত গলাটা আর কারও নয়, পরাশরের।

'তুমি?' সত্যিই আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি পাশের ঘর থেকে ফোন করছ?'

'হ্যাঁ, ঘরে ঘরে ফোন করবার ব্যবস্থা যখন আছে তখন ফোন না করে কি ব্যালকনি থেকে হাঁকাহাঁকি করব?' পরাশরের গলায় অধৈর্য। 'এখন শোনো। ঘরে তো আলো নেই, সুতরাং লিখে কোনও লাভ নেই। নম্বরটা বলে দিচ্ছি। মনে করে রেখে এখুনি দিভেচাকে ফোন করো। বলবে, পরাশর তার কামরায় বন্দি। এখনই যেন তার স্পেশাল স্কোয়াড নিয়ে আসে।' বলেই পরাশর নম্বরটা জানিয়ে ফোনটা নামিয়ে দিল।

যে নম্বর পরাশর দিয়েছিল, সেইটেই এবার ডায়াল করলাম অগত্যা। রিং না হতে হতেই দিভেচার গলা। সে যেন ফোনের কাছে মুখিয়ে বসেছিল।

'হ্যালো, ভার্মা!'

'না, ভার্মা নই।' আমি দিভেচাকে সংশোধন করলাম, 'আমি ভদ্র, কৃত্তিবাস ভদ্র।'

'হ্যাঁ, বলুন। বলুন।' দিভেচাও ধৈর্য ধরতে পারছে না।

'পরাশরই আমায় ফোন করতে বললে।' আমি খবরটা জানালাম, 'সে তার কামরায় বন্দি একথা জানিয়ে আপনাকে স্পেশাল স্কোয়াড নিয়ে এখুনি আসতে বললে।'

একটা হাঁ-হুঁ কি অন্য সম্ভাষণ তারপর শোনা গেল না।

আমার কথাটা শেষ হবার আগেই দিভেচার ফোন নামাবার শব্দ পেলাম।

কী করব আমি এখন? ঘুমোবার কথাই ওঠে না। অন্ধকার ঘর আর আবছা আলোয় বারান্দার মধ্যে পাইচারি করব বাকি রাত?

হঠাৎ মনে হল পরাশরের বুদ্ধিই তো নিতে পারি।

ফোনটা তুলে আমাদের পাশের ঘরের নম্বর ডায়াল করলাম। কিন্তু এ কী! এনগেজড। কার সঙ্গে কথা বলছে পরাশর?

ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে রইলাম। সেই এনগেজড!

পরাশরের কথাই শেষ হচ্ছে না, না ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে হঠাৎ?

বিরক্ত হয়ে ফোনটা নামিয়ে দিলাম আর সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে আমার এ কামরার

দরজায় চাবি ঘোরাবার শব্দ পেলাম। চাবি ঘুরিয়ে এ অন্ধকার খালি কামরা খোলবার চেষ্টা করছে কে?

সন্ত্রস্ত হয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কী জন্য জানি না, পরাশর দরজাটা খোলবার পর আবার ভেতর থেকে চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। চাবিটা তালার ভেতর লাগানোও রয়েছে এখনও। বাইরের চাবি ঘোরানোতে দরজা তাই খুলল না, কিন্তু ওদিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি দেখা গেল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

দরজা খোলার চেষ্টা যে করছে উদ্দেশ্য তার খুব সাধু বোধহয় নয়। নইলে বার বার চাবি ঘোরানোর ভেতর অধৈর্যটা প্রকাশ পেলেও একবার তাকে দরজায় ধাক্কা দিতে বা অন্য কিছু করতে শোনা গেল না। তার চেষ্টাটা সে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দ আর গোপনই রাখতে চায়।

কিন্তু এই বিশেষ কামরাটিতেই এই প্রায় ভোররাত্রে কারও ঢোকবার এত গরজ কেন? ডুপ্লিকেট চাবিও তো সে জোগাড় করেছে দেখা যাচ্ছে। এ চাবি সে পায় কোথায়?

হাজার হলেও তালাটা তো যন্ত্রমাত্র। তার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা কি করা যায়? বার বার নাড়ানাড়ি করতে করতে হঠাৎ বেকায়দায় সেটা খুলেও কি যেতে পারে?

দুরুদুরু বুক নিয়ে সেই খুলে যাবার আশঙ্কায় কতক্ষণ এমন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

খুব বেশিক্ষণ বোধহয় অপেক্ষা করতে হয়নি।

আশঙ্কা উদ্‌বেগের তীব্রতায় সময়ের হিসেব ঠিকমতো তখন ছিল না, কিন্তু মিনিট পনেরো বাদেই বাইরে কী যেন একটা হয়ে গেল।

তারপর দরজার লক থেকে চাবিটা খুলে নেবার [illegible] দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটে যাবার শব্দ পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন।

এগিয়ে গিয়ে ধরলাম।

পরাশরই ফোন করছে। গলাটা [illegible]।

'দিভেচা এসে গেছে। [illegible] বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।'

'কিন্তু—'

'কিন্তুটিন্তু নয়। [illegible] কোনও ভয় নেই।' পরাশর ফোনটা ঝট করে নামিয়ে দিল।

পরাশর মিথ্যে বলেনি। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সত্যি নীচে থেকে পশ্চিম ব্লকের লিফট দিয়ে দিভেচা তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এখন উঠে এসেছে। তাদের সঙ্গে চোরের মতো হোটেল-ক্লার্ক মেহ্‌রাও।

বারান্দায় এখনও আলো নেই। কিন্তু পাঁচজনের হাতে পাঁচটা টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠে আলোর অভাব তখন ঘুচিয়ে দিয়েছে।

দিভেচা এসে আমাদের কামরার দরজায় টোকা দিলে তিনটে। দেবার ছন্দটা একটু বিশেষ। সেই ছন্দেই ভেতর থেকে টোকার আওয়াজ এল।

দিভেচা একবার মেহ্‌রার দিকে ফিরলেন। বললেন, 'ডুপ্লিকেট চাবি তা হলে আপনি এখনও পাননি?'

'আজ্ঞে, না,' হাত কচলাতে কচলাতে করুণভাবে মেহ্‌রা বললে, 'কী করে যে হারিয়ে গেল!'

দিভেচার ইঙ্গিতে তাঁর একজন সঙ্গী কী একটা লোহার কাঠির মতো নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর এক মিনিট না যেতেই দরজা গেল খুলে।

উঃ, সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে দিভেচা পরাশরকে আলিঙ্গনই করে ফেললেন।

'সব ঠিক আছে তো!' দিভেচা উদ্‌বিগ্ন ভাবে তারপর জিজ্ঞাসা করলেন।

pathagar.net

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' পরাশর হেসে কাঠের টেবিলের একটা জিনিসের দিকে আঙুল দেখালে, 'তবে বেঠিক করবার ওই ব্যবস্থাই হয়েছিল। আমি পেছন দিক দিয়ে ঢুকে প্রথমেই দরজার হাতলের সঙ্গে বাঁধা তারটা খুলে দিই। প্যাঁচ যা ছিল তাতে বাইরে থেকে দরজা খুলে ঢোকবার পরই বিস্ফোরণটি হত।'

'হ্যাঁ—' দিভেচা বস্তুটার দিকে চেয়ে বললেন, 'খুব সূক্ষ্ম কাজের জিনিস নয়, তবে টাইম বম্ব হিসেবে ওতেই ওদের শত্রু নিপাতের কাজ সারা হত। অবশ্য ওদের বিষদাঁত আগেই ভেঙে গিয়েছে। আপনাদের ছেড়ে ওই যমজ গাড়িটাকে নিয়ে বেরিয়ে ওদের বড় দলটাকে বমাল সমেত খানিক বাদেই ধরেছি।'

'কিন্তু আসল চাঁদকে এখনও ধরা যায়নি।' পরাশর এইটুকু বলেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, মি মেহ্‌রা, যাচ্ছেন কোথায়?'

'আজ্ঞে,' বিনীত কাতর ভাবে মেহ্‌রা জানালে, 'যা সব ব্যাপার আপনারা বলছেন পুলিশের লোক হয়ে তার যা করবার আপনারা করুন। আমার কিন্তু এ সময়ে হোটেলের কাজে অফিসে না থাকলে নয়।'

'বেশ, হোটেলের কাজই তা হলে একটু করুন।' পরাশর দিভেচার একজন সঙ্গীকে ঘরে পাহারায় রেখে মেহ্‌রার সঙ্গে আমাদের সকলকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললে, 'আপনাদের এদিকের ব্লকের লিফটে একটু নিয়ে চলুন।'

'আজ্ঞে, সেটা তো খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে।'

'কাল থেকে খারাপ হয়ে আছে?' পরাশর কী যেন একটু ভেবে নিয়ে দিভেচাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গোপনে কী বললে। দিভেচার ইঙ্গিতে তার সঙ্গীরা সবাই বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবার পর পরাশর আবার মেহ্‌রার দিকে ফিরে বিনা একটু অভিযোগের স্বরে বললে, 'এত বড় আপনাদের হোটেল, তার একটা লিফট কাল থেকে এখনও পর্যন্ত অচল হয়ে থাকা কি উচিত?'

'আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করছি স্যার।' মেহ্‌রা বিনীতভাবে জানালে, 'কাল থেকেই মেরামতের লোক লেগেছে। এই রাতেও কাজ হচ্ছে।'

'ওঃ, আমি দুঃখিত, রাতেও কাজ হচ্ছে বুঝি?' পরাশর একবার চট করে কামরার ভেতর থেকে ঘুরে এসে বললে, 'চলুন দেখি, কী রকম কাজ হচ্ছে।'

কাজ কী রকম হচ্ছে দেখবার জন্য শেষ পর্যন্ত একেবারে নীচের তলার লিফটের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হল।

যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, খাঁচা তখনও খালি। আমরা গিয়ে দাঁড়াবার খানিক বাদেই কিন্তু লিফটটা নেমে এল।

'লিফট তা হলে ঠিক হয়ে গেছে দেখছি!' পরাশর ভেতরের মিস্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমরা উঠতে পারি?'

'না,' মিস্ত্রি মাথা নেড়ে জানালে, 'এখনও কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। একটু চালিয়ে দেখে নিচ্ছি।'

'বেশ, তাই দেখুন তা হলে।' পরাশরের ইশারায় দিভেচাই বাইরের কোল্যাপসিবলে একটা তালা এঁটে দিলেন।

'ওটা কী করলেন?' বিস্মিত আর তার সঙ্গে একটু রুক্ষ গলাতেই জিজ্ঞাসা করলে মিস্ত্রি।

দিভেচার এই তালা দেওয়ায় যেমন লিফটের মিস্ত্রিকে দেখেও তেমনই আমি বেশ একটু অবাক হয়েছি। মিস্ত্রি আর কেউ নয়, রাত্রে আমাদের যে নামিয়ে ছিল সেই দাড়িওয়ালা লিফটম্যান।

'কেন, দোষ কিছু আছে?' মিস্ত্রির কথার উত্তরে দিভেচা তখন বলছেন, 'অচল লিফট—ভুল করে কেউ যাতে ঢুকে অ্যাকসিডেন্ট না করে তাই সব ল্যান্ডিংয়ের গেটেই তো তালা দেবার ব্যবস্থা করেছি।'

'সব ল্যান্ডিংয়ের গেটে তালা দিয়েছেন?' মিস্ত্রির গলা এবার রুক্ষর চেয়ে যেন হিংস্রই মনে হল।

'হ্যাঁ, পিটার।' তার কথার উত্তরে শান্ত মোলায়েম স্বরে বললে পরাশর, 'নিজে থেকে যদি তুমি সব স্বীকার করে মাল যা আছে তা বার করে না দাও তা হলে—'

পরাশর এবার যা করলে তাতে আমরাও স্তম্ভিত।

পকেট থেকে আমাদের কামরায় বসানো সেই বোমাটি বার করে কোল্যাপসিবলের ফাঁকে ঝুলিয়ে দেবার উপক্রম করে পরাশর বললে, 'তা হলে তোমাকে একটু সুবুদ্ধি দেবার জন্য এই জিনিসটি চাবি ঘুরিয়ে তোমার ওই খাঁচায় ছুড়ে দিয়ে যাব।'

দাড়িওয়ালা লিফটম্যানের মুখটা তখন ছাই হয়ে গেছে আতঙ্কে।

পিটার—কলকাতার হোটেলে আমাদের অমন নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা যার হাতে হয়েছিল সেই পিটার—শেষ পর্যন্ত সমস্ত মালসমেত সব অপরাধ স্বীকার করে ধরা দিয়েছে। তার আগে যমজ ক্রাইসলার ইম্পিরিয়ালের একটা অন্য দিকে নিয়ে যাবার দরুন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যারা মাল পাচারের ব্যবস্থা করছিল, দিভেচা যমজ গাড়ির অন্যটা নিয়ে হাজির হয়ে রীতিমতো ভড়কে দিয়েই সে দলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। দলটা হল আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের। মাদকটা হল প্রধানত হেরোইন। আর এ দলের পূর্ব এশিয়ার পালের গোদা হল পিটার।

তাদের পেছনে লেগেছি জানতে পেরে পিটার নিজেই আমাদের পেছনে আগাগোড়া ছিল পরাশরকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্য। সে সুযোগও আজ তার হয়েছিল। তার মাল রাখবার অদ্ভুত গোপন ভাঁড়ারের ব্যবস্থাও সে করেছিল হোটেলের লিফটের মধ্যে। হোটেলের ক্লার্ক মেহরা ও আর কয়েকজনকে টাকার হাত করে সে কখনও এটা কখনও অন্য লিফটটা অচল করে তার মধ্যে মাল রাখবার ব্যবস্থা করত। মাল লুকোনোর হাঙ্গামা তো কিছু নেই। একটা থলিতে এক কেজি রেখে পাচার করতে পারলেই আমেরিকার বাজার থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা লাভ।

'কিন্তু নিজের কামরায় না গিয়ে অন্য কামরায় চাবি বার করার খেয়াল তোমার হল কী করে?' পিটারের আত্মসমর্পণের পর আমাদের কামরাতে বসেই পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। হোটেল-ক্লার্ক মেহরাকে পিটারের সঙ্গী করে হাজতে পাঠালেও রুম-সার্ভিসকে ফোন করে কফিও আনিয়ে নেওয়া হয়েছে আমাদের ক জনের জন্যে।

কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে পরাশর হেসে বললে, 'সত্যি কথা যদি বলি, তা হলে কৃতিত্ব আমার খুব বেশি নেই। দৈবের একটু সাহায্য, স্মরণশক্তির একটু জোর আর কাণ্ডজ্ঞানের একটু অভাব না হলে আজ এ ঘরে বসে কফি খেতে হত না। এতক্ষণে মর্গেই শুয়ে থাকতে হত।'

'হেঁয়ালি না করে একটু বুঝিয়ে বলবে?' একটু রেগেই বললাম।

'বুঝিয়েই বলছি।' পরাশর কফির কাপটা শেষ করে নামিয়ে রাখলে, 'প্রথমত ঠিক আমরা লবি দিয়ে যাবার সময় ফোনটা আসা, আর সে সময়ে মেহরার বাথরুমে যাওয়াটা দৈবের সাহায্য। দ্বিতীয়ত একবার মাত্র শুনে মেহরা নামটা মনে থাকাটা আমার স্মরণশক্তির জোর। ও নামটা ফোনে বলতে না পারলে পিটার সন্দিগ্ধ হয়ে হয়তো অন্য ফন্দি খাটাত। পিটার তখন ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে আমাদের এ কামরাতেই বোমা বসানো শেষ করেছে। আমরা এসে পড়েছি জেনে চাবিটা আর সে অফিসে এসে ফেরত দেবার সময় পায়নি, নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে। আমার কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের কথা বললাম এইজন্যে যে হোটেলের অন্য কারও ফোন অমন করে ধরাটা অন্যায় শুধু নয়, বেআইনি। কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে ফোন হঠাৎ না ধরলে আজকের

pathagar.net

ঘটনাগুলো অন্য পথে যেত।' একটু থেমে শেষ রহস্যটুকুও ব্যাখ্যা করবার জন্যে পরাশর আবার বললে, 'পিটার শেষরাত্রে আমাদের কামরার পাশের ঘর যে খুলতে চেয়ে ছিল সে শুধু তার উদ্‌বেগে। এ কামরায় কোনও বিস্ফোরণের শব্দ সে পায়নি। কেন পায়নি, আমাদের অবস্থা কী হয়েছে দেখবার জন্যেই সে পাশের কামরায় ঢোকবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ দিভেচা এসে পড়ায় তাকে ছুটে পালাতে হয়েছে। আমাদের কামরার ফোন যাকে বলে বগড় অর্থাৎ হোটেল-অফিস থেকে ট্যাপ করার ব্যবস্থা আছে সন্দেহ করে আমি কামরা থেকে ফোন না করে, কৃত্তিবাসকে দিভেচার কাছে ফোন করতে বলেছি।'

পরাশরের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ পকেটে হাত পড়ায় চমকে উঠলাম।

জ্যানেটের লুকিয়ে দেওয়া সেই লিপস্টিকের খাপে হাত পড়েছে। লুকিয়ে আর লাভ নেই। তাই ওদের সামনেই সেটা বার করে খুলে দেখলাম।

ভেতরে ছোট চিরকুটে লেখা, 'তোমরা গোয়েন্দা, না গাধা! কলা দেখিয়ে চললাম—এ. আই ৩১২।'

পড়তে পড়তে মুখ তুলে দেখি পরাশর আর দিভেচা মুচকে-মুচকে হাসছে।

'কী এতে আছে তোমরা জানো?' একটু মেজাজ দেখিয়েই বললাম।

'ঠিক জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।' বললে পরাশর, 'জ্যানেট আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যাচ্ছে সেই খবরটাই দিয়েছে বোধহয়।'

'হ্যাঁ, তাই।' বেশ অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু এই এ. আই ৩১২ র মানে কী?'

'ওর মানে,' দিভেচা ব্যাখ্যা করে শোনালেন, 'এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট। সকাল সাড়ে সাতটায় এসে যে প্লেন আটটা পনেরোয় ব্যাংকক সিঙ্গাপুর হয়ে টোকিও যায়, তার নম্বর।'

'জ্যানেট ওই প্লেনে চলে যাচ্ছে! আপনারা ওকে যেতে দিচ্ছেন?' আমি স্তম্ভিত।

'না দিয়ে করব কী।' বললেন দিভেচা, 'ওর গাড়ি ভেঙেচুরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া যায়নি। তার জন্যে বরং আমাদের ভাবতে হবে আমাদের।'

'তার মানে এই দলের সঙ্গে কোনও সংস্রব ওর নেই?'

'পুরো সংস্রব আছে।' হেসে বললে পরাশর, 'দলের চাঁই হল ও আর পিটার। কিন্তু ওকে ধরবার ছোঁবার কোনও উপায় নেই। ও যাকে বলে—পেছনে যারা লাগবে তাদের ভোলাবার ছলনাময়ী। আমাদের পেছনে ছিল পিটার আর সামনে রঙিন টোপ ঝুলিয়ে কখনও জ্যানেট কখনও যমুনা কি নগ্নিকা সেজে ও আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। ওর পেছনে যখন আমরা ছুটছি তখন পেছন থেকে দলের লোক নিশ্চিন্ত হয়ে আসল কাজ সেরেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওর নিজের প্যাঁচেই ওদের জব্দ করেছি। কিছুই পাব না জেনেও একটা গাড়ি নিয়ে ওর পেছনে ছোটবার ছল করে ঠিক ওই চেহারার আর-একটা গাড়িতে আসল দলকে হাতেনাতে ধরবার ব্যবস্থা করেছি। তবু ওর কাছে হার মেনেছিই বলা উচিত।'

আমার দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হেসে পরাশর বললে, 'তোমার সঙ্গে দেখাশোনা তো ওর একটু বেশি হয়েছে।'

'আমার সঙ্গে বেশি? কোথায় আবার হল?' একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললাম, 'তোমার সঙ্গে যতক্ষণ আমার সঙ্গেও তো তাই।'

'না, ওই দূরবিনটার কথা ভাবছি' বলে যেভাবে পরাশর আর দিভেচা এবার হাসল, সেটা আপত্তিজনক বলেই মনে হল আমার।

হিপি-সঙ্গে পরাশর বর্মা

অফিসঘরে ঢুকে একেবারে চমকে গেলাম।

নিজের চোখ দুটোকে একবার রগড়ে নিতে হল। ঠিক দেখছি তো!

হ্যাঁ, ঠিকই দেখছি। আমার অফিসঘরের টেবিলের ওপর পা তুলে পেছনের চেয়ারে হেলান দিয়ে এক সুগঠিতা যুবতী প্রায় তার জন্মকালের পোশাকেই ঘুমোচ্ছে।

মেয়েটি সুগঠিতা যুবতী, কিন্তু যেমন বারো আনা নিরাবরণ তেমনই নোংরা।

গায়ের রংটা আসলে রীতিমতো গৌর নিশ্চয়, কিন্তু ধুলো ও ময়লায় স্নান-প্রসাধনের অভাবে তাতে একটা মেটে তামাটে ছোপ ধরেছে। তার ওপর এমন অপরিষ্কার যে চিমটি কাটলে হাতে ময়লা উঠে আসবে মনে হয়। পাকা ধানের রঙের চুলগুলো তো শনের নুড়ি। মুখের চারধারে চেয়ারের পেছনে সেগুলো এলোমেলো হয়ে ঝুলে আছে।

এ উপদ্রব আমার অফিসে হঠাৎ কেমন করে উদয় হল বুঝতে না পেরে কী করব তা ই ভাবছি। এমন সময় চটকাটা ভেঙে গিয়ে মেয়েটি চোখ খুলে তাকাল।

তারপর জিভ কেটে পুরুষ্ট পা দুটি টেবিলের ওপর থেকে নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে সামান্য একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

এ কথার উত্তর আর কী দেব, তার পরের উক্তির জন্য চুপ করে রইলাম।

'তোমার ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা, আর এয়ারকন্ডিশন্ড নয় বলে খুব আরামের। আমি ওই এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরগুলোকে দেখতে পারি না।'

যদি বা কিছু বলতে পারতাম, আমি তো এইসব শুনে একেবারে নির্বাক।

আমার অফিসটা শোবার ঘর হিসাবে কি ভাড়া দিয়েছি নাকি যে এসব প্রশংসা শুনে আমায় কৃতার্থ হতে হবে।

মুখখানা একটু গম্ভীর করেই এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি আমার এখানেই এসেছেন?'

ইংরেজিতে এক 'ইউ' শব্দই উচ্চারণ ভঙ্গির তারতম্যে তুমি আর আপনির কাজ চালায়।

মেয়েটির বলার ভঙ্গিতে তুমি-র অন্তরঙ্গতার আভাসই ছিল। আমি কিন্তু আপনি-র দূরত্বেই তাকে রেখে প্রশ্নটা করলাম।

মেয়েটি এ প্রশ্নে যেন অপ্রস্তুত চঞ্চল হয়ে উঠল।

'ওই দেখো, তোমায় চিঠিটাই দিইনি বুঝি? এই নাও।'

মেয়েটি তার পাশেই চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রাখা একটা ঝোলা থেকে একটা চিরকুট বার করে আমার হাতে দিলে। ব্যবহারে আর সম্ভাষণে সেই তুমি-র অন্তরঙ্গতা।

চিরকুট ঠিক নয়, ভাঁজ করা একটা চিঠি।

চিঠিটা একবার দু-বার তিনবার ভাল করে পড়লাম। প্রথমে বিস্ময়ে, তার পর রাগে চিঠির কথাগুলো যেন মাথাতেই ঢুকতে চাইল না কিছুক্ষণ।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছে পরাশর।

কৃত্তিবাস

জেসিকে তোমার কাছে পাঠালাম। বড় ভাল মেয়ে। ক-দিনের জন্যে আশ্রয় দিয়ো। আর সাহায্য যা চাইছে তাও।

পরাশর

কোথাকার কে বাউন্ডুলে এক হিপি মেয়ে, তাকে জায়গা দিতে হবে আমাকে?

জায়গাই যদি দিতে হয় তা হলে পরাশর তা দিতে পারে না? তার বাড়িতে জায়গার অভাব?

আমার বরং এই অফিস আর নিজের খাবার শোবার দু-খানি ঘর। আমার সেই আইবুড়োর আস্তানায় এই সোমত্থ বিদেশি মেয়েকে আমি আশ্রয় দেব কোথায়? আমার নিজের বিছানা তার জন্য ছেড়ে দেব?

আমার মনের ভাব যা ই হোক মুখে তা বোধহয় প্রকাশ পায়নি।

মেয়েটি অর্থাৎ জেসি অন্তত আমার মৌনতাকে সানন্দ সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে আমায় ধন্যবাদ দিতেই শুরু করেছে তখন।

'তুমি খুব ভাল লোক। পার্স আমায় বলেই দিয়েছে সে কথা। বলেছে তোমার কাছে আধ্যাত্মিক অনেক কিছুও আমি পাব।'

'কী বলেছে?' আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। 'আমার কাছে স্পিরিচ্যুয়াল গাইডান্স পাবে বলেছে! বলেছে কে?'

'বাঃ, বলেছে তোমার বন্ধু পার্স।' জেসির একটু যেন রেগে যাওয়ার লক্ষণ।

'আমার বন্ধু পার্স!' বাধ্য হয়েই আমায় প্রতিবাদ করতে হল, 'পার্স বলে আমার কোনও বন্ধু নেই।'

'পার্স বলে তোমার বন্ধু নেই!' জেসির মুখে-চোখে একটু অসহায় করুণ ভাব, 'তবে পার্স যে তোমার বন্ধু বলে এ চিঠি দিলে!'

'এই চিঠি?' এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। 'এই চিঠি যে দিয়েছে তার কথা বলছেন? কিন্তু পার্স কী, সে তো পরাশর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পার্সই তো পরাশর।' জেসি গর্বভরে জানালে, 'তোমাদের বাংলা উচ্চারণ আমি খুব ভাল করতে পারি। তোমার এখানে আমি খুব তাড়াতাড়ি বাংলা শিখে নেব দেখবে। রোজ রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে তুমি আমায় শেখাবে, কেমন?'

বলে কী উন্মাদিনীটা! এখানে শুধু থাকতে দিতে হবে না, ওকে রোজ অনেকক্ষণ ধরে বাংলা শেখাতে হবে। আবার রাত্রে!

এবার মনের ভাবটা মুখে কিছু ফুটল বোধহয়।

জেসি তাই দেখেই বোধহয় তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিলে, 'বেশ, রোজ তোমায় শেখাতে হবে না। এক-একদিন বাদ দিয়ো। তবে দেখে নিয়ো দু-মাসের বেশি শিখতে আমার লাগবে না।'

না, আমাকেই এখুনি বুঝি মাথার ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে। মনে হচ্ছে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বুঝি এখুনি খিঁচিয়ে উঠব মেয়েটাকে, কী সে ভেবেছে বলে।

আবদারটা একবার শোনো! আমার এখানে থাকবেন, এক-আধ দিন নয়, দুটি মাস। তাঁকে আবার বাংলা শেখাতে হবে, যাতে পরাশরকে পার্স বলার মতো উচ্চারণের বাহাদুরি তিনি দেখাতে পারেন!

কিন্তু বিদেশি বোকা মেয়েটাকে খিঁচিয়ে লাভ কী! সব কিছুর মূল তো সেই পরাশর।

তার ওপর রাগটা যখন তুঙ্গী হয়ে উঠেছে, সেই সময়ই ফোন বেজে উঠল। ফোনটা পরাশরেরই। রাগ তখন এত হয়েছে যে তার প্রথম সম্ভাষণে ভুল করে ফোনটাই প্রায় তার উদ্দেশে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

'কী রকম লাগছে? খুশি করে দিয়েছি তো!' এই পরাশরের প্রথম সম্ভাষণ।

রাগে বোমার মতো ফেটে পড়তে হয় কি না?

অতি কষ্টে নিজেকে সামলাতে হয়েছে।

উন্মাদিনী মেয়েটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সামনে একটা বেলেল্লাগিরির চেহারা দেখাতে পারি না।

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় তাই শুধু বললাম, 'কীসের খুশির কথা বলছ?'

আর যে কেউ হলে আমার এই গলার স্বরেই হাওয়াটা কী রকম গরম তা বুঝত। কিন্তু পরাশর মাঝে মাঝে কেমন নিরেট হয়ে যায়।

আমার ওই বরফ দিয়ে জমানো গলা শুনেও কিছুই না বুঝে মেয়েটা এসেছে কি না সেই সন্ধান নিতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'সে কী!' পরাশরের কণ্ঠে বিস্ময়, উদ্‌বেগ আর অধৈর্য মেশানো! 'জেসি এখনও যায়নি? তোমার কাছে তাকে যে অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি। এখনও পৌঁছয়নি?'

'পৌঁছেছে।'

বৃথাই জবাব হিসেবে এই বরফের ডেলাটা ফোনের ভেতর দিয়ে চালান করলাম।

গলার স্বরের তারতম্য বোঝবার মতো কান পরাশরের নেই।

আমার মুখে 'পৌঁছেছে' শুনেই তার উল্লাস দেখে কে!

'তবে ?' বলে এমন একটা সুর-টানা ইঙ্গিত-ভরা জিজ্ঞাসা ছাড়লে যা বেশ আপত্তিজনক।

ঠান্ডা ছেড়ে এবার গরম গলাতেই জানতে চাইলাম, 'তবে কী?'

'তবে যে বলছ খুশি হওনি!' পরাশর নিজের উচ্ছ্বাসে বলে চলল, আমায় কপটতার অপবাদ দিয়েই। 'সত্যি অদ্ভুত মেয়ে। ভাল করে একটু ভালসাব হবার পরে বুঝবে ওদের সম্বন্ধে আমাদের কত ভুল ধারণা আছে। তোমার কাছেই তো থাকবে।'

'না।' পরাশরের উচ্ছ্বাসের মধ্যে কথা বলায় বাধা দিলাম।

এতক্ষণে পরাশর যেন ঘুণাক্ষরে কিছুর আভাস পেলে। আগেকার উচ্ছ্বাস থামিয়ে অবিশ্বাস ও উদ্‌বেগের ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'না, কী বলছ?'

'বলছি, তুমি যাকে পাঠিয়েছ সে এখানে থাকবে না।'

এই সরল বাংলা বাক্যটি উচ্চারণের নির্ভুল নির্দেশেও পরাশরের মাথায় ঢোকাতে পারলাম না। সম্পূর্ণ উলটো মানে করে বসল।

'জেসি তোমার ওখানে থাকবে না বলছে?' পরাশর জেসির বেয়াড়াপনাতেই যেন বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ, 'কেন? খুব উৎসাহ করে তো গিয়েছিল। একটু সাধাসাধি করো। তা হলেই রাজি হয়ে যাবে।'

ফোনটা মেঝেতে আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় কি না এর পর?

ওই উন্মাদিনী বিদেশি মেয়েটা দেখছে কি না দেখছে, আর দেখেই বা কী ভাববে পরোয়া না করে একেবারে দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে বললাম, 'তার রাজি হবার কথা হচ্ছে না। রাজি হচ্ছি না আমি। আর হব না। তোমার পাঠানো ওই একটা ইঁদুরে নোংরা আধ-ন্যাংটো মেয়েকে আমি আমার এখানে রাখতে পারব না। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তুমি ওকে এখানে পাঠাও! এই নাও ফোনটা ওকে দিচ্ছি। ওকে সাফ জানিয়ে দাও যে এখানে ওর জায়গা হবে না।'

পরাশরকে আর কিছু বলার সুযোগই না দিয়ে ফোনটা জেসির হাতে দিয়ে তাকে জানালাম যে পরাশর তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

তারপর পরাশরকে আর কিছু বলতে হল না।

ফোনটা মুখে নিয়েই একেবারে গদগদভাবে জেসি তার ভাষায় জানালে, 'ও, তোমায় অনেক ধন্যবাদ পার্স। কী সুন্দর যে মানুষ তোমার বন্ধু, কী বলব। হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছেন আমি এসেছি

বলে। মনে হচ্ছে দু-একমাস কেন, আরও বেশি এখানে থাকতে পারি। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।'

জেসি ফোনটা নামিয়ে দিলে ঝট করে।

তখন সমস্ত অফিসের কামরাটা আমার চারিধারে ঘুরছে।

দুই

জেসি তারপর থেকে এখানে আছে।

হ্যাঁ, আমার শোবার ঘরেই।

আমার অফিসঘরে একটা ডিভান পাতিয়ে তাতেই আমি রাত্রে নিজের শোবার ব্যবস্থা করেছি।

জেসি তাতেও আপত্তি করেছিল।

'তুমি অফিসঘরে শোবে কেন, কুট! (আমার নামটা তার কাছে ওই ভাবেই সংক্ষেপিত হয়েছে) তুমিও ও ঘরেই শোবে। তাতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমার ঘুম ভারী গভীর। রাত্রে গায়ের ওপর বোলার চলে গেলেও টের পাই না। তা ছাড়া তুমি আমি আলাদা ঘরে শুলে মনে হবে আমরা যেন সেকেলে কুইন ভিক্টোরিয়ার যুগের মানুষ। ছেলে মেয়ে বলেই আলাদা থাকা তো লজ্জার কথা। ওটা পচা মনের প্রমাণ।'

জেসির এ যুক্তি ঠেকাতে কোনওরকমে একটা লম্বা কৈফিয়ত খাড়া করতে হয়েছে।

বলেছি, 'কোনও আপত্তিটাপত্তির জন্য নয়, বাধ্য হয়ে কিছুদিন এখন আমায় অফিসঘরে থাকতে হচ্ছে। তোমার ঘুম যেমন গভীর বলছ, আমারও তা-ই। বিছানায় পড়লে একেবারে মড়ার মতো ঘুমোই। অথচ এখন আমাদের পুজোর মরশুমে কাজ কর্ম যেমন জরুরি তার চাপও তেমনই বেশি। রাত্তিরে সময় কখন যে ফোন আসে তার ঠিক নেই। ও ঘরে শুলে শুনতে পাব না বলে এ সময়টায় আমি নিজে থেকেই এখানে এমনই ক-দিনের জন্যে বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করি। সেই জন্যে তুমি আমায় সেকেলে-টেকেলে ভেবো না।'

মন দিয়ে কৈফিয়তটা শুনে জেসি আমায় একটা বড় সার্টিফিকেট দিয়েছিল।

মুখের দিকে চেয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে বলেছিল, 'না, তোমায় দেখলে মোটেই সেকেলে মনে হয় না।'

জেসি আসার দিনই বিকেলে অফিসঘরে ডিভান পাতিয়ে শোবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

সেই দিন রাত্রেই নিজের কথার ফাঁদে নিজে অমন ধরা পড়ব তা কি ভাবতে পেরেছি!

যা অমোঘ নিয়তির মতো অনিবার্য, নিরুপায়ভাবে তা মেনে নিয়ে তখন আমি সন্ধ্যার কাজকর্মগুলো অফিসে বসেই সেরে নিয়েছি। কাছের হোটেল থেকে নিয়মমতো খাবার আনিয়ে তা খাওয়াও হয়ে গেছে।

জেসির জন্য দরকার হলে সেই খাবারই আনাব ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু সে একটু বেরিয়ে বাইরেই খেয়ে আসবে বলেছিল। সে দায়টা থেকে তাই নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম।

জেসির কিন্তু সেই সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাবার পর আর ফেরবার নাম নেই।

আমার খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর রাত এগারোটা পর্যন্ত তাকে ফিরতে না দেখে একটু চিন্তিত যদি হয়ে থাকি, তার তিনগুণ আশান্বিত হয়েছি।

ওই উন্মাদিনী বাউন্ডুলে মেয়ে তো!

এমনও তো হতে পারে যে আর এখানে ফিরবেই না!

সেরকম না আসা এমন কিছু আশ্চর্যও নয়। হঠাৎ খেয়ালে আর পরাশরের আহাম্মকিতে

এখানে এসে জুটেছিল। তারপর তেমনই খেয়ালে বা ডেরাটা ঠিক পছন্দ না হওয়ায় আবার অন্য কোথাও চলে যেতে কি পারে না।

চলে যাবার হাঙ্গামা হুজ্জত তো কিছু নেই।

আমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের আপনি আর কোপনির মতো নিজে আর ওই ঝোলাটা নিয়ে তো জেসির দুনিয়া।

তা সেই ঝোলাটি যখন সঙ্গে আছে তখন অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠার বাধা তো কিছু নেই।

এত রাত পর্যন্ত না ফেরায় সেই আশাই ক্রমশ বেড়েছে।

সে আশা পূর্ণ হয়নি অবশ্য।

রাত সাড়ে এগারোটার পরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েছি। আর কলিং বেল বাজবার আগেই নিজেই গিয়ে দরজা খুলে হতাশ হয়েছি মূর্তিমতী আমার গতজন্মের কোনও কর্মফল-রূপে জেসিকে দেখে।

আমায় দেখতে পেয়ে জেসির সে কী আহ্লাদে বিগলিত মুখ।

'যাক, তুমি জেগে আছ তা হলে।'

'হ্যাঁ।' মুখটা প্রসন্ন রেখেই তিক্ত জবাবটা মোলায়েম করে দিয়েছি। 'জেগে না থাকলে দরজা খুললাম কী করে। আমি সমন্যামবুলিস্ট নই।'

আমার কথাটা এত মজার তা নিজেই ভাবতে পারিনি। জেসি হেসে প্রায় আমার গায়েই লুটিয়ে পড়ে বলেছে, 'কী মজার কথাই তুমি বলতে পারো কুট্টু। তুমি সমন্যামবুলিস্ট নও মানে ঘুমিয়ে হাঁটো না। তার মানে ঘুমিয়ে হাঁটা কাকে বলে তাও তুমি জানো।'

আমার কথাটার এ মানে কোথা থেকে হয়, আর জেসিও তাতে এত হেসে লুটোপাটি খাবার কী থাকতে পারে কিছুই বুঝতে পারিনি। আসল্লিকর ব্যাপারটা শুধু থামাবার জন্যে বলেছি, 'তুমি খেয়ে এসেছ নিশ্চয়। ও ঘরে তোমার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করা আছে।'

'ওঃ, তুমি কী ভাল, কী মিষ্টি— তুমি জানো না।'

সময়মতো সাবধান হয়ে সিঁড়ি ভাঙায় জেসির প্রসারিত আলিঙ্গনটা তখনকার মতো কাটাতে পেরে তাড়াতাড়ি বলেছি, 'তোমার আর কিছু যদি দরকার থাকে আমায় ঘরটা দেখে এসে জানাও। আমি—'

'কিছু না,' আমার কথায় বাধা দিয়ে জেসি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলেছে, 'আমার একটা যেমন তেমন বিছানা ছাড়া আর কিছু দরকার হয় না। আমার শুধু ভয় হচ্ছিল কী জানো? যদি সেটুকুও না পাই।'

'বাঃ, কথা যখন হয়ে গেছে, তা পাবে না কেন?' আমি আমার দেওয়া কথার ওপর আস্থার অভাবে একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই বলেছি, 'আমি দরজা খুলব না ভেবেছিলে?'

'না, তা ভাবব কেন?' জেসি তাড়াতাড়ি আমার ধারণা সংশোধন করেছে, 'আমি শুধু ভয় পাচ্ছিলাম তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকো। তোমার ঘুম খুব গভীর জেনেছি তো। ঘুমিয়ে পড়লে কলিং বেল কি শুনতে পেতে? তোমার অ্যাটেন্ডান্টও তো সেই নীচের তলায় থাকে।'

একটু থেমে নিজে থেকেই আমায় আশ্বস্ত করবার জন্যে জেসি আবার বলেছে, 'অবশ্য তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ বুঝলে তোমায় আর বিরক্ত করতাম না।'

'কী করতে তা হলে?' প্রশ্নটা আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

'কী আর করতাম!' নির্বিকারভাবে বলেছে জেসি, 'তোমার ওই ল্যান্ডিং-এ শুয়ে থাকতাম। একটা রাত বই তো নয়।'

'ল্যান্ডিংয়ে শুয়ে থাকতে!' বাইরে একটু হাসলেও মনে মনে শিউরে উঠেছি দৃশ্যটা কল্পনা করে।

এ উন্মাদিনীর ঘুম তো গভীর, কিন্তু কতক্ষণ ঘুমোয় তা তো জানা নেই।

সকাল পর্যন্ত ওই ল্যান্ডিংয়ে ঘুমোলে আমি তো কিছু জানতে পারতাম না। কিন্তু ওপরের অন্য ফ্ল্যাটের কেউ সে সময়ে নামতে গিয়ে আমার ল্যান্ডিংয়ে এই সংক্ষিপ্ত-বসনাকে শুয়ে থাকতে দেখলে কী ভাবত!

মুখে অবশ্য তখনই হেসে বলেছি, 'যাক, তার দরকার হয়নি এই ভাগ্যি। ল্যান্ডিংয়ের চেয়ে একটু ভাল শোবার ব্যবস্থা আশা করি পাবে।'

মাঝের দরজাটা তারপর দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, 'রাত্রে এই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো।'

'বন্ধ কেন?' যেন অপমানিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে জেসি, 'চোরটোরের ভয় আছে নাকি। এ ফ্ল্যাট তো আর সব দিকে বন্ধ।'

'না, না, চোরটোরের ভয়ের জন্যে বলছি না।' তাড়াতাড়ি কথাটা সামলে নিতে হয়েছে, 'এমনই যাতে তুমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করো তার জন্যেই বলছিলাম।'

'স্বচ্ছন্দ হবার জন্যে দরজা বন্ধ করব? তুমি আমায় নিয়ে তামাশা করছ? না কুট্, তুমি ভারি দুষ্টু।' কৃত্রিম রাগের ভান করে আমায় তর্জনী তুলে শাসিয়ে জেসি তারপর 'গুড-নাইট সুইট ড্রিমস' বলে ওদিকের ঘরে চলে গেছে।

তিন

জেসির ঘুম খুব গভীর বলেছিল। সে কথার ভরসায় সেটিক করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিভিয়ে ডিভানের বিছানায় এবার শুয়ে পড়েছি।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বই পড়া আমার চিরকালের অভ্যাস। সে বিলাসের কথা মনেও আনিনি সেদিন।

জেসির অভাবিত আবির্ভাবের অস্বস্তি ভাবনা উত্তেজনায় ঘুম অবশ্য আসতে চায়নি। কিন্তু অমন এক-আধ দিন রাত জাগায় অভ্যাস কিছু আসে যায় না। তাতে ভাবিত হইনি তাই।

খানিক বাদেই নিজের কোন ফাঁদে জড়িয়ে অমন বিপদে যে পড়ব সেইটিই তখন শুধু ভাবতে পারিনি।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বার পর আধ ঘণ্টা না যেতে যেতে হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল।

এত রাত্রে ফোন বেজে ওঠাতেই আমি অবাক। কাজের মরশুমে রাত্রেও ফোন আসে বলেছিলাম জেসিকে। কিন্তু সে তো এ ঘরে বিছানা পাতবার অজুহাত হিসেবে স্রেফ ধাপ্পা।

সত্যি সত্যিই এত রাত্রে আমায় ফোন করে কে?

ফোন বাজামাত্রই অভ্যাস মাফিক উঠে গিয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ডিভান থেকে নামার আগেই থামতে হল।

আমার না গভীর মড়ার মতো ঘুম। ফোনে রিং শোনামাত্র আমি অমন চটপট তা হলে ধরি কী করে?

জেসির ঘুমও খুব নাকি গভীর। তা যদি হয় তা হলে সে অবশ্য আমার ফোন-ধরা শুনতে পাবে না।

কিন্তু তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর মাত্র আধ ঘণ্টা কেটেছে। এর মধ্যে সে যে ঘুমিয়ে পড়েছে তারই বা ঠিক কী? ঘুম গভীর হলেও তা বিছানায় শুলেই আসে এমন কথা তো তার মুখে শুনিনি।

ফোন ওদিকে বেজে যাচ্ছে। আর বিছানায় আধ শোয়া অবস্থায় কী করব ঠিক করতে না পেরে আমি তখন অস্থির।

জেগে থাকলে আমায় এত তাড়াতাড়ি ফোন ধরতে শুনলে জেসি ভাববে কী?

তার কাছে মিথ্যুক না হবার জন্যে কিছুটা অপেক্ষা করে ফোনটা খানিক বেজে যেতে দিতেই হবে।

তারপর অনেক কষ্টে যেন ঘুম ভাঙছে এমনভাবে গিয়ে ফোন ধরব।

অসময়ের ফোনটা ধরবার জন্যে বেশিক্ষণ অবশ্য আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। ডিভান থেকে পা দুটো সবে নামিয়েছি এমন সময়ে খোলা দরজাতেই একটা ছায়া দেখে আর পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি আবার শুয়ে পড়তে হল।

অস্পষ্ট যেটুকু আলো বাইরে থেকে ঘরে এসেছে তাতেই জেসির সিলুয়েট মূর্তিটা চিনতে দেরি হল না। ছায়া থেকে যেটুকু বোঝা গেল তাতে তার স্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত আবরণটুকুও রাত্রের ঘুমের জন্যে পরিহার করা অবস্থাতেই ফোনের আওয়াজে চলে এসেছে বলে মনে হল।

ফোনটা তখনও সমানে বেজে চলেছে।

অচেনা অন্ধকার ঘরে শুধু সেই আওয়াজেই জেসি টেবিলটা খুঁজে নিয়ে ফোনটা তারপর তুললে।

সমস্ত শরীর টান করে কান দুটো তখন খাড়া করে আছি।

'হ্যালো!' বললে জেসি।

নিস্তব্ধ ঘরে ফোন কানে না দিয়েই অন্য প্রান্তের কথা শুনতে পাওয়া তখন অসম্ভব নয়।

সেইজন্যেই উৎকর্ণ হয়েছিলাম। রং নম্বরের উৎপাত না হয়ে আমার জানিত যদি কারও ফোন বলে বুঝি তা হলে আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে ওঠবার অভিনয় করব।

কিন্তু তার দরকার হল না।

জেসির 'হ্যালো' বলবার পরই হঠাৎ ফোনটা কেটে গেল। জেসির সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে না একটু পরে তা ঠিক বোঝা গেল না।

ফোনটা খানিক ধরে রেখে জেসি এবার ক্রেডলে নামিয়ে দিল।

আমি কিন্তু তখন প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছি।

ফোনটা নামিয়ে দিয়েও জেসি ঘর থেকে যায় না কেন!

আলংকারিক হিসাবে হলেও আক্ষরিক হিসাবে রুদ্ধশ্বাস অবশ্য তখন নয়। বরং নিশ্বাসের শব্দটা টানা ছন্দে ফেলে গভীর ঘুমের ভান-ই তখন করতে হচ্ছে।

ভাগ্যে তা করেছিলাম।

চোখটা অবশ্য তখন অন্ধকারে অর্ধনিমীলিতই রেখেছি। সেই আধ-বোজা চোখের দেখাতেই চমকে উঠে নিশ্বাসের ছন্দপতন যদি ঘটে থাকে জেসি অন্তত তা লক্ষ করেনি।

ছন্দপতনের জন্য জেসিই অবশ্য দায়ি।

টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে সে তখন আমার ডিভানের কাছেই মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আমার ঘুমটা কত গভীর তাই কি পরীক্ষা করে দেখছে!

তার একটা হাত আমার বুকের ওপর আস্তে রাখা টের পেলাম। সেই সঙ্গে বহুদিনের অস্নাত শরীরের স্বাভাবিক ঘ্রাণ-চাপা-দেওয়া কিছু উগ্র সেন্টের গন্ধ।

অস্বস্তির তখন আর সীমা নেই।

কী করব এবার? হঠাৎ যেন ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শোবার ভান করব?

তাই করতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু দরকার হল না।

আমার নিদ্রার গভীরতা সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হয়ে জেসি উঠে দাঁড়িয়ে ডিভান থেকে সরে গেল।

কিন্তু এবার সে করছে কী!

আমার ড্রয়ারগুলো সন্তর্পণে খোলবার চেষ্টা করছে কেন?

গুপ্তচরগিরি কি চুরি ভাবব তারও তো কোনও উপায় নেই।

সেক্রেটারিয়েটের ড্রয়ারগুলোতে কাগজের জন্য পাঠানো গল্প প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর তো বিশেষ কিছুই থাকে না।

হ্যাঁ, নেহাত খুচরো দরকারের জন্য পয়সাকড়ি কিছু থাকে বটে। কিন্তু সে নামমাত্র।

আজ সন্ধ্যায় জেসিই তো তা দেখেছে। সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে যাবার আগে সে তার একটা দশ টাকার নোটের ভাঙানি চেয়েছিল। পকেটের ব্যাগ থেকে পুরো ভাঙানি না পেয়ে ওই ড্রয়ার থেকে ক-টা খুচরো টাকা আর রেজগি দিয়ে পূরণ করে জেসিকে দিয়েছিলাম। তার দেওয়া নোটটা ছাড়া ড্রয়ারে যে কিছু নেই সে তো নিজের চোখেই তখন দেখে গেছে।

তা হলে আমার ড্রয়ার অমন করে হাটকাবার মানে কী?

কী রহস্য এর মধ্যে থাকতে পারে?

সামান্য একটু নাড়াচাড়া করেই জেসি অবশ্য ঘর থেকে চলে গেল।

তার অদ্ভুত ব্যবহারটার মানে বুঝতে না পেরে তখন অস্থির হয়ে উঠেছি।

সে অস্থিরতা খানিক বাদেই আরও বড় বিস্ময়ের চমকে চাপা পড়ল।

জেসি ঘর থেকে চলে যাবার পাঁচ মিনিট না যেতেই আবার ফোন!

হল কী ব্যাপারখানা!

ওই উন্মাদিনী বিদেশিনীটা অলক্ষ্মীর মতো ঢোকবার পর যত উপদ্রব শুরু?

এবার আর দেরি না করে দু-বার ফোন বাজতেই উঠে আলোর সুইচটাই টিপে দিয়ে ফোনটা ধরলাম।

'হ্যালো' বলে সাড়া দেবারও দরকার হল না।

ও প্রান্ত থেকে অত্যন্ত রুক্ষ ভারী গলায় একজনের আক্রমণ শুনলাম।

গলাটা বাজখাই শুধু নয়, হিংস্র, আর উচ্চারণ ও ভাষাটা ইংরেজি।

কথাটা যা বললে তাই একেবারে হতভম্ব করার মতো।

'কে তুমি! সেই ছুঁচো সম্পাদকটা? তোমাকেই আগে একবার ফোন করে পাইনি। যা বলছি মন দিয়ে শোনো। নিজের ভাল যদি চাও তা হলে আমার জ্যানেটকে ওখানে আটকে রাখবার চেষ্টা কোরো না। কাল সকালেই ওকে ছেড়ে দেবে। না যদি দাও তা হলে তাড়াতাড়ি উইল করে ফেলবে। কারণ তোমাদের কাগজের একটা নতুন সম্পাদক তা হলে দরকার হবে।'

কথাগুলো বলেই ঘুঁৎ করে ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ।

ভেতরের ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলাম। না, জেসি এবারের ফোনের শব্দে উঠে আসেনি। তার কোনও সাড়াশব্দও ওঘরে নেই।

হয়তো সত্যিই তার ঘুম মড়ার মতো।

চার

পরের দিন সকালেই পরাশরের কাছে গেলাম।

তার বসবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই তো একেবারে হাঁ হয়ে যেতে হল।

মনে হল এ আমি কোথায় এসেছি, ভুল করে আর কারও বৈঠকখানায় ঢুকে পড়িনি তো?

না, আর কারও বসবার ঘর নয়। পরাশরেরই সেই চিরপরিচিত ঘর কিন্তু সেখানে যাঁরা বিরাজ করছেন তাঁদের ওখানে দেখবার কথা কখনও কল্পনাও করিনি।

গুটিপাঁচেক সাদা চামড়া, ক-টা চোখের বিদেশি ছেলে-মেয়ে ঘরের শোভা বাড়িয়ে সেখানে বসে আছে। জাতে তারা বিদেশি হলেও পোশাকে তারা পুরোপুরি এদেশি। যেমন তা বিচিত্র তেমনই দু-একজনের বেলায় এ-দেশের ওপর এক কাঠি।

একজন তো একেবারে আমাদের নিষ্ঠাবান পূজারি ব্রাহ্মণ। পরনে গরদের ধুতি চাদর আর পায়ে খড়ম তো বটেই। মুণ্ডিত মস্তকে গেরো দেওয়া শিখাটি পর্যন্ত যথাযথ।

ছেলেদের আর তিনজন গেরুয়া ছোপানো ঢোলা পাঞ্জাবি আর পাজামার সঙ্গে একমুখ দাড়ি-গোঁফ আর কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা জট পাকানো চুলে আধা-সন্ন্যাসী।

মেয়ে এদের মধ্যে একটিই। এবং শাড়ির ওপর নামাবলি চাপিয়ে গলায় কণ্ঠি আর হাতে কুড়োজালি নিয়ে সে পাক্কা পরম বৈষ্ণবী।

আমি ঘরে ঢুকতে সবাই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। সকলের মুখে একটা কৃতার্থ ভাব।

বৈষ্ণবী মেয়েটি তার মধ্যে প্রথম একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললে, 'আমরা আপনার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছি।'

আমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছে এরা? আর বসে আছে পরাশরের বসবার ঘরে।

ওরা কি সব অন্তর্যামী নাকি? না, এদেশে এসে জ্যোতিষ বিদ্যাটার শিখতে আর কিছু বাকি রাখেনি!

আমি যে আজ সকালে এখানে আসব তা এরা জানল কী করে! চিনলই বা কী করে আমাকে!

হতভম্ব ভাবটা মুখ থেকে মুছে ফেলে দিতে পারলাম না। গলা দিয়েও সেটা প্রকাশ হয়ে গেল।

'আপনারা আমার জন্যে অপেক্ষা করেছেন এখানে!'

'হ্যাঁ,' পুজারি বামুন ঠাকুর এবার ব্যাখ্যা করলে, 'আপনি তো সকাল সাতটায় আসতে বলেছিলেন। ঠিকানাটা প্রথমে খুঁজে পাইনি বলে পাঁচ মিনিট আমাদের দেরি হয়েছে।'

চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলেও মাথাটা তখন ঝাপসা।

নিজেরই বিশেষ দরকার বুঝে তাদের বসতে বলে বিমূঢ়ভাবে জানতে চাইলাম, 'আপনাদের কোনও ভুল হয়নি তো? আমি কিন্তু আপনাদের কাউকে চিনি না।'

'না, না আপনি চিনবেন কী করে!' বৈষ্ণবীই এবার পরিচয়ের ভার নিলে।

তার উচ্চারণের ভেতর থেকে নামগুলো বেশ কষ্ট করেই উদ্ধার করতে হল। কিন্তু উদ্ধার করে যা জানা গেল তা মাথা ঘোরাবার মতো।

গরদ-পরা নাড়া মাথায় টিকি ঝোলানো ছেলেটি হল রঘুনন্দন শাস্ত্রী। আধা সন্ন্যাসী বাকি তিনজন হল ধ্যানানন্দ, সেবানন্দ আর কৃপানন্দ। আর মেয়েটি হল কৃষ্ণদাসী।

প্রথম দর্শনের পর নামগুলো শুনে মাথায় চক্কর দিতে শুরু করেছিল। সেই ঘূর্ণমান অবস্থাতেই একটা কথা মনে হওয়ায় সন্দিগ্ধভাবে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা আমার সঙ্গে কী জন্যে দেখা করতে এসেছেন বলুন তো? এখানেই বা এসেছেন কেন? এটা কিন্তু আমার নয়, আমার এক বন্ধুর বাড়ি।'

'এটা আপনার বাড়ি নয়?' এবার মেয়েটির চোখেই একটু দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল, 'আপনার চিঠিতে কিন্তু এখানে আসবারই নির্দেশ ছিল।'

'আমার চিঠি!' এবার বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তিও মিশল গলায়, 'আপনাদের এখানে আসতে চিঠি দিয়েছি! আমি চিঠি দিয়েছি বলছেন, আমার নামটা কী তা জানেন?'

'চিঠিতে যা লেখা ছিল তাই জানি!' মেয়েটি এবার একটু বিব্রত হয়ে বললে।

'কী লেখা ছিল চিঠিতে?' একটু রুক্ষই হয়ে গেল গলার স্বরটা।

'ছিল কৃত্তিবাস ভদ্র।' মেয়েটি তার নিজস্ব উচ্চারণে আমার নামটাই জানাল।

এর পর নিজের মাথাটা ঠিক সজ্ঞানে আছে কি না জানবার জন্য নিজের গায়ে চিমটি কেটে কি চুল টেনে দেখতে হয়।

কিন্তু তার দরকার হল না।

সেই মুহূর্তে ভেতর থেকে পরাশরের আবির্ভাব।

তার ওপর রাগে ফেটে পড়াই তখন উচিত। কিন্তু তা আর পারলাম কই?

তার দিকে চেয়েই তখন থ হয়ে গেছি। পরাশর একেবারে সাধু হয়ে গেছে। গায়ে পা পর্যন্ত লুটোনো গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় কান-ঢাকা টুপি। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি।

এসেই মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করে বললে, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেছে বলে দুঃখিত। তবে আমার বন্ধু পরাশরের সঙ্গে এতক্ষণে আলাপ হয়ে থাকলে সেইটুকুই তোমাদের লাভ।'

পরাশর আমার দিকে চেয়ে একটু প্রসন্ন হাসি হাসল।

ভেতরে যা-ই হোক, আমি তখন নির্বাক নিস্পন্দ। যেন বাইরের দর্শক হিসাবে নাটকটা শুধু দেখে যাচ্ছি।

মেয়েটি তখন আমার দিকে চেয়ে লজ্জিতভাবে বলছে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমরা প্রথমে কৃত্তিবাস বলে ভুল করেছিলাম।'

মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে নীরবে আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি।

পরাশর ইচ্ছে করেই আমার নাম নিয়ে এদের যে ডেকে পাঠিয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি যে আজ সকালে এখানে আসতে পারি তা ভাবতে পারেনি বলেই কি আমার নাম ব্যবহার করে এ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা?

না, জেসিকে আমার কাছে কাল পাঠাবার পর আমার আজ সকালে আসাটা হিসেবের মধ্যে পেয়েই এই ব্যবস্থাটা সে করেছে?

কিন্তু নিজের নামটা লুকোবার ও চালাকির প্রয়োজনই বা কী!

আমার ওখানে জেসিকে পাঠানোর সঙ্গে জড়িয়ে আজকের এই ছিটগ্রস্ত বিদেশি ছেলেমেয়েদের এখানে ডাকার কোনও একটা গভীর উদ্দেশ্য কি আছে?

কথাবার্তা শুনে সেরকম উদ্দেশ্যের কোনও আঁচ তো পেলাম না।

আলাপ যা হল তা তো তাদের কোথায় এক আসন্ন মহাধর্ম সম্মেলনের।

পরাশর এদের সকলকে সেখানে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। এ সম্পর্কে তার বুজরুকির নমুনাও নীরবে বসে বসে দেখলাম।

কেমন করে এই হবু সাধু কটির সে সন্ধান পেয়েছে তার ইঙ্গিত সে দিতে ভুলল না। এইরকম প্রত্যাদেশই নাকি সে পেয়েছে। তাই খুঁজে খুঁজে ওই ক জনকে আজ ডেকে পাঠিয়েছে তার আস্তানায়।

ভক্তি-গদগদ হবু সাধুর দল কিছুক্ষণ বাদে বিদায় নিলে।

পরাশর তাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে ঘরে ঢুকে আলখাল্লাটা গা থেকে খুলতে খুলতে একটু মুচকে হেসে বললে, 'কৈফিয়তটা চাই, কেমন?'

'কৈফিয়ত নয়, খেসারত!' রাগ অভিমান বিস্ময় বিরক্তি সব কিছুই একসঙ্গে গলায় ফুটিয়ে তুলতে পারলাম কি না জানি না।

পরাশর কিন্তু তেমনই নির্বিকার।

আগের মতোই একটু হেসে বললে, 'খুব লোকসান করে দিয়েছি বলতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, চাইছি!' ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'তুমি তোমার আজগুবি খেয়ালে এই হিপিদের দলে ভিড়ে মজা পেতে পারো, কিন্তু আমার ওপর এ উপদ্রব চাপানো কেন?'

'খুব উপদ্রব করছে মেয়েটা?' এবার মুখে একটা কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'নেহাত সরলা সুশীলা বলেই তো মনে হল। তাই তোমার জিম্মায় ক-দিনের জন্যে রাখতে চাইলাম।'

'আমার জিম্মায় রাখতে চাইলে।' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলাম। 'কেন আমার বাসাটা কি

মেন্টাল অ্যাসাইলম, না আমি ওই হিপি পোষার ব্যবসা করি?'

'আহা, রেগে যাচ্ছ কেন!' পরাশরই যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, 'মেয়েটার আপাতত একটা নিরাপদ আশ্রয়ের বড় দরকার। তোমার মায়া দয়া আছে আর মনটা উদার বলে তোমার কাছে দু-দিনের জন্যে পাঠিয়েছি। তা তোমার ওখানে গিয়ে যদি বেয়াড়াপনা করে থাকে তা হলে—'

'না, সে বেয়াড়াপনা করেছে তা বলছি না।' পরাশরকে বাধা দিয়ে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হল, 'সবসুদ্ধ মিলে ব্যাপারটা যা হয়েছে তা রীতিমতো গোলমেলে।'

'সেই গোলমেলে ব্যাপারটাই তা হলে শুনি।'

পাঁচ

পরাশরকে আগের দিনের সমস্ত বৃত্তান্তটাই তার পর শোনালাম।

তার প্রতিক্রিয়া যা দেখলাম তাতে কিন্তু একটু অবাক হতে হল।

মাঝরাত্রে অজানা হিংস্র কণ্ঠে শাসানির কথা শুনে সে বিচলিত হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির আভাস ছাড়া আর কিছু তার মুখে দেখলাম না।

তাকে বরং বেশ একটু উত্তেজিত মনে হল জেসির আমার টেবিলের ড্রয়ার ঘাঁটবার কথা শোনাবার পর।

তার এই উত্তেজনাটুকু লক্ষ করেই ভুল ধারণা দূর করবার জন্য বললাম, 'ও ড্রয়ারে কিন্তু দরকারি বা দামি কিছু ছিল না। এমনকী আমার অফিসের ফাইলপত্রও নয়। শুধু কয়েকটা বাতিল লেখার পাণ্ডুলিপি। সেগুলো স্ট্যাম্প দেওয়া আছে বলে ফেরত পাঠাবার জন্যে ও ড্রয়ারে রাখা ছিল।'

পরাশর তবুও গম্ভীর হয়েই রইল কিছুক্ষণ। তারপর বেশ একটু চিন্তিতভাবেই বললে, 'একটা কাজ তুমি এখনি ফিরে গিয়ে করবে।'

'কী?'

'তোমার ড্রয়ারটা আর একবার ভাল করে দেখবে তাতে কী আছে না আছে? আর সেখানে ভুলে দরকারি কিছু কখনও রেখেছিলে কি না একটু মনে করবার চেষ্টা করবে।'

'তুমি বলছ যখন তখন তাই করব,' একটু বিরস মুখেই বললাম, 'কিন্তু আমি ভাল করেই জানি ও ড্রয়ারে কোনও দরকারি দামি জিনিস ছিল না। কখনও থাকেনি। মাঝরাত্রের ওই ফোনটাই আমার অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। তুমি তো সেটার ওপর কোনও গুরুত্ব দিচ্ছ না।'

'দিচ্ছি! দিচ্ছি!' পরাশরের মুখের গাম্ভীর্য এবার একটু কাটল, 'তোমার ড্রয়ারের রহস্য মিটলেই ফোনের শাসানির কিনারা হবে এইটুকু তোমায় বলে দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে আরও আশ্বাস দিচ্ছি যে সাময়িক যে অসুবিধাটুকু তোমার হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা শেষ করবার ব্যবস্থা করব। এখনই তোমায় কিন্তু বাসায় ফিরে ড্রয়ারটা দেখতে হবে।'

তা-ই দেখবার জন্যই ফিরে গেলাম।

কিন্তু পরাশরের অনুরোধ তক্ষুনি রাখা সম্ভব হল না।

জেসি আমার অফিসঘরের টেবিলে বসেই একমনে কী যেন লিখছে।

তার সামনেই ড্রয়ার টেনে হাটকাতে দ্বিধাবোধ করলাম।

সকালে জেসি ওঠবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আজকের দিনে এই প্রথম দেখা বলে তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিলাম। সুপ্রভাতের প্রতি-সম্ভাষণ না জানিয়ে জেসি

হঠাৎ লেখা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় গিয়েছিলে, কৃট? তোমায় দেখতে না পেয়ে আমি তো ভাবনায় পড়েছিলাম।'

'না, ভাবনার কী আছে!' একটু হেসে আশ্বস্ত করলাম, 'তোমার অসুবিধে তো কিছু হয়নি? কাল রাত্রে ঘুমোতে পেরেছিলে?'

'ঘুমিয়েছি একেবারে বেহুঁশ হয়ে!' জেসি হাসি মুখে জানালে, 'তুমি কখন বেরিয়ে গেছ টের পাইনি।'

'রাত্রে আর ওঠোনি তা হলে?' মুখ দিয়ে কথাটা যেন আপনা থেকে বেরিয়ে গেল।

'রাত্রে? না, রাত্রে উঠব কেন?'

একদৃষ্টে জেসির মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। প্রশ্নটা করা হয়তো অবিবেচনার হয়েছে। তা হলেও তার প্রতিক্রিয়াটা থেকে কিছু বোঝা যায় কি না দেখার চেষ্টা করতে দোষ নেই।

কিন্তু ঝটপট এবং যেরকম অতি স্বাভাবিকভাবে জেসি তার জবাবটা দিলে তাতে বেশ একটু ভাবিতই হলাম।

এ অবিচলিত ভাবটা কি অভিনয়?

কিন্তু যেরকম আচমকা কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে তাতে দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য আপনা থেকে একটু ছায়া অন্তত না পড়ে পারে না।

অভিনয় যদি না হয় তা হলে আর কী হতে পারে!

জেসি সত্যিই কাল রাত্রে সজ্ঞানে উঠে এসে ফোন ধরেনি, আমার বুকে হাত রাখা থেকে ড্রয়ার টেনে ঘাঁটা সব সে করেছে অচেতনভাবে? তার মানে সে সমন্যামবুলিস্ট!

তা-ই যদি হয় তা হলে ঘুমন্ত অবস্থায় যা সে করেছে তাতে মনঃসমীক্ষার হদিস থাকতে পারে, কিন্তু পরাশর যেরকম চাইছে সেরকম কোনও সূত্র মিলবে কি!

জেসি কাকে বোধহয় একটা চিঠিই লিখছিল। আমার আগের প্রশ্নের ওই জবাবটা দিয়ে আমার কাজের টেবিলটা সকালেই লোক করে রাখবার জন্য মাফ চেয়ে বললে, 'আর দু-মিনিট সময় দাও কৃট, চিঠিটা এখনি শেষ করে ফেলব।'

'না, না দু মিনিট কেন? তুমি এখন আধঘণ্টাও টেবিলে থাকতে পারো। সকাল ন-টার আগে আমি কাগজের কাজে বসছি না!'

জেসিকে আধঘণ্টার ঢালাও অবকাশ দিয়ে স্নানের ঘরে যেতে মনটা কিন্তু একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। জেসিকে আধঘণ্টা সময় দিয়েছি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু পাঁচমিনিট আধঘণ্টা যতক্ষণই থাকুক, আমার ও ঘরে একটু নজর রাখবার জন্য থাকা উচিত ছিল না কি!

নজর অন্য মারাত্মক কোনও সন্দেহের জন্য নয়। কাল রাত্রের ঘটনাটা সম্বন্ধে জেসির কথায় যে অচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা সত্য হলেও তার বিস্মৃতিটা কী ধরনের তা একটু বোঝবার জন্য।

জেসির কাল রাতের কথা কিছুই মনে নেই মানলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নটায় সুপ্ত স্মৃতিতে একটু সাড়া জাগা কি একেবারে অসম্ভব?

'রাত্রে আর ওঠোনি তা হলে?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম। অত্যন্ত নির্দোষ প্রশ্ন। কিন্তু তাতেই অচেতন মনে একটু নাড়া লেগে ঘুমন্ত অবস্থার কাজগুলো একটু ঝিলিক দিয়ে উঠলে জেসি কী করে তা দেখার সুযোগটা অবহেলা করা উচিত হয়নি।

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। স্নানের ঘরে গিয়ে অবশ্য জেসির কাছে আবার এসে দাঁড়াবার একটা ফিকির মাথায় এল।

সকালে দাড়ি কামিয়েই বেরিয়েছিলাম। তবু যেন এই প্রথম কামাচ্ছি এইভাবে সোফটিতে ব্লেড না পরিয়ে রেখে দিয়ে ব্রাশটা সাবানের বাটিতে ফেনাতে ফেনাতে আবার অফিসঘরে এসে দাঁড়ালাম।

বিদেশি দূরে থাক, আমার স্বদেশের কোনও মেয়ের কাছেও এভাবে ফেনানো ব্রাশ নিয়ে এসে দাঁড়াতে সংকোচ বোধ করতাম।

কিন্তু জেসি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ মানে হিপি ধর্মভায়েরা এসব আদবকায়দা লৌকিকতার জগতেই থাকে না।

কোনও অ্যাপলজি না করে তাই স্বাভাবিকভাবে টেবিলটার কাছেই এসে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কাল আমার কিন্তু একবার ঘুম ভেঙে গেছল।'

'ঘুম ভেঙে যাবার কারণ বুঝেছি।' এয়ার-মেল-এর চিঠিটা লেখা শেষ করে ভাঁজ করে অধর রস দিয়েই আঁটতে আঁটতে জেসি আমার দিকে উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'এই অফিসঘরে অনভ্যাসের বিছানায় শোবার জন্যেই নিশ্চয়। ওই জন্যেই কত করে তোমাকে ও ঘরেই শুতে বলেছিলাম। খাট তো তোমার বেশ বড়। অনায়াসে তাতেই শুতে পারতে।'

জেসির এ আফসোস সহজে থামবে না জেনে বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, অনভ্যাসের বিছানায় শোবার জন্যে নয়, ঘুম ভেঙে গেছল একটা অদ্ভুত ব্যাপারে।'

'অদ্ভুত ব্যাপারে?' জেসির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। 'কী রকম অদ্ভুত?'

দাড়ি কামাবার ছুতোটা নেবার সময়েই মাথায় যে বুদ্ধিটা এসেছিল তা-ই এবার খাটালাম।

একটু চিন্তিতভাব দেখিয়ে বললাম, 'কাল মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হল বুকের ওপর কীসের যেন চাপ লাগছে।'

'বুকে চাপ! সে তো বদহজম।' এবার জেসি হেসে উঠল।

'না, না সে ধরনের চাপ নয়!' একটু ক্ষুণ্ণ হবার ভাবই দেখালাম, 'এটা বেশ মধুর চাপই বলা যেতে পারে। কে যেন তার নরম হাতটা আমার বুকের ওপর রেখেছে।'

'যা বলছ ওরকম হাত তো এক আমিই রাখতে পারতাম', জেসি আবার হেসে উঠল, 'কিন্তু তা রাখতে গেলে তো তোমার ঘরে সশরীরে উঠে আসতে হয়। তা আর পারলাম কই! এক ঘুমে যে রাত কাবার হয়ে গেল।'

হাসতে হাসতেই জেসি আমায় বললে, 'তুমি স্বপ্ন দেখছিলে নিশ্চয়।'

এ রাস্তায় কোথাও পৌঁছবার নয় বুঝে স্বপ্নটাই এবার মেনে নিলাম।

জেসি চিঠিটা নিয়ে বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে বলে গেল, 'আমি চিঠিটা ফেলে এখুনি আসছি।'

চিঠিটা আমিই ফেলাবার ব্যবস্থা করতে পারি বলে তাকে থামানোটাই শোভন হত, কিন্তু ড্রয়ারটা দেখবার সুযোগের জন্য এ সৌজন্যটুকু অনায়াসে বিসর্জন দিলাম।

জেসি চিঠিটা আমার হাতে দিত কি না সে বিষয়েও একটু সন্দেহ আছে। ইচ্ছাকৃত হয়তো নয়, তবু চিঠির ঠিকানার দিকটা আগাগোড়াই যেন আমার দৃষ্টি থেকে ঘোরানো থাকতে দেখেছি।

তা সত্ত্বেও ক্ষণিকের জন্য সেটা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। যেটুকু তাতে পড়তে পেরেছি তা অবশ্য কোনও কাজেই লাগবার নয়। পড়তে পেরেছি শুধু নামটা। সে নামটা হল টিমথি রীড।

ছয়

জেসির পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন আমি অবশ্য আমার ড্রয়ারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করেছি।

না, বাতিল কয়েকটা ফেরত দেবার স্ট্যাম্প-দেওয়া পাণ্ডুলিপি ছাড়া ড্রয়ারে তো আর কিছুই নেই!

উনুন ধরাবার প্রয়োজনে ছাড়া সেসব কাগজও নেহাত অবাঞ্ছিত জঞ্জাল।

তবু সেসব পাণ্ডুলিপিরও কোনওটা হারিয়েছে কি না সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হবার জন্য বাতিল অথচ ফেরত পাঠাবার জন্য রাখা লেখাগুলির তালিকাটা খাতার সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিয়েছি।

না, একটা পাতাও সেসব লেখার খোয়া যায়নি।

সুতরাং জেসি ঘুমন্ত অবস্থাতেই নিজের অজ্ঞাতসারে এ ঘরে এসে ফোন ধরা থেকে ড্রয়ার খোলা পর্যন্ত সব করেছে এই ধারণাটাই জোরদার হয়।

বাতিল পাণ্ডুলিপি ছাড়া এ ড্রয়ারে থাকবার মধ্যে কাল ছিল—

এ পর্যন্ত ভাবার পরই আমি ড্রয়ার ঘাঁটায় হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

হ্যাঁ, একটা দশটাকার নোট তো এখানে থাকবার কথা। সে কথাটা মনে না থাকলেও এতক্ষণের ঘাঁটাঘাঁটিতে নোটটা তো চোখে পড়েনি।

আমার ঘাঁটাঘাঁটিতেই কি ড্রয়ার থেকে নীচে মেঝের ওপর পড়ে গেছে!

তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘরের মেঝে তো বটেই, ড্রয়ারটারও সমস্ত কাগজগুলো একটা একটা করে খুলে আবার দেখলাম।

না, সে দশ টাকার নোটের কোনও চিহ্ন নেই।

পরাশর ফোন করতে বলেছিল। কিন্তু এটা কি একটা ফোন করবার মতো ব্যাপার?

একটা দশ টাকার নোট। মহামূল্য জিনিসের মধ্যে সেইটেই শুধু খুঁজে পাচ্ছি না।

পরাশরকে জানালে সে তো ঠাট্টায় বিদ্রূপে জর্জর করে মারবে।

তবু যত হাস্যকরই হোক, খবরটা না জানিয়ে চেপে যাওয়াটা ঠিক মনে হল না।

পরাশরকে বেশ দ্বিধাভরে শেষ পর্যন্ত ফোনটা করলাম।

'হ্যাঁ, বলো,' পরাশর ফোনের কাছেই যেন উদগ্রীব হয়ে বসে মনে হল।

তাকে হতাশ করতে একটু খারাপই লাগল। একটু ভনিতা করেই বললাম, 'ড্রয়ার তো তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। তোমায় তো বলেই এসেছি ও ড্রয়ারে বাতিল লেখার বান্ডিল ছাড়া আর কিছু থাকে না, সেসব লেখার একটা পাতাও হারায়নি।'

'তা হলে ড্রয়ার থেকে কিছুই খোয়া দেখলে?' পরাশরের গলায় একটু বিস্ময়।

'হ্যাঁ, এক হিসেবে একটা জিনিস শুধু গেছে বলা যায়।'

'কী?' পরাশর একেবারে উদগ্রীব।

বাধ্য হয়েই তার প্রত্যাশায় এবার আঘাত দিতে হল। বললাম, 'গেছে শুধু একটা দশ টাকার নোট।'

'কী!' পরাশরের গলায় যেন উত্তেজনা।

'একটা দশ টাকার নোট।' আর-একবার জানালাম।

'হুঁ', পরাশর উত্তেজনাটা যেন কোনওরকমে চাপছে মনে হল। গলার স্বরটা অনুনয়ে নামিয়ে এনে এবার বললে, 'একটা কাজ করবে?'

'বলো না! সাধ্য হলে নিশ্চয় করব।'

'তোমার কাছে খুচরো টাকা আছে? এই তিন-চারটে এক টাকার নোট?'

এ আবার কী ধরনের প্রশ্ন! পরাশর হঠাৎ আবোলতাবোল বকতে শুরু করল। আমার দশটাকার নোট হারাবার খবর দেওয়ার শোধ নিতে পালটা বিদ্রূপ করছে নাকি?

একটু অপ্রসন্ন স্বরেই তাই বললাম, 'তোমার কথার মানে বুঝতে পারছি না। তবে দু-তিনটে এক টাকার নোট ব্যাগে আছে বলেই মনে হচ্ছে।'

আমার গলার স্বরের তারতম্যটা যেন লক্ষই না করে পরাশর এবার যা অনুরোধ করলে তা অদ্ভুত।

বললে, 'ওইরকম গুটি-তিন-চার নোটও ড্রয়ারে ফেলে রাখো তো এখনই। খুচরো কিছু রেজগিও যেন থাকে।'

পরাশর আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি?

রীতিমতো গরম গলাতে বললাম, 'তুমি ফোন করতে বলেছিলে, তাই সত্য যেটুকু তাই তোমায় জানিয়েছি। তাতে এরকম রসিকতা যদি তুমি করো—'

'রসিকতা নয়, কৃত্তিবাস,' পরাশরের গলা একেবারে ব্যগ্র হয়ে উঠল, 'সত্যি বলছি, জেসিকে না জানিয়ে যা বললাম এখুনি করে ফেলো। জেসি ওখানেই আছে?'

'না।' বেশ বিমূঢ় হয়েই বললাম, 'একটা চিঠি ফেলতে গেছে।'

'চিঠি ফেলতে গেছে!' পরাশর চিঠি সম্বন্ধেও কৌতূহলী। 'কাকে কোথায় চিঠি লিখেছে তা দেখেছ?'

'সেটা কি দেখা উচিত?' পরাশরকে পালটা খোঁচা দেবার এ সুযোগটুকু নিয়ে তারপর সত্য কথাটা জানালাম, 'অন্য কিছু দেখিনি, তবে নামটা শুধু কোনও রকমে দেখে ফেলেছি। নাম হল টিমথি রীড।'

'টিমথি রীড!' পরাশর নামটা একবার উচ্চারণ করে তারপর বললে, 'ঠিক আছে। তোমাকে যা বললাম তা এখুনি করো। জেসি ফিরে আসবার আগেই।'

পরাশর ফোনটা ছেড়ে দিলে।

আমার এবার ব্যতিব্যস্ত অবস্থা। পরাশরের অনুরোধটা ঠাট্টা ভেবেই তাতে কোনও গুরুত্ব দেবার সময় দিইনি।

কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক,অনুরোধটা এখন না রাখলেই নয়। খুচরো এক টাকার নোট তিন-চারটে পেতে অসুবিধে হবে না বলেই পরাশরকে আশ্বাস দিয়েছি। কিন্তু ব্যাগের টাকাকড়ির সঠিক হিসাব তো সত্যি নেই। তিন-চারটে অন্তত টাকা কি এখনই জোগাড় করতে পারব? জেসি ফিরে আসবার আগেই আবার সেগুলো ড্রয়ারে রাখা দরকার।

শশব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে দেখলাম।

ভাগ্যটা একেবারে খারাপ নয়। তিনটে টাকা সেখানে পেলাম।

টাকা তিনটে আর খুচরো কিছু সিকি আধুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ড্রয়ারের ভেতর রেখে সেটা বন্ধ করে দিলাম।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়ার ভয়ে বুকটা তখন কাঁপছে। নিজের টাকা নিজের টেবিলে রাখার বদলে যেন চুরি করতে ঢুকেছি।

নির্বিঘ্নে টাকা ক-টা রেখে ড্রয়ারটা বন্ধ অবশ্য করতে পারলাম।

জেসির তখনও দেখা নেই। সে এখন এসে পড়লেও ধরবার মতো কিছু পাবে না।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই তখন আজগুবি লাগছে। ড্রয়ারের দশ টাকার একটা নোট পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তাতে আরও খুচরো কয়েকটা টাকাপয়সা রাখতে বলার মানে কী!

নিতান্ত সোজা মানে তো এই হয় যে জেসি আগের দশ টাকার নোটটা চুরি করেছে ধরে নিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য আরও খুচরো কিছু ড্রয়ারে রেখে দেওয়া।

কিন্তু জেসি এমন ছিঁচকে চোরের অধম যে দশ টাকার একটা নোট চুরি করবে? তারপর তাকে চুরিতে প্রলুব্ধ করবার জন্য গোটা তিন-চার টাকার টোপই যথেষ্ট?

জেসির চাল চলন পোশাক আশাক সব সৃষ্টিছাড়া হতে পারে, কিন্তু ইউরোপ কি মার্কিন মুলুক ছেড়ে সে দশ টাকার নোট চুরি করতে এ দেশে এসেছে বলে মনে হয় না।

আর তাই যদি হয় তা হলে অসুবিধের কথা না ভেবে পরাশরের আমার ঘাড়ে তাকে চাপাবারই বা কেন এত গরজ?

সাত

স্নান টান সেরে দিনের কাজের জন্য অফিসঘরে আসতে আসতেই এসব কথা ভাবছিলাম।

জেসি তখনও পর্যন্ত ফিরে আসেনি।

আমার বাসার কাছেই পোস্ট বক্স শুধু নয়, দু-পা গেলে স্থানীয় পোস্টাফিস। ফরেন এয়ার মেল যখন কিনেছে তখন সে পোস্টাফিস তার জানা উচিত।

এতক্ষণে সেখান থেকে তো দশবার চিঠি ফেলে আসা যায়।

চিঠি ফেলতে গিয়ে সে কি আর কোথাও গেছে!

যে চুলোয় খুশি যাক গিয়ে। আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শুধু হাজার হলেও আশ্রিতা বলে তার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকতে পারছি না।

ফিরে এলে তার খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছে সেই কথাটাই জেনে নিতাম।

কিন্তু এক ঘন্টার জায়গায় দু ঘন্টা হয়ে গেল, তবু তার দেখা নেই।

আমার অফিসের সেদিন ছুটির দিন। অফিসের কেউ আসবে না। ইচ্ছে করলে জেসির খোঁজ করতে একটু বেরোতে পারি। কিন্তু অতটা মাথাব্যথাই বা আমার কেন?

পরাশরকে শুধু কথাটা একবার জানানো দরকার মনে হল।

ফোন তুলে তার নম্বরই ডায়াল করলাম।

কিন্তু ও প্রান্তের গলার স্বর শুনেই বুঝলাম রং নম্বর। গলার স্বর কোনও মেয়ের।

বিরক্ত হয়ে আবার ডায়াল করবার জন্য ফোনটা নামাতে গিয়ে হঠাৎ একটু অবাক হয়ে থামতে হল।

ওধারে ফোনটা ধরে কে বলছে, 'এটা তোমার ফোন, পার্স।'

মেয়ের গলা শুনে নয়, ওই পার্স নাম শুনেই থমকে গেছলাম।

পার্স সম্বোধনটা তো আমার জন্য। একমাত্র জেসির মুখেই তো নামের ও বিকৃতি শুনেছি।

তা হলে কি রং নম্বর বলে জেসিই পরাশরের বাসায় রয়েছে?

সন্দেহ ভঞ্জন হতে দেরি হল না।

'হ্যাঁ, বলো কৃত্তিবাস' ও প্রান্তে পরাশরেরই গলা, 'নতুন কিছু খবর আছে?'

'না, খবর তো তোমার ওখানেই!' একটু বাঁকা সুরে বললাম, 'জেসি চিঠি ফেলতে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ফিরে আসেনি। তোমায় সে কথা জানাতে ফোন করছিলাম। কিন্তু সে তো তোমার ওখানেই গেছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কয়েক মিনিট হল এসেছে।' পরাশর ফোনটা ছাড়তে ব্যস্ত মনে হল, 'আমার কাছে কী সব নাকি বলতে চায়। আচ্ছা, নতুন কোনও খবর থাকলে দিয়ো।'

'নতুন খবর আবার কী থাকবে!' একটু বিরক্তির সঙ্গেই তাকে ধরে রেখে বললাম, 'তুমি যা বলেছিলে তা করেছি। সত্যি ওসবের কিছু দরকার ছিল কি!'

'হ্যাঁ, ছিল। তবে আর বোধহয় দরকার হবে না,' বলে পরাশর ফোনটা নামিয়ে দিলে।

বেশ একটু অসন্তুষ্টই হলাম তার এই ব্যবহারে। জেসির কথা শোনা জরুরি হতে পারে, কিন্তু সে তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তার আগে দু-মিনিট আমাকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিলে হত না।

মন থেকে ওদের কথাটা ঝেড়ে ফেলে খুচরো ক-টা কাজ সেরে ফেলার জন্য কাগজপত্র বার করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সবিস্ময়ে দরজায় তাকাতে হল।

সেখান দিয়ে যে মূর্তিটি ঢুকছে সে যেন ভুতুড়ে গল্পের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। সাদা চামড়ার বিদেশি ছেলে, কিন্তু কবর ঠেলে উঠে আসা যেন একটা কঙ্কাল। রুক্ষ চুল, ছেঁড়া শার্ট-প্যান্ট আর জুতো দেখলে সেই ধারণারই সমর্থন মেলে।

চোখের তারা নীল। কিন্তু দৃষ্টিটা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু গলাটি চেহারা পোশাকের তুলনায় রীতিমতো বাজখাঁই।

সেই জ্বলন্ত বাজখাঁই গলায় দরজা থেকে সে আমায় গালাগাল শুরু করলে।

'তুমি! তুমি সেই বদমাস সম্পাদক আমার জ্যানেটকে এখানে বন্দি করে রেখেছ? তোমায় আমি খুন করতে এসেছি। টেরি পোলকের সঙ্গে লাগবার মজা তোমায় জন্মের মতো বুঝিয়ে দিয়ে যাব।'

ফোনে এই গলাই যে শুনেছি এ বিষয়ে তখন আর সন্দেহ নেই। নামটা তো নিজেই জানিয়ে দিলে। কিন্তু এ তালপাতার সেপাই বীর টেরি পোলকের হয়েছে কী! দরজা থেকে আমার টেবিলের কাছে আসতেই পাগুলো যেন কাঁপছে।

নেশা ভাঙ করে এসেছে নাকি!

না, পায়ের টলা তো মাতালের মতো নয়। চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন অস্বাভাবিক। মদের নেশায় এমন যেন জমে-যাওয়া চোখই হয় না।

আমার টেবিলের কাছে আসতে আসতেই টেরি পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে ফেলেছিল।

ছোরা নয়, ছুরিই, তবে একটু একধার টিপলেই ফলাটা যা থেকে ঝট করে বেরিয়ে আসে সেইরকম বিদেশি ছুরি।

ছুরিটা শাসাবার জন্যই বার করেছিল নিশ্চয়, কিন্তু আমার টেবিলের কাছ পর্যন্ত আসতেই কেঁপেটেপে অস্থির হয়ে কোনওরকমে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে সামলাল।

ছুরিটা তখন হাত থেকে পড়ে গেছে, আর মুখটা আসছে কেমন নীল হয়ে।

কী জ্বালা! অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি?

তাড়াতাড়ি ওধারে ঘুরে গিয়ে তাকে ধরাধরি করে এনে আমার ডিভানটাতেই শোয়ালাম।

তারপর মুখেচোখে দেবার আর খাওয়াবার জন্য জল আনতে যাচ্ছি, সে আকুলভাবে বাধা দিয়ে ডেকে বললে, 'দোহাই তোমার, একটু ঘোড়া এনে দাও।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এর মধ্যেই প্রলাপ বকতে শুরু করল যে! একটু ঘোড়া এনে দিতে বলা প্রলাপ ছাড়া আর কী? বাংলায় ঘোড়া বলেনি অবশ্য, কিন্তু ইংরেজিতে স্পষ্ট 'হর্স' শব্দটা ব্যবহার করেছে।

এ বিকারের রুগিকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

'আনছি, আনছি, ঘোড়াই আনছি,' বলে তাই জল আনতে ভেতরে গেলাম।

জল এনে আর মুখে তুলে দিতে হল না।

বীর টেরি পোলক তার কঙ্কালসার শরীরটা আমার ডিভানের ওপর ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম, না এটা বেহুঁশ হওয়া?

ভয়ে ভয়ে তার বুকে হাত দিলাম। ক্ষীণ হলেও ধুকধুকুনিটা আছে।

নিজের ওপর আর দায়িত্ব রাখতে সাহস না করে বর্তমানে হিপি বিশেষজ্ঞ পরাশরকে ফোন করলাম।

'কী? কী নাম বললে, টেরি পোলক?' পরাশর সব শুনে রীতিমতো তখন উত্তেজিত। 'আমরা এখুনি যাচ্ছি। ওকে ধরে রাখো। যেতে দিয়ো না।'

'ধরে রাখবার দরকার নেই,' পরাশরকে আশ্বাস দিলাম, 'আমার ডিভানের ওপরই আধা-অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ছেড়ে দিলেও যেতে পারবে না।'

পরাশর আর জেসির আসতে দেরি হল না।

সমস্ত রহস্যটাই পরাশর তারপর ব্যাখ্যা দিলে।

'ঘাস' আর 'ঘোড়া' মানে মারিজুয়ানা আর হেরোইন-এর সর্বনাশা নেশায় যৌবনেই নিজেদের যারা ফৌত করে ফেলছে, টেরি পোলক নতুন যুগের সেই বিদেশি ছেলেদের একজন

অতিবড় হতভাগ্য। দেশ ছেড়ে সস্তা নেশার লোভে সে নেপালের কাঠমুন্ডুতে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে। পয়সা-টয়সা সব ফুরিয়ে যাবার পর নিজের পাসপোর্টটাও এসবের কারবারি শয়তানদের কাছে বিক্রি করে কিছুদিন চালিয়েছিল। তাতেও হালে পানি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষেও করেছে। দেশ থেকে তার খোঁজ করে তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে তার আত্মীয়েরা। কিন্তু দেশে সে যাবে না। পাছে ধরে নিয়ে যায় ভয়ে কাঠমুন্ডু থেকে পালিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে শেষে এই কলকাতায় এসব নেশাখোরের চরম দুরবস্থার শেষ আশ্রয় এমন এক চোরা বিবরে গা ঢাকা দিয়েছে যে তার সন্ধান পেতে শহরের পুলিশও নাজেহাল হয়েছে। ওপর মহল থেকে টেরিকে খুঁজে বার করবার ভার নিয়ে পরাশর একদিকে সব রকমের হিপির সঙ্গে মিলে যেমন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে তেমনই বিশেষ নজর রেখেছে একটি মেয়ের উপর। ওই মেয়েটিই জ্যানেট মার্টিন, ডাকনাম যার জেসি। জেসি টেরির দেশের শুধু নয়, এক শহরেরই মেয়ে। এককালে দু-জনের মধ্যে একটু ভালবাসাও হয়েছিল। হাসিস আর হেরোইনের নেশায় সে সব মুছে গেলেও জেসির মনে মায়াটা যায়নি। সে মায়াটাই অবশ্য টেরির পক্ষে সর্বনাশা। জেসি টেরির নেশার জন্য পাগল হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে লুকিয়ে তাকে যথাসাধ্য যখন যা সম্ভব সাহায্য করে।

এইটেই সন্দেহ করে জেসির মারফতই টেরির সন্ধান পাবার জন্য পরাশর জেসির সঙ্গে পরিচয় করে। তারপর তাকেও যে জোর করে দেশে নিয়ে যাবার সত্যি চেষ্টা হচ্ছে তা জানিয়ে যেন তাকে লুকোতে সাহায্য করবার জন্য আমার বাসায় রাখবার ব্যবস্থা করে।

ওদিকে অন্য হিপিদের মারফত জেসির নতুন ঠিকানাটা তাতে লুকিয়ে-থাকা টেরির কানে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করতেও পরাশর ভোলে না।

জেসি টেরিকে নেশার রসদ জোগাবার চেষ্টা তো করবেই, টেরিও জেসির ঠিকানাটা জানলে তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে পরাশরের এ অনুমানে ভুল হয়নি।

যে নিজেই কাঙাল সে টেরিকে কী করে সাহায্য করবার চেষ্টা করতে পারে তাও পরাশর ঠিকই বুঝেছিল।

জেসি সে রাত্রে আমার দশ টাকার নোটটা চুরি করেছিল ওই জন্যই। তাকে আরও চুরিতে প্রলুব্ধ করবার জন্যই পরাশর ভুয়ারে আমায় খুচরো টাকা যেন অসাবধানে ফেলে রাখতে বলেছিল।

টাকা চুরি করবার পর টেরি পোলককে পৌঁছে দেবার সময় জেসির পিছু নিয়ে কার্যোদ্ধারের ফন্দিটা কিন্তু প্রথমবারে সফল হয়নি।

সেদিন সকালবেলা আমার বাসার নীচে জেসির ওপর নজর রাখবার জন্য পরাশর লোক রেখেছিল। হয় লোকটার দোষে বা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকার দরুন জেসি আমার বাসা থেকে চিঠি ফেলার নামে বার হবার কিছু পরেই কেউ তাকে অনুসরণ করছে বলে সন্দিগ্ধ হয়। তাকে দেশে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা যাদের মারফত হচ্ছে সেই পুলিশের চর কেউ তার পিছু নিয়েছে মনে করে জেসি তখন সে লোককে এড়িয়ে সোজা পরাশরের কাছে আশ্রয়ের জন্য গিয়ে ওঠে।

তার পর যেভাবে টেরি নিজে থেকেই ধরা পড়বার সুযোগ দিয়েছে সে বৃত্তান্তে আর নতুন কিছু যোগ করবার নেই।

এ কাহিনীর উপসংহারটা মধুরই হবে আশা করা যায়।

টেরি পোলক আর জ্যানেট মার্টিন দু-জনকেই দেশে পাঠানো গিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

সেখান থেকে নেশার টানে আবার যদি তারা না পালায়, তা হলে দু-জনের পুরাতন প্রেম আবার কি জেগে উঠতে পারে না?

pathagar.net

প্রেমের চোখে পরাশর

pathagar.net

প্রেমের চোখে পরাশর

বড় কোনও জংশন স্টেশনে আসবার আগে অসংখ্য লাইনের জটলায় জটিল, অগুনতি প্যাসেঞ্জার আর গুডস ওয়াগনে আকীর্ণ রেলের অরণ্য গোছের প্রদেশ আমাদের সকলের কোনও না কোনও সময়ে চোখে পড়েছে নিশ্চয়।

কিন্তু ট্রেনের কামরা থেকে দেখায় এ যান্ত্রিক অরণ্যের ভয়াল মহিমা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে কি?

এরকম অঞ্চলের রহস্য বিস্ময় আর তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা আতঙ্কের পুরো স্বাদ পেতে গেলে বাইরে থেকে দেখা দরকার।

খুব উঁচু কোনও সিগন্যাল টাওয়ার বা অন্তত কোনও ওভারব্রিজের ওপর থেকে দেখতে পারলেই ভাল।

আর দেখাটা ভোর হবার আগে যেন হয়।

সেদিন অমনই কোনও সুবিধের জায়গা থেকে চৌগড় জংশনের অ্যাপ্রোচ ইয়ার্ডটার দিকে চোখ পড়লে বেশ একটু অবাকই হতে হত।

শুধু অবাক নয়, একটু সন্দিগ্ধ ও ভাবিতও।

নীচে আধো অন্ধকারে রেল লাইনের জটিল অরণ্যে একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার যে ঘটছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনও একটা রহস্য নাটকেরই যেন একটা ভূমিকা।

অত ভোরেও রেল ইয়ার্ড একেবারে নিস্তব্ধ নয়। কোথাও শান্টিং হচ্ছে মালগাড়ির, কোথাও গ্যাংম্যানেরা আলো জ্বেলে লাইনের জোড় পরীক্ষা করছে, আবার কোথাও একেবারে নির্জন লাইনের ধারে অত ভোরেও ভিখারি আর কটা কাক রেলের ধারে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনার মধ্যে তাদের সকালের খাবার কিছু পাওয়া যায় কি না তাই খুঁজছে।

কাকগুলো হঠাৎ কলরব করে উড়ে যাওয়াতেই নীচের একটা ব্যাপারে বোধহয় চোখ পড়ে যেতে পারে।

অন্ধকারে কখনও চোরের মতো উঁকি মেরে, কখনও হঠাৎ ছুট দিয়ে একটা আবছা মূর্তি লাইনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

লাইনগুলোর ওপর দিয়ে এমনভাবে যাওয়া যে তার খেয়াল বা শখ নয়—একটু কাছে থেকে দেখলেই তা বুঝতে আর বাকি থাকে না।

এক মুখ দাড়ি গোঁফ, উসকোখুসকো লম্বা চুল, গায়ে একটা আধ ময়লা শার্ট আর প্যান্ট, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো—মানুষটাকে দেখলেই ঠিক স্বাভাবিক সাধারণ নয় বলেই সন্দেহ জাগে।

এক লাইন থেকে আর এক লাইনে, এক মালগাড়ির সারের পেছন থেকে আর-এক দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনের নীচে, এমনই করে মানুষটা শেষ পর্যন্ত একটা ছোট স্টেশনের দিকেই এগোচ্ছে বলে বোঝা যায়।

স্টেশনটা নেহাত নগণ্য। বড় স্টেশনের আগে একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন গোছের।

আপাতত লাইন ক্লিয়ার না পেয়েই বোধহয় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ওপরের আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও সরকারিভাবে সকাল এখনও হয়নি।

pathagar.net

স্টেশনে দাঁড়ানো গাড়িটার কয়েকটা কামরায় আলো দূর থেকে দেখা যায়। আর সব চেয়ে যা জ্বল জ্বল করে তা ট্রেনের শেষ প্রান্তে গার্ডের গাড়ির পেছনের দুটো গাঢ় লাল আলো।

সে আলো দুটো যেন জ্বলন্ত নিষেধের মতো মানুষটাকে একটু থমকে দেয় কি?

লোকটা সত্যিই লাইনের ওপর রাখা একটা জালা-পেট তেলের ওয়াগনের পেছনে খানিক দাঁড়িয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তার পর আবার সেই প্ল্যাটফর্মের দিকেই যেতে আরম্ভ করে। এবার আর গুটি গুটি পা ফেলে নয়, বেশ একটু দৌড়েই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা ধরতে পারাটাই এখন যে তার লক্ষ্য তা বোঝা শক্ত নয়।

ভোরবেলাকার ছোট স্টেশনটা তখন একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ বললেই হয়। তার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাই যা কিছু প্রাণের চাঞ্চল্যের পরিচয়।

প্যাসেঞ্জারটা দূর কোথাও থেকে সারারাত ধরে আসছে। বেশির ভাগ গাড়ি গাদাগাদি করে ঠাসা হলেও, ওরই মধ্যে বেশির ভাগ যাত্রী তখনও ঘুমে অসাড়।

গাড়িটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বলে বড় কেটলি আর মাটির ভাঁড়ের ঝোলা কাঁধে একটি মাত্র চা ওয়ালা তখনও সেখানে নেহাত দায়সারাভাবে তার সওদা এক আধবার হেঁকে যাচ্ছে।

গাড়ির কোনও কামরা থেকে নয়, স্টেশনের ভেতরেই প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় জমা করে রাখা এক রাশ বস্তার পাশ থেকে চা-ওয়ালার ডাক আসে:

'এই চা ওয়ালা—এদিকে।'

চা-ওয়ালাকেও এ ডাকে একটু অবাক হয়ে থামতে হয়। বিস্ময় আর সেই সঙ্গে একটু অস্বস্তিও থাকে বোধহয়।

বস্তার পাহাড়ের পাশে যে ক জনকে দেখা যাচ্ছে তাদের চেহারাগুলোয় অস্বাভাবিক কিছু একটা যেন আছে।

এরা যাত্রী নয়, কিন্তু এমন অসময়ে এই স্টেশনে কেন?

স্টেশনে কারণে অকারণে অনেকেই অবশ্য আজকাল আসে। সময়ে অসময়ে একটু এসে বসবার কি আড্ডা দিয়ে যাবার এমন জায়গা আর ক-টা মেলে।

কিন্তু এ স্টেশনে আশপাশের এলাকা থেকে অমন বেকার আড্ডা দিতে যারা আসে তারা চা-ওয়ালার চেনা। তারা অমন ভোরবেলায় স্টেশনে এসে জমায়েত হয় না।

চা-ওয়ালার অবশ্য শুধু তার হক্কের পাওনা মারা যাবারই ভয়। জোর জুলুম করে ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা সাবাড় করে দুশমন মক্কেলরা হয়তো পয়সা দেবে না।

চা-ওয়ালা তাই ডাক শুনেও আসে না। জুলুম এড়াবার জন্য চা দেবার ছলে একটা কামরার ভেতরেই ঢুকে পড়ে অন্য দিক দিয়ে নেমে যায়।

অমন করে না পালিয়ে চা দিতে এলে দাম ঠিকমতো তার মিলত কি না বলা যায় না, কিন্তু এদের কথাবার্তাগুলো শুনলে সে ভয় পেত নিশ্চয়। অবশ্য চা-ওয়ালা সামনে থাকলে কথাগুলো এমন খোলাখুলি হয়তো হত না।

মালের বস্তার পাহাড়ের পাশের তিনটি মূর্তির মধ্যে একটির রীতিমতো জবরদস্ত লম্বা চওড়া চেহারা আর দুটি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের ছোকরা। চা-ওয়ালাকে ভয় পেয়ে পালাতে দেখে তাদের একজন হেসে উঠে বলে, 'ভয় পেয়েছে বেটা।'

আর-এক ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'বেটাকে ধরে আনব গিয়ে, ভোলাদা?'

'না,' ভোলাদা বলে সম্বোধিত দুশমন চেহারার লোকটি জবাব দেয়, 'চা ওয়ালাকে ধরতে এখানে এসেছিস? নজর রাখ ঠিকমতো।'

'নজর রাখবার আর কিছু আছে নাকি!' ছোকরাদের একজন আস্ফালনের সঙ্গে জানায়—'একেবারে জাঁতাকলে চেপে ধরেছি না!'

দ্বিতীয় ছোকরাও তাতে সায় দেয়—'একটা ছুঁচো গলবার ফাঁক কোথাও নেই।'

pathagar.net

'আমরা যে এতখানি তৈরি তা ভাবতেও পারেনি।' প্রথম ছোকরা গর্বভরে বলে যায়— 'রেলের বাসের সব রাস্তায় পাহারা। এমনকী ফেরিঘাট দিয়ে পর্যন্ত যাবার উপায় রাখিনি। চৌগড় থেকে নাকটা পর্যন্ত বার করতে পারবে না।'

'আর এর পর চৌগড়েই টুঁটি চেপে ধরব'—প্রথম ছোকরা উল্লসিত হয়ে উঠে গলার ওপর দিয়ে ছড়ানো হাতটা ছুরির মতো চালাবার ভঙ্গি করে— 'আর একবার ধরতে পারলেই—এই!'

ছোকরার উল্লাসের হাসিটা কিন্তু আরম্ভ হয়ে মাথায় একটি কড়া গাঁট্টা পড়ে থেমে যায়।

'চোপ উজবুক!' তাদের ভোলাদা চাপা গলার গর্জে ওঠে, 'ভারী চাক্কু চালানেওয়ালা হয়েছে!'

গাঁট্টা খাওয়া ছোকরা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কী বুঝি বলতে যায়। কিন্তু আবার ধমক দিয়ে তাকে থামাতে হয়। ভোলাদা অন্য ছোকরাকে হুকুম দিয়ে বলে, 'এই সমরা, যা এই বিশেটাকে নিয়ে এ গাড়িটাও একবার দেখে আয় তো।'

'এ-গাড়িটা দেখে আসব!' সমরা অর্থাৎ সমর নামে ছোকরা একটু আপত্তি তোলার চেষ্টা করে—'এ গাড়ি তো আমাদের স্টেশন থেকেই ছেড়েছে। তখনই ভাল করে দেখে নিজেরাই এটাতে এসেছি। সেই থেকে গাড়িটা এখানেই দাঁড়িয়ে। এটা আবার খুঁজে লাভ কী?'

তাদের ভোলাদার চোখের একটু শাসানির ঝিলিকে সমর আর বিশুকে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আর-একবার তবু খুঁজে আসতে যেতেই হয়।

গাড়িটা তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। গাড়ির মাঝখান থেকে একজন সামনের দিকে আর একজন পেছন দিকে কামরাগুলো খুঁজতে শুরু করে।

ভোরের আলো তখন ক্রমশ আরও ফুটতে শুরু করেছে। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এতক্ষণ একটা স্টেশনে আটকে থাকার জন্য অস্থিরতা আর ধৈর্য তীব্র হয়ে উঠছে, কামরা ছেড়ে অনেকেই বাইরে বার হয়ে এসেছে খোঁজ নেবার জন্য। বিক্ষোভের গুঞ্জনও একেবারে চাপা নেই।

এরই মধ্যে সমর আর বিশু কামরায় কামরায় ঢুকে খোঁজ করে যাওয়া আর কারও না হোক বিশেষ একজনের চোখ এড়ায়নি। সমর আর বিশু যখন তাদের ভোলাদার আদেশে ট্রেনটা খুঁজে দেখতে এসেছে, তার কিছু আগেই সে লোকটি পেছনের রেললাইন থেকে সন্তর্পণে উঠে এসে পেছনের একটি কামরায় আশ্রয় নিয়েছে।

আশ্রয় নিয়েও নিশ্চিন্ত সে হতে পারেনি। কামরার জানলা দিয়ে বার বার এদিকে ওদিকে উঁকি মারা থেকেই সেটা বোঝা যেতে পারত। ভোরবেলা কিছু যাত্রী ঘুমের জড়তায় আচ্ছন্ন আর বাকিরা গাড়ি এতক্ষণ অন্যায়ভাবে থেমে থাকায় নিজেদের বিরক্তি বিক্ষোভেই অস্থির বলে তেমন কারও বোধহয় নজরে পড়েনি।

জানালা দিয়ে এইরকম সশঙ্ক উঁকি দেওয়ার মধ্যেই সমর আর বিশুর ট্রেনটার দিকে এগিয়ে আসা সে দেখতে পেয়েছে। মালের বস্তার গাদার পাশে বিশাল বপু ভোলানাথও তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

সমর আর বিশু ট্রেনের দিকে কেন যে আসছে তা তার বুঝতে বিলম্ব হয়নি। প্রত্যেকটি কামরা তন্ন তন্ন করে তারা খুঁজবে। এ কাজে এতটুকু গাফিলতি তাদের থাকবে না।

এখন আর ট্রেন থেকে নেমে পালাবার উপায় নেই।

ভোলানাথ মালের গাদার কাছ থেকে প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে। ভোলানাথ এখন আর একা নয়, আরও দুজন তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। ভোলানাথের মতো এ দুজনও পলাতক লোকটির অচেনা নয়।

এখন ট্রেন থেকে নামবার চেষ্টা করলে ধরা পড়তেই হবে। চৌগড়ের দিকের রেলওয়ে ইয়ার্ড বা এদিকের মাঠ-বন-জঙ্গল যেদিক দিয়েই ছুটে পালাবার চেষ্টা করুক, এদের শ্যেন দৃষ্টি সে

এড়াতে পারবে না। দৌড়ের পাল্লায় এদের সকলকে হারাবার চিন্তাও বাতুলতা।

নেমে পালাবার চেষ্টা না করলে এই ট্রেনেই থেকে যেতে হয়। তার পরিণামও সেই এক।

এক কামরা থেকে অন্য কামরায় খোঁজ করতে করতে দুজনের একজন অনেকখানি কাছে এসে পড়েছে। মাঝখানে আর দুটি মাত্র কামরাই আছে।

ট্রেনটা এখন ছেড়ে দিলেও বুঝি একটু সুবিধা হবার আশা ছিল। তা কিন্তু ছাড়ে না।

খানিক বাদেই ওদিকের কামরাগুলো সেরে সমর এসে এই কম্পার্টমেন্টটাতেই ঢোকে। এবার আর সে একা নয়। ভোলানাথের সঙ্গে পরে যাদের দেখা গিয়েছিল তাদের একজনও সমরকে সাহায্য করতে এই কামরাতেই ওঠে।

সন্ধানের কোনও ত্রুটিও তারা রাখে না। অন্য কামরার মতো বাথরুমের দরজাও তারা টেনে খুলে দেখে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ব্যর্থ হয়েই তাদের নেমে যেতে হয়।

ট্রেন যেন তাদের খুঁজতে দেওয়ার জন্যই এতক্ষণ বিলম্ব করে এবার চলতে শুরু করে।

প্ল্যাটফর্মের ওপর ভোলানাথের পাশে তখন নতুন আরও কয়েকজন জড়ো হয়েছে।

তাদের একজনকে বলতে শোনা যায়—'না ভোলাদা, শহর, ফেরিঘাট আমাদের সব পাহারার ঘাঁটি থেকে খবর নিয়ে আসছি। এখনও পর্যন্ত কোথাও তার চুলের টিকি দেখা যায়নি।'

'তার মানে', ভোলানাথ একটু তৃপ্তির হাসির সঙ্গেই বলে, 'এখনও চৌগড়েই আছে, আর বেরোতে হলে এই লাইনের ট্রেনে ছাড়া আর উপায় নেই।'

'এ ট্রেনটায় অন্তত আসেনি।'—সমরের সঙ্গে বিশু এসে রিপোর্ট দেয়—'একেবারে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছি।'

'সব ট্রেনগুলোই অমনই করে খুঁজতে হবে।' ভোলানাথ হুকুম দেয়, 'চৌগড়ে তো বটেই, এদিক ওদিকের পর পর তিনটে স্টেশনেও। শুধু প্যাসেঞ্জার নয়, মালগাড়িগুলোও চেক করতে ছাড়বি না। আজ সারাদিন এই পাকাটা চৌগড় থেকে ট্রেনের লাইনে পালাবার সুবিধে যেন কিছুতে না পায়।'

যাকে ধরবার জন্যে এত তোড়জোড় সে মানুষটা কিন্তু ট্রেনের লাইন দিয়ে তার শত্রুপক্ষের কড়া পাহারা এড়িয়ে পালায়।

পালায় ওই স্টেশনে আটকে থাকা সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনেই।

সমর আর তার সঙ্গে তাদের দলের নবাগত আর-একজন কামরাটা কি ভাল করে খোঁজেনি তা হলে?

না, সে-বিষয়ে কোনও ত্রুটিই তাদের ছিল না। তারা শুধু কামরার মানুষ ক-টাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেনি। বাথরুম পর্যন্ত খুলে তল্লাশ করে এসেছে।

লোকটি তা হলে ছিল কোথায়?

ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায়। গাড়ির তলায় দুদিকের চাকার মাঝখানের একটা জায়গায় এক হিসেবে প্রাণ হাতে নিয়ে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। চোরাই চাল পাচার করবার জন্য যৎসামান্য মজুরির লোভে যাদের লাগানো হয় সে রকম অনেককে ওই রকম বিপজ্জনকভাবে ট্রেনের তলায় লুকিয়ে যেতে সে দেখেছে। প্রাণের দায়ে সেই কাজ তাকে আজ করতে হয়।

তার ভাগ্য ভাল যে ট্রেন ছাড়বার আগেই তার শত্রুপক্ষের দূতেরা গাড়ি থেকে নেমে যায়। ট্রেন ছাড়বার আগেই গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে সময় মতো চলন্ত ট্রেনে উলটো দিক থেকে উঠতে তার খুব অসুবিধা হয় না।

আশু বিপদটা কেটে গেলেও লোকটিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুব নিশ্চিন্ত নিরাপদ মনে হয় না।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ছোট-বড় সব স্টেশনই ছুঁয়ে যায়। গুটি পাঁচেক স্টেশন পার না হওয়া পর্যন্ত লোকটি প্রতি স্টেশনেই ট্রেন থামামাত্র উলটো দিকে নেমে পড়ে। ট্রেন ছাড়বার পর তখন আবার ওঠে।

এ অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কারও কারও নজরে হয়তো পড়ে। কিন্তু পড়লেও তা নিয়ে কিছু করবার সুযোগ লোকটি দেয় না। গুটিকয়েক স্টেশন পার হবার পর অমনইভাবে নেমে যাবার পর ট্রেনে আর সে ওঠে না।

প্ল্যাটফর্মের অন্য দিক দিয়ে ঘুরে সাবধানে এদিক ওদিক লক্ষ করে তাকে স্টেশনের বাইরেই বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।

এখন অনেকটা যে সে নিশ্চিন্ত — ছোট স্টেশনের বাইরে কাঠের বেঞ্চিপাতা টিনের শেডের তলায় সস্তা কাঠের বাঁচটা টেবিলে বসে আধময়লা পেয়ালায় তাকে চা খেতে বসেছে দেখেই খানিকটা অনুমান করা যায়।

হাঘরে বাউন্ডুলে চেহারার পলাতক লোকটিকে আমরা এখনও চিনি না। কিন্তু তার চা খাওয়ার জন্য ময়লা পেয়ালা মুখে তোলার সঙ্গে মিলিয়ে আর একটি অনুরূপ দৃশ্যে গিয়ে এ পরিচয়-রহস্যের প্রাথমিক একটা খেই বোধহয় পেতে পারি।

এ দৃশ্যে মুখে তোলা চায়ের পেয়ালাটা অবশ্য নোংরা বা চটাওঠা নয়, বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুশ্রী।

চায়ের পেয়ালা থেকে একটু পিছিয়ে এসে চায়ে চুমুক দেওয়া মানুষটাকে দেখলেও, কিছু না জেনেও, একটু বুঝি কৌতূহলী হতে হয়।

বয়সে লোকটি তরুণ। চায়ের পেয়ালাটির মতো চেহারাতেও তার একটা পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যের ছাপ। বেশ পরিপাটি করে কামানো গাল, মাথার চুলগুলি খুব সযত্নে আঁচড়ানো না হলেও অবহেলায় উসকোখুসকো বলা চলে না। সকালবেলা টিপয়ের ধারে বসে একটি খবরের কাগজ বাঁ হাতে ধরে পড়তে পড়তে ডান হাতে সে চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলেছে। সুদৃশ্য বইয়ের আলমারি ও শেলফ দিয়ে সাজানো প্রশস্ত ঘরটির আসবাবপত্র ও উপকরণে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য না থাকে একটা রুচিকর স্বাচ্ছল্যের আভাস পাওয়া যায়।

মানুষটি সম্বন্ধে যা কিছুই মৃদু কৌতূহল জাগায় তা কিন্তু তার বাইরের পরিবেশ ও উপকরণ নয়, তার চেহারাটাই প্রথম দৃষ্টিতে মনের মধ্যে কী একটা অস্ফুট প্রশ্ন যেন তুলতে চায়।

চায়ের ট্রে র পাশে একটা চুরুটের বাকস রেখে যে পরিচারকটি নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তার সঙ্গে হঠাৎ বেজে ওঠা পাশের ঘরের ফোনের ছোট টেবিলের কাছে গিয়ে তারই ধরে রাখা একটি খোলা লেটার প্যাডে লোকটির নামও আমরা জানতে পারি।

প্যাডের ওপর লেখা নাম হল — বারীন রক্ষিত, অ্যাডভোকেট।

পরিচারক তখন ফোনটা তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে—'আজ্ঞে, আমি মাখন বলছি। ...আজ্ঞে, হ্যাঁ, তিনি আছেন।...আচ্ছা, তাঁকে দিচ্ছি।'

পরিচারক মাখন এবার টেলিফোনটা ধরে বারীন রক্ষিতের কাছেই আর-একটি টেবিলে এনে রাখে।

বারীনের মুখটা একটু অপ্রসন্নই মনে হয়। সামান্য একটু ভ্রূকুটি করে বলে, 'আজ ফোন ধরব না বলেছিলাম না? কার ফোন আবার এনলি?'

'দস্তিদারবাবুর ফোন।' সংবাদটা জানিয়ে মাখন ফোনটা বারীন রক্ষিতের হাতে দিয়ে তার নির্দেশের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে থাকে।

টেলিফোনের মাউথপিসটায় হাত চাপা দিয়ে বারীন রক্ষিত মাখনকে একটু কড়া গলাতেই বলে, 'আর কিন্তু কারও ফোন এলে দেবে না। বাইরের বোর্ডেও আউট করে দাও।'

মাখনকে হুকুম করে বিদায় করার পরই বারীন টেলিফোনে আলাপ শুরু করে।

'কে দস্তিদার!'—বারীনের গলায় একটু চাপা অধৈর্যই ফুটে ওঠে—'না, ঘুমোচ্ছিলাম না। এত বেলায় কেউ ঘুমোয়! তোমার ফোন ধরিনি কেন? কোনও ফোনই আর এখন থেকে ধরব না বলে। কেন তা এখনও বুঝতে পারছ না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বাতিকই বলো, নেশাই বলো, সেই পাগলামির জন্যে—হ্যাঁ, সেই পাহাড়ি গোঁয়ারতুমি। সেই মাউন্টেনিয়ারিং। কতদিন লাগবে? তা এক মাস তো বটেই। এক মাসের জন্যে তাই কোনও কাজ নেব না। না, না' খুব দুঃখিত ভাই। অন্যায় অনুরোধ কোরো না।'

বারীনের ফোন করার মধ্যে একজন মুহুরি কয়েকটা ফাইল নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। চোখের ইঙ্গিতে মুহুরিকে ফাইলগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখতে বলে বারীন আবার ফোনে কান দিয়ে একটু হেসে ওঠে।

'কী বলছ? বড় মক্কেল? মোটা ফি? জানি, জানি, ভাই। প্যাসিফিক করপোরেশনের নামটা কি আর আমার অজানা? কিন্তু উপায় নেই ভাই। এই একমাস আমি কারও নই। কী? বকশিকাকা আসছেন?' বারীনের গলায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এবার অবশ্য অস্পষ্ট থাকে না। একটা সম্ভ্রমের সুর তার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তার মত বদলায় না।

'বকশিকাকা এই কেস নেবার জন্যে নিজে বলতে আসছেন?' বারীন দুঃখের সঙ্গেই তার আপত্তিটা জানায়—'না, না, আসবেন না কেন? তাঁর পায়ের ধুলো পড়াটা তো আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এখন আর মত বদলানো সম্ভব নয়।'

ফোনে কথা বলতে বলতে বারীনের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে রাখা পাহাড় চূড়ায় অভিযানের কিছু সাজসরঞ্জাম আমাদেরও চোখে পড়তে পারে।

সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই বারীন অন্যমনীয়ভাবে বলে যায়, 'শুধু আমি একা তো নই। আমার সঙ্গে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের কথাও তো ভাবতে হয়। তাঁদের কাছে আমি কথার খেলাপ করতে পারব না। আবার বলছি, অত্যন্ত দুঃখিত, ভাই দস্তিদার। বকশিকাকা আসুন—তাঁকে আমি সব বুঝিয়ে বলব।'

আর কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে বারীন একটু রূঢ়ভাবেই ফোনটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

তার মুহুরি তখন প্রায়ের টেবিলে তার দেখবার ফাইলগুলো রেখে গেছে। মাখন ফিরে এসে তার চায়ের ট্রে-টা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

মাখনকে ডেকে থামিয়ে বারীন বলে, 'শোনো, মাখন, বকশিকাকু আসছেন দেখা করতে। তাঁকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে আজ আমি দেখা করব না। মনে থাকে যেন। বাইরের বোর্ডে ইনটা বদলে আউট করে দিয়েছ তো?'

'আজ্ঞে, তা দিয়েছি।' মাখন বেশ যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' বারীন কিছুটা ধমকের সুরেই মাখনকে থামিয়ে দেয়। 'বোর্ডে নামটা আউট করে দিতে বলছি তাতে কিন্তু আবার কীসের?'

একটু থেমে মাখনের দিকে চেয়ে বারীন তার ধমকের ধরনটা পালটে একটু কৌতুকের হাসির সঙ্গেই বলে, 'ওঃ, বুঝেছি! দরাজ হয়ে পেয়ারের কাউকে ভরসা দেওয়া হয়েছে বুঝি? মিনি-মাগনায় নির্ঘাত মামলা জিতিয়ে দেবার ভরসা, কেমন? তা ভরসাটা কাকে দেওয়া হয়েছে? শ্বশুরবাড়ির মধুর সম্পর্কের কাউকে নিশ্চয়?'

'আজ্ঞে না, না, তা নয়,' একটু ফাঁক পেয়ে মাখন প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বারীন তাকে কথাটা শেষ করবার সুযোগ দেয় না। হালকা সুরে হলেও বেশ একটু জোর দিয়েই বলে, 'তা তো নয়ই, অন্য কোনও কিছুও নয়। কালই পাহাড়ে রওনা হচ্ছি সে খেয়াল আছে? আজ সারাদিন তারই জন্যে যা যা দরকার, সব সারতে হবে। তোমার পেয়ারের মক্কেলকে সুতরাং বলে দেবে যে বরফের ফাঁটলে না তলিয়ে, কোনও পাহাড় চূড়ো থেকে না

গড়িয়ে, হাত-পা মাথা আস্ত নিয়ে একমাস বাদে যদি ফিরতে পারি তা হলে মহাজনি থেকে রাহাজানি কি মানহানি থেকে প্রাণহানি যে মামলাই তার হোক মিনি-মাগনাই তার হয়ে কোমর বেঁধে লড়ে যাব। আপাতত বকশিকাকা ছাড়া কেউ যেন—'

এবার মরিয়া হয়েই মাখন মনিবকে বাধা দেয়—'আজ্ঞে, একজন এরই মধ্যে বাইরের ঘরে এসে—'

মাখনও কথাটা শেষ করতে পারে না। বিরক্তির সঙ্গে বিস্ময়ে রীতিমতো তীক্ষ্ণ তিক্ত গলায় বারীন তাকে বকুনি দেয়।

'কী, এরই মধ্যে এসে গেছে? বোর্ডে আউট থাকা সত্ত্বেও?' বারীনের গলাটা তার রাগের মতো ধাপে ধাপে চড়ে —'কেন? কেন তাকে ঢুকতে দিয়েছ? কী করে সে ঢুকল? কে? কে সে?'

'সে অযাচিত উপদ্রবটি হলাম আমি।'

পেছন দিকের দরজার কাছ থেকে এই উক্তিটুকু শুনে বারীন চমকে ফিরে তাকিয়ে প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারে না কয়েক সেকেন্ড।

ব্যাপারটা তার অধিকারের সীমার বাইরে বুঝে মাখন নিঃশব্দে সামনের অন্য একটি দরজা দিয়ে সরে পড়ে।

বারীন ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে। উত্তেজিত ভঙ্গিটা বদলে প্রায় সহজ স্বাভাবিকভাবেই সে বলে, 'ও! হারীন, তুমি!'

কথাটা মৃদু স্বরে সাধারণ সম্ভাষণের ধরনে বলা হলেও তার মধ্যে ঠিক স্বাগত অভ্যর্থনার সুরটা পাওয়া যায় না।

তা না গেলেও হারীন নামে নবাগতের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই দেখা যায়।

দরজা থেকে ঘরের ভেতর এগিয়ে আসতে আসতে নাটকীয়ভাবে সে বলে যায়, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, নামটা হারীন, আর পরিচয়টা হল প্রিয়াধন্য উদীয়মান—না, না, উদীয়মান আর নয়—সারা আকাশ একেবারে ঝলসে দিয়ে উদিত বিখ্যাত অ্যাডভোকেট—বারীন রক্ষিতের সহোদর এক কুলাঙ্গার ভ্রাতা—'

হঠাৎ এক মুহূর্তে কেন লজ্জিত হয়ে উঠে কৃত্রিম নাটকীয় সুরটা একেবারে বর্জন করে হারীন অপরাধীর মতো কাতর আত্মধিক্কারের স্বরে বলে, 'না, না। এ সব ছেলেমানুষির সময় এ নয়। শোনো বারীন—'

ওই পর্যন্ত বলেই বারীনের মুখের দিকে চেয়ে হারীনকে কিন্তু থামতে হয়। তারপর আহত স্বরে সে বলে, 'তুমি—তুমি আমায় দেখে খুশি হওনি বুঝতে পারছি—'

'খুশি অখুশির কথা নয়, হারীন'—বারীনের কণ্ঠ একটু কঠিন হলেও রূঢ় নয়। মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি নিয়ে সে বলে, 'তোমার কথা শোনার আগে তোমারই একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব কি না তাই ভাবছি। আর বছরে এখান থেকে বিদায় নিয়ে যাবার আগে শেষ কী বলে গিয়েছিলে মনে আছে কি?'

'আছে! আছে!' হারীন বেশ একটু কাতর অস্থিরভাবেই বলে ওঠে, 'আর জীবনে তোমায় বিরক্ত করব না এই বলেছিলাম তো—হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু বলেও কথা রাখতে পারিনি। নির্লজ্জ বেহায়ার মতো আবার এসেছি। হায় কপাল!'

কথার মাত্রা হিসেবে খেদোক্তিটা করে হারীন কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ করে যায়। তারপর তিক্ত আত্মধিক্কারের সুরে বলতে শুরু করে, 'তাই যদি না আসব—আমার কথার যদি ঠিকই থাকবে তা হলে তোমার মতো একটা মানুষের ভাই হয়ে এমন অমানুষ হব কেন! এক বংশ এক বাপ এক মা আর ওই তো সামনে আয়না মিলিয়ে দ্যাখো—এক চেহারা!'

দুই ভাইয়ের এ সাক্ষাৎকারে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে এই বিশেষ ব্যাপারটা তারও

অগোচর এতক্ষণ থাকত না নিশ্চয়। প্রসাধনে পোশাকে আপাত পার্থক্য থাকলেও চেহারা যে দুজনের একেবারে এক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিছু না জেনেও রেলের ইয়ার্ডে ও স্টেশনে হাঘরে চেহারার পলাতক হারীনকে দেখবার পর তার নিজের বাড়িতে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোশাক ও পরিবেশে বারীনকে দেখবার পর প্রথম অস্ফুট বিস্ময় সেই জন্যই জাগবার কথা।

'না, হারীন,' আপাতত বারীন কিন্তু একটু বিবস হাসির সঙ্গে হারীনের কথার প্রতিবাদই করে, 'চেহারা এক নয়।'

'আহা,' হারীন নিজের কথাটা একটু সংশোধন করে, 'আমার এই পোশাকআশাক একটু বদলে দাড়ি গোঁফ কামালেই তো—'

'না, তাতেও এক হয় না, হারীন,' মুখে সেই শুকনো হাসি নিয়েই হারীনকে থামিয়ে দেয় বারীন। তারপর মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে ডান কপালের ওপরে ঢাকা দেওয়া চুলগুলো একটু সরিয়ে দিয়ে বলে, 'চুল দিয়ে আমি যা ঢেকে রাখি আমার কপালের সেই দাগটা অমিল তাতেও হবে না। এটা তুমিই নিজের হাতে দেগে দিয়েছিলে।'

'হায় কপাল!' ভেতরে যাই হোক, বাইরে নিজেই যেন অবাক হয়ে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে হারীন, 'কবে কোন ছেলেবেলায় কী হয়েছিল সেই কথা তুমি এখন আবার তুলছ। ওসব তো কবে ধুয়ে মুছে গেছে।'

'তা কিন্তু যায়নি, হারীন!' বারীন একটু বিষণ্ণ স্বরেই বলে, 'সেদিনকার ঘা-টা হয়তো আর দগদগে নেই, কিন্তু চুল দিয়ে ঢেকে রাখলেও কপালের দাগটার মতো মনের দাগটাও এখনও মিলিয়ে যায়নি।'

একটু থেমে অতীতের স্মৃতিতে যেন নতুন করে যন্ত্রণা পেয়ে আবার বলে, 'তুমি আমার ঘুমের মধ্যে এই ঘা টা দিয়েছিলে সেইটেই ভুলে যাওয়া শক্ত। আর দিয়েছিলে কী জন্যে?'

'আচ্ছা, ওসব কথা নতুন করে কেন আর শোনাচ্ছ?' হারীন প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'সেদিন হঠাৎ রাগের মাথায় যা করে ফেলেছি—'

'না, হারীন!' মাথা নেড়ে বেশ জোর দিয়েই বলে বারীন, 'হঠাৎ রাগের মাথায় কেউ রাত্রে ঘুমোবার সময় লুকিয়ে এসে অমন করে হকি স্টিক দিয়ে মারে না। সারাদিন ধরে তুমি এই মারবার প্ল্যানটা করেছিলে, আর করেছিলে শুধু—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কথাগুলো অসহ্য হয়ে ওঠে বলেই হারীন যেন তা চাপা দেবার জন্য বলে, 'পরীক্ষার সময় পাশে বসেও টুকতে দাওনি বলে হঠাৎ মানে অমন খেপে গিয়ে ছিলাম। কিন্তু এ কথা তো হাজার বার স্বীকার করেছি। আর ওকথা তুলে যন্ত্রণা দিয়ো না। আমি যে কী পাষণ্ড ছিলাম তা কি আমি নিজে জানি না। সেদিনকার সেই সব কালো দিনগুলো ভুলে তাই মানুষের মতো মানুষ হয়ে দাঁড়াবার একটু চেষ্টা করছি।'

বারীন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর যা বলে তাতে মার্জনা আর সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্বরেরই আভাস পাওয়া যায়।

'মানুষের মতো মানুষই তো হয়েছ বলে মনে হয়।'—বারীনের গলায় কোনও তিক্ততা আর নেই—'চৌগড় না কোথাকার কোন মজদুর ইউনিয়নের তুমিই তো এখন মাথা! আরবারে তাই বলেছিলে না?'

'মিথ্যে কিছু তোমায় বলিনি,' হারীন ধীরে ধীরে বলে, 'কিন্তু আজ তোমার কাছে কেন ছুটে এসেছি, জানো। সেই মাথার ওপরই দুশমনদের কোপ বাঁচাতে।'

'মাথা বাঁচাতে আমার কাছে এসেছ!' বারীন অবাক হয়ে বলে, 'আশ্চর্য! তোমার চৌগড়ের মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে আমার তো কোনও সম্বন্ধ নেই। তোমার মাথায় সেখানে হঠাৎ কোপ পড়ছে কেন তা-ই আমি বুঝতে পারছি না। আর পড়লে আমি তা ঠেকাব কী করে?'

'ঠেকাবে শুধু আমায় একটু সাহায্য করে।' বলে হারীন।

'সাহায্য!'—বারীন কিন্তু আপনা থেকেই একটু সতর্ক না হয়ে উঠে পারে না—'তোমার মজদুর ইউনিয়নের ব্যাপারে কী সাহায্য আমি করতে পারি। আমি তো চৌগড়ের নামটাই তোমার মুখে শুনেছি, চোখেও কখনও দেখিনি।'

'শোনো বারীন,' হারীন ব্যাকুলভাবে বলে, 'সাহায্য বলতে টাকাপয়সা তোমার কাছে চাইছি না। চাইছি শুধু একটু—যেমন করে হোক, যেখানে হোক, আমায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসের সুযোগ তোমায় করে দিতে হবে।'

কেন এ অজ্ঞাতবাস হারীন তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে এবার। চৌগড়ের মজদুর ইউনিয়নের সে নেতা। গতবারের ইলেকশনে সে ও তাদের দল জয়ী হয়েছে। মালিক পক্ষের দালাল আর গুন্ডা বদমায়েশদের নিয়ে গড়া বিপক্ষ দল তাই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার ওপর। এবারে নতুন নির্বাচনের আর দেরি নেই। এক মাস বাদেই তার দিন স্থির হয়েছে। এই ইলেকশনে যেমন করে হোক জেতার জন্য এই দুশমনের দল কিছুতে পেছপাও নয়। নেতা হিসেবে তাকেই এই এক মাসের মধ্যে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র তারা করেছে। দরকার হলে একেবারে খতম করে দিতেও তাদের আপত্তি নেই। ইলেকশনের তারিখটা পর্যন্ত হারীনকে তাই সম্পূর্ণ গা ঢাকা দিয়ে না থাকলে নয়।

এ বিবরণ শুনেও বারীন দু একটা প্রশ্ন না করে পারেনি। চৌগড়ে বিপক্ষ দল এমন যা খুশি করে কী করে? সেটা কি মগের মুল্লুক সেখানে কি থানাপুলিশ নেই? আর হারীনের দলের লোকেরাই বা কী করছে?

হারীন তাতে যা জবাব দিয়েছে সেটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। দলের লোক আর থানাপুলিশ যতই থাক, ভাড়াটে গুন্ডার ছোরা মার কি তাতে ঠেকানো যায়? আর এ কাজ যারা করবে তারা ধরা পড়ে আইনের বিচারে উচিত শাস্তি তো শেষ পর্যন্ত পাবে, কিন্তু তার আগে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া ইউনিয়নই যে ধ্বংস হয়ে। কোম্পানির দালালরাই রাজত্ব করবে সেখানে।

'তোমাদের ইউনিয়ন সিস্টেমের কী খবর রাখি না,' বলেছে বারীন, 'তাই ইলেকশনে জিতাতে এ রকম গুম খুনের ব্যবস্থা আজগুবি লাগছে। তবু সে যাই হোক, এইটুকু বুঝছি যে একমাস তোমার অজ্ঞাতবাস থাকা দরকার। সে বিষয়ে আমি তোমায় কী সাহায্য করতে পারি? বলতে পারতাম এক মাস তুমি এ বাড়িতেই লুকিয়ে থাকো। কিন্তু আমি নিজেই যে অন্তত মাসখানেকের জন্যে কলকাতায় থাকছি না।'

'কলকাতায় থাকছ না!' হারীন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কোনও মামলা-টামলায় বাইরে যাচ্ছ নাকি। কোথায়?'

'যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনও মামলার শমন পৌঁছয় না', বলে হেসে বারীন ঘরের চারিদিকেই রাখা উপকরণগুলো দেখিয়ে দেয়।

'ওগুলো—ওগুলো যেন পাহাড়ে ওঠবার সরঞ্জাম মনে হচ্ছে!' হারীন বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'এ বাতিক তোমার আবার কবে থেকে হবল?'

'কবে থেকে?'—অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারীন একটু আঘাত না দিয়ে পারে না—'তোমায় বাঁচাতে তোমার জাল-করা সই যখন নিজের বলে মেনে নিয়েছিলাম, সেই বছর।'

মুখের হাসিটা দিয়েই বারীন পুরনো স্মৃতির বিষটা কাটিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সম্পূর্ণ তা পারে না।

এ কথার পর হারীন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে গুম হয়ে বসে থাকে। তারপর যেন জোর করে নিজেকে যথাসম্ভব সহজ করে তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'বারীন, যাচ্ছ কোথায়? কোন পাহাড়ে?'

'ও রসে যখন বঞ্চিত, তখন নাম বললেও ঠিক বুঝবে না তো।' আলাপটা এবার বেশ স্বচ্ছন্দ

স্বাভাবিকতাতেই নামিয়ে আনতে পেরে বারীন খুশি হয়। 'আচ্ছা, নন্দাঘুন্টি নাম শুনেছ?'

'তা শুনেছি বই কী।' হারীন বলে, 'তখন কাগজে খুব হইচই হয়েছিল মনে পড়ছে।'

'সেইরকম ছোটখাটো একটা পাহাড়চুড়ো। আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও'—মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বারীন বেশ একটু উত্তেজিতই হয়ে ওঠে—'তুমি! তুমি তো একমাস অজ্ঞাতবাস চাইছ, তা হলে চলো না আমার সঙ্গে?'

'তোমার সঙ্গে পাহাড় চড়তে?' হারীন হতভম্ব হয়ে বারীনের দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ,' বারীন নিজের উৎসাহটা যমজ ভাইয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করে, 'সেই পাহাড় আর তুষারের রাজ্যে সত্যিকার অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারবে একমাস। সেখানকার খবর পশুপক্ষীও এখানে বয়ে নিয়ে আসবে না।'

'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না,' বলে এ প্রস্তাব অনেক যুক্তি দেখিয়েই সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় হারীন। প্রথমত, পাহাড়ে চড়ার কিছুই সে জানে না। দ্বিতীয়ত, অত দূরে অনিশ্চয়তার মধ্যে তার যাওয়া চলবে না, কারণ, অজ্ঞাতবাস যেমন তার দরকার, তেমনই ঠিক নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচনের জন্য উপস্থিত না থাকলেও তার চলবে না।

বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজে এ আলোচনা তখনকার মতো স্থগিত থাকে।

আওয়াজটা বকশিকাকুর গাড়ির। বারীনের পরামর্শেই হারীন তাই কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে যায়। হারীন সম্বন্ধে বকশিকাকুর একটা বদ্ধমূল অবিশ্বাস আর বিরাগ আছে। প্রীতির অভাবটা অবশ্য পারস্পরিক। হারীনও ছেলেবেলা থেকেই বকশিকাকুকে দেখতে পারে না।

বকশিকাকু এসে বারীনকে নতুন কেস নেবার জন্যে বেশি পীড়াপীড়ি করেন না। তবে যাবার আগে হারীনকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান করে যান।

হারীনকে তিনি নিজের গাড়ি থেকে নেমে এ বাড়িতে ঢোকবার সময় দেখেছেন ও অনেক দিনের ব্যবধান আর দাড়ি-গোঁফের আবরণ সত্ত্বেও চিনতে ভুল করেননি।

চেহারায় এক হলেও হারীন যে হৃদয়, মন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে বারীনের সম্পূর্ণ বিপরীত—এই কথাটাই বিশেষ করে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই অস্বাভাবিক পার্থক্যের বিষয়ে ছেলেবেলায় পরামর্শের জন্য ডাকা একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের কথাও তিনি শুনিয়ে গেছেন বারীনকে। সেই মনোবিজ্ঞানী বলে গেছলেন যে রসায়নের রাজ্যে যেমন মানুষের স্বভাবচরিত্র ব্যক্তিত্বের বেলাতেও তেমনই উপাদানের সামান্য একটু অদল বদলে একেবারে আকাশ পাতাল গরমিল কখনও কখনও দেখা যায়। বারীন ও হারীনের পার্থক্যের মূলে সেইরকম কিছু বিরল রহস্য আছে বলে তিনি মত দিয়ে যান।

বকশিকাকু চলে যাবার পর হারীন আবার ফিরে এলে বারীন এসব কথা অবশ্য শোনায়নি।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে হারীনের অজ্ঞাতবাসের সমস্যা নিয়েই তাদের আলোচনা চলেছে, আর শেষ পর্যন্ত পরের রাত্রের একটি দূর পাল্লার ট্রেনের একটি প্রথম শ্রেণির কুপেতে পর্বত অভিযানের সাজসরঞ্জাম সমেত তাদের একজনকে দেখা গেছে।

কে সে?

বেশ এক ভ্রূকুটি নিয়েই অসমাপ্ত বিবরণের শেষ ক'টা লাইন পড়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

আমার শেষ পাতাটা ওলটাবার সময়েই সে যে সিঁড়ি দিয়ে অফিসঘরে নিঃশব্দে উঠে এসে আমার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছে, তা লক্ষ করেছি। এখন মুখ তুলে চেয়ে তার ঠোঁট-টেপা হাসিটুকু দেখে একটু বেশি জ্বলে উঠলাম।

'এ আবার কী রকম রসিকতা! আমায় এ লেখাটা পড়তে দেওয়ার মানে?'

আমার গলার ঝাঁঝটা খুব অকারণ নয়। পরাশরই আগের দিন এই লেখাটা পড়তে দিয়ে গেছল।

আমায় কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে পরাশর পাশের চেয়ারটা টেনে বসবার পর আবার আমার অভিযোগটা তাকে শোনালাম—'লেখাটা সম্পূর্ণ হলেও কথা ছিল। এটা তো আরম্ভ হতে না হতেই থেমে গিয়েছে। তা হলে আমাকে এটা পড়তে দিয়েছ কেন?'

'ধরে'—শেষটা পূরণ করবার জন্যে।'

এ কথায় পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে ওঠে কি না! আগের মতোই ঝাঁঝালো গলাতে বললাম, 'শেষটা পূরণ করব আমি! আমি সম্পাদনা করি, গল্পলেখক নই। আর এ এমন কী আহামরি গল্প যে শেষটা পূরণ করতে হবে। পূরণ করবার আছেটা কী?'

'বাঃ! পূরণ করবার নেই?' পরাশর যেন অবাক হল! 'গল্প যে-প্রশ্নে এসে থেমে গিয়েছে, সেইটের উত্তরই তো বার করবার রয়েছে।'

'না, গল্প যেভাবে যেখানে এসে থেমেছে, তাতে উত্তর যা খুশি হলেই চলে।'

'যা খুশি হলেই চলে?' পরাশর যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, 'গল্পের ধারায় এমন কিছু সূত্র নেই যাতে উত্তরটা একেবারে নিশ্চিত করে নির্দেশ করা আছে?'

'না,' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'গল্পের ধারায় এ পর্যন্ত যেটুকু পাওয়া গেছে, ধুরন্ধর লোক হলে তা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে-কোনও উত্তরে পৌঁছে দিতে পারে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও দূর-পাল্লার ওই রাত্রের ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কুপেটিতে হারীন বা বারীন—কারও থাকাই অসম্ভব নয়।' পরাশর যেন ওকালতির ভঙ্গিতে বললে, 'কলমের প্যাঁচে দুটো সম্ভাবনার যে-কোনওটাই বিশ্বাসযোগ্য করা যায়?'

'তা নিশ্চয়ই যায়।' আমি এবার হেসে বললাম, 'তা না হলে ডিটেকটিভ গল্পের মজাটা কোথায়? পাঠককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে আপাত অসম্ভব সমাধানটাই শেষ পর্যন্ত সাজানো যুক্তির প্যাঁচে তাকে মানতে বাধ্য করা হয়ে কি। সুতরাং গোয়েন্দা গল্পে নিশ্চিত উত্তর বলে কিছু ধরা যায় না, বিশেষ করে সামান্য এইটুকু পড়বার পর। গল্পের আরও একটু না জানলে উত্তর ভাববার কোনও একটা লাইনই পাওয়া যায় না।'

'বেশ! বিবরণটা তার একটু এগিয়েও নিয়ে যাওয়া যায়।' পরাশর আমার দাবি মেটালে—'সেদিন রাত্রে দূরের হিল স্টেশনে যাবার ট্রেনটির প্রথম শ্রেণির কুপেতে হারীন বা বারীন যে-ই থাক, গন্তব্য স্থানে যাওয়া তার হয়নি। তাকে মাঝরাস্তার, ওই চৌগড়ের কাছেই, একটি জায়গায় ট্রেন থেকে জোর করে নামিয়ে নেওয়া হয়। চৌগড়ে পৌঁছবার আগে সিগন্যালের টাওয়ারের পয়েন্টসম্যানকে ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে লাল আলোর নিশান তুলিয়ে ট্রেনটাকে থামানো হয়। আর এভাবে ট্রেন থামিয়ে কুপের যাত্রীকে যারা জোর করে নামিয়ে নিয়ে যায় তারা নাকি হারীনের নিজের দলের লোক। রহস্যজনকভাবে কুপের যাত্রীর খবর পেয়ে এ কাজটা হারীনের বিপক্ষ দলেরই করবার কথা। কিন্তু বাঘের ঘরে ঘোগের মতো সে পক্ষের এক বিভীষণ চরের মারফত ব্যাপারটা জেনে ফেলে হারীনের দলের লোকেরা আগেই ওকে ওইভাবে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মজার কথা এই যে, উদ্ধার করতে অমন করে যাকে ধরে নিয়ে গেছল, তাকে কিন্তু ওরা রাখতে পারেনি। সে ওদেরও ফাঁকি দিয়ে এক সময়ে তাদের আশ্রয় থেকেও পালিয়ে যায়। তারপর আর সে ধরা পড়েনি। সেই আগেকার প্রশ্নই তাই আবার আসছে। কে সে?'

'এখনও নিশ্চিত উত্তর বলে কিছু হতে পারে না।' মাথা নেড়ে আমি জানালাম, 'রহস্য গল্পের পাকা লেখক এসব মশলাকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারেন।'

'পারেন?' পরাশরের জিজ্ঞাসাটাই প্রতিবাদ।

'নিশ্চয়ই পারেন,' আমি জোর দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এই একটা অসম্পূর্ণ ছেঁড়া গল্প নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বুদ্ধি খাটিয়ে যদি রহস্য ভেদ হয় তা হলে ঢের ভাল লেখকের গল্প আছে।'

'তা নিশ্চয় আছে।' এবার পরাশর নিজেই একটু রহস্যময় হাসি হাসল। 'কিন্তু জীবনটাই যদি এ গল্পের লেখক হয়?'

'তার মানে?' সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

'মানে এটা যদি গল্প না হয়?'

'তার মানে সত্যি কোনও ঘটনার কথা তুমি বলছ?' আমি বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তা হলে অমন গল্পের মতো করে লেখা কেন?'

'সত্যটাকে একটু রেখে ঢেকে জানাবার জন্যে ওইভাবে গল্পটা লেখা হয়েছে।' পরাশর ব্যাখ্যা করলে, 'হারীন বারীন চৌগড় এসব নামগুলো কাল্পনিক। কিন্তু মূল ঘটনার বিবরণ প্রায় সব সঠিক।'

'প্রায় সঠিক বলছ?' আমি কথাটা পরাশরকে ধরিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ, প্রায় সঠিকই বলতে হবে।' পরাশর জানালে, 'কারণ বিবরণ সবই আমাদের অন্যের কাছ থেকে পাওয়া। যাচাই করে নেবার কোনও সুযোগ বা চেষ্টা এখনও হয়নি। তবে এ বিবরণে যা নেই এমন একটা বিশেষ ঘটনা এই নাটকীয় কাহিনীর সঙ্গে বোধহয় যুক্ত করা যেতে পারে।'

'ব্যাপারটা কী?'

'দূর পাঞ্জাব ট্রেন থেকে হারীন বা বারীনকে জোর করে নামানো আর তারপর তার নিজের দলের আশ্রয় থেকে পালাবার কিছুকাল বাদে খবরের কাগজে উত্তর-পশ্চিম হিমালয় রেঞ্জের একটি পাহাড়চূড়োর অভিযাত্রীদের একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনার সংবাদ ছাপা হয়। শেরপা ও আরোহী নিয়ে মাত্র পাঁচ ছজনের সে দলের একটিও প্রাণী রক্ষা পায়নি। চূড়ায় ওঠবার আগেই তাদের সব ক্যাম্প অপ্রত্যাশিত ঝড় আর তুষার ঢাকে কোথায় যে তলিয়ে যায় কেউ জানে না। তাদের কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি।'

'এ সংবাদটা তুমি আমাদের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত মনে করছ? এই দুর্ঘটনায় যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে বারীন বা হারীন রক্ষিত বলে কারও নাম পাওয়া গেছে কি?'

'নাম তো সেভাবে কারওই পাওয়া যায়নি।' পরাশর বললে, 'যে দলের সঙ্গে বারীনের পাহাড়চূড়া জয়ের অভিযানে যাবার কথা তাদের কেউ আর ঘরে ফেরেনি এইটুকু শুধু জানা যাচ্ছে। বারীন সে দলের সঙ্গে ছিল কি না তা ঠিক করে বলার কোনও উপায় নেই।'

'আচ্ছা,' এবারে একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যাপার নিয়ে জল্পনাকল্পনার আসল উদ্দেশ্য তোমার কী? সত্য ঘটনা হলেও এ নিয়ে মাথা ঘামাবার গরজ তোমার কেন? কেউ কি তোমায় এ রহস্য ভেদের ভার দিয়েছে?'

'এক হিসেবে তা দিয়েছে বারীন রক্ষিতের অ্যাটর্নি আর বকশিবাবু।'

'অ্যাটর্নি আর বকশিবাবু?' আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে—বারীন রক্ষিত নেই।'

'নেই কি না সঠিকভাবে জানি না, তবে সে আর ফেরেনি।'

'বারীন রক্ষিত সেই রাত্রের ট্রেনের কুপেতে থাক বা না থাক তার কলকাতার বাড়িতে সে আর ফেরেইনি। ওই চৌগড় থেকে পালাবার পর সে তা হলে তার পাহাড়ে চড়ার অভিযানেই গেছল।'

'তাও সঠিকভাবে জানি না।' পরাশর বিরস মুখে বললে, 'রহস্যটা কিন্তু শুধু ওই নিয়েই নয়। হারীন রক্ষিতের ব্যাপারটাও তার সঙ্গে জড়ানো।'

'কী হয়েছে হারীনের?'

'হারীনও নিরুদ্দেশ। বারীনের কলকাতার বাসায় তো নয়ই, চৌগড়েও সে ইলেকশনের দিন পার হয়ে গেলেও ফেরেনি।'

'দুজনেই এবা নিরুদ্দেশ?' বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা কেমন করে সম্ভব?'

'সেই উত্তরটাই এখন আমাদের খুঁজতে হবে,' বললে পরাশর।

'কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।'

'করো।'

'তোমাকে বারীন রক্ষিতের অ্যাটর্নি আর বকশিবাবু যাঁর নাম—এই দুজনে এ ব্যাপারে সন্ধান দেবার ভার দিয়েছেন বলছ। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কী করে? তাঁরা কি তোমাকে খুঁজে বার করে এ ভার দিয়েছেন?'

'না।' পরাশর একটু হাসল, 'আমি তো ঠিক পেশাদার গোয়েন্দা নই। আমার অফিস সাইনবোর্ড কিছু নেই যে দরকার হলে যে কেউ ঠিকানা জেনে চলে আসতে পারে। নেহাত জানাশোনা কারও মারফত না এলে আর নিজে থেকে আগ্রহ না করলে কোনও কাজ আমি নিই না তা তো জানো। আর আমি যোগাযোগ করার আগে এ ভারটা আমায় দেওয়ার কথা তাঁদের মাথাতেই আসেনি।'

'তার মানে?' সবিস্ময়ে পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে কাজটা তুমি যেন তাঁদের কাছে চেয়ে নিয়েছ?'

'একরকম তা-ই।' বললে পরাশর, 'আমিই নিজে থেকে গিয়ে প্রথমে বারীন রক্ষিতের অ্যাটর্নি আর তারপর বকশিকাকুর সঙ্গে দেখা করি। আমার সঙ্গে আলোচনার পর ওঁরা দু জনে আমাকে এ বিষয়ে খোঁজ করবার অধিকার ও অনুমতি দেন।'

'কিন্তু তুমি ওঁদের সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগ করতে গেলে কেন? এ তাগিদটা তোমার হল কী থেকে? বারীন বা হারীন রক্ষিতকে তুমি জানতে?'

'একেবারেই না।' পরাশর মাথা নাড়ল।

'তা হলে? যে গল্পটার সূত্র আমায় পড়ালে সেইটে কারও কাছ থেকে পেয়েছ?'

'তা ও না।' পরাশর এবার জানালে, 'ও গল্প আমিই একজনকে দিয়ে লিখিয়েছি এ কাজের ভার নেবার পরে।'

'তুমিই লিখিয়েছ? কী করে? বারীন হারীন কাউকেই তো তুমি জানতে না।'

'জানতাম না ঠিকই। কিন্তু ওঁদের বিষয়ে খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমে যেখানে যেটুকু জানতে পারি তা-ই সাজিয়ে গুছিয়ে আমার কবি বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়েছি, তোমার ওপর দিয়ে এ গল্পের প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যে।'

কবিবন্ধুকে দিয়ে গল্প লেখানো নিয়েই খোঁচা দেবার একটা ভাল সুযোগ ছিল। কিন্তু আমার ওপর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার কথাতেই তখন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে।

গলার স্বরে ক্ষোভটা না লুকিয়েই বললাম, 'আমি তা হলে তোমার এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ! বেশ তা-ই না হয় হলাম, কিন্তু তোমার এ ব্যাপারে জড়িত হওয়ার প্রথম তাগিদটা কোথা থেকে পেলে তা এখনও জানতে পারিনি।

'প্রথম তাগিদ পেলাম এই চিঠিটা থেকে।'

পরাশর একটা ভাঁজ-করা চিঠি খুলে আমার টেবিলের ওপর রাখল।

চিঠি যাতে লেখা হয়েছে সে কাগজের মাথায় খবরের কাগজের একটা ছোট কাটিং পিন দিয়ে আঁটা।

চিঠি পড়ার আগে সেই কাটিংটার দিকেই দৃষ্টি গেল। হাতে করে তুলে নিয়ে পড়ে দেখলাম।

সংক্ষিপ্ত খবর। এক কলমের কয়েকটি লাইনেই শেষ। সেই সঙ্গে একটা ছোট ছবিও আছে। শিরোনামাটা অবশ্য চোখটা ধরে রাখার মতো—অতি শোচনীয় একটা দুর্ঘটনা নিয়ে কবিত্ব করবার চেষ্টাটা বিসদৃশ লাগলেও খবরটা পড়তে হয়। 'তুষার দেবতার বলি' বলে শিরোনামা দিয়ে তার পরে যে খবরটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা যা নিয়ে একটু আগে আলোচনা করেছি পাহাড় চূড়ায় উঠতে গিয়ে সেই দুর্ঘটনারই বিবরণ। তাতে বিস্তারিতভাবে কিছু না জানলেও

কলকাতারই একটি দল কোনও সময়ে এই অভিযানে রওনা হয় এবং নিহত অভিযাত্রীদের মধ্যে কারা কারা ছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে তা মুদ্রিত আছে। মুদ্রিত নামগুলির চেয়ে নাতিস্পষ্টভাবে ছাপা একটি মুখের ছবিই সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান। ছবিটির নীচে যে নাম দেওয়া আছে এ কাহিনীতে বারীন রক্ষিতই তার বদলে ব্যবহৃত।

ছবিটা ও তার নীচের ছাপানো নামটুকুর চারিধারে লাল কালির দাগ টানা। চিঠিটিও সেই কালিতে লেখা। সংবাদপত্রের খবরটির মতো চিঠিটিও দীর্ঘ নয়।

শ্রীপরাশর বর্মা সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন

আপনার ঠিকানা জানি না। তাই এই সংবাদপত্রের অফিস মারফত এ চিঠি পাঠাইলাম। জানি না পাইবেন কি না। পাইলে খবরটি ভাল করিয়া একটু যাচাই করিয়া দেখিবেন কি? কাগজে যাঁহার ছবি ছাপা হইয়াছে তিনি অন্য নামে অন্যত্র পরিচিত। সংবাদপত্রে বর্ণিত দুর্ঘটনার কিছু পূর্ব থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ। ইতি—

বিনীতা দীপিকা

চিঠিটা পড়ে ফেলার পর এপিঠ-ওপিঠ বেশ ভাল করে খুঁজে দেখে বললাম, 'আশ্চর্য! চিঠিতে নামটুকু ছাড়া কোথাও কোনও ঠিকানাই তো দেওয়া নেই? খামের চিঠি যে খামে এসেছে তাতে কোথাও ঠিকানা দেওয়া ছিল?'

'না,' বলে একটু হাসল পরাশর, 'মেয়েটি নামটাও ঠিক দিয়েছে কি না জানি না। দিক না দিক তাতে কিছু আসে যায় না। তার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য—এ ব্যাপারে রহস্য কিছু থাকলে আমাকে শুধু তার খেই ধরিয়ে দেওয়া। তারপরে ফলাফল জানবারও যেন তার কোনও আগ্রহ নেই।'

'চিঠিটা তুমি কিন্তু অবহেলা করতে পারোনি। এ চিঠি পড়েই এ ব্যাপারে তোমার কৌতূহল হয়।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলে করলে পরাশর, 'এরপর আমি তুষার-পাহাড়ের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি। কাগজে যার ছবি ছাপা হয়েছে তার নাম-ধাম-পরিচয় বার করতে খুব অসুবিধে হয় না। এবং বারীন রক্ষিতের ঠিকানা পরিচয় জেনে খোঁজ নিতে ওই বকশিবাবুর কাছে যাবার পরই দীপিকা দেবীর চিঠির একটা রহস্য অন্তত পরিষ্কার হয়ে যায়। বারীনের যমজ ভাই চৌগড়ের মজদুর ইউনিয়নের হারীনের কথা তার কাছেই প্রথম জানতে পারি। হারীন যে সেই সময়ে কলকাতায় ভাইয়ের কাছে এসেছিল সেই কথাও।

হারীন সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু জানবার জন্য তারপর নিজেই চৌগড়ে গেছলাম। চৌগড়ের নাম প্রথমে বকশিবাবুর কাছেই শুনি। তার আগে দীপিকা দেবীর চিঠির খামে ডাকঘরের ছাপ কালির ধাবড়ায় নিতান্ত অস্পষ্ট না হলে তা থেকেও হয়তো বার করতে পারতাম।

চৌগড়ে গিয়ে দীপিকা দেবী বলে কারও সন্ধান কিন্তু পাইনি। হারীন রক্ষিত সম্বন্ধে খবর যা পেয়েছি তা রীতিমতো গোলমেলে। গত ইলেকশনে যারা জিতেছে সে তাদের একজন মাথা হলেও অনেকের দু চক্ষের বিষ। সে যে চৌগড় ছেড়ে হঠাৎ একদিন পালিয়েছিল সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু দিনের জন্যে গা-ঢাকা দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল জানলেও অ্যাডভোকেট ভাই বারীনের সঙ্গে পরামর্শ করে আত্মগোপনের ঠিক কী ব্যবস্থা সে করেছিল তা এখনও জানতে পারিনি।

সবচেয়ে যা অদ্ভুত তা এই যে, তুষার-পাহাড়ে একজন দুর্ঘটনায় মারা গেলেও আর-একজনও সেই সঙ্গে নিরুদ্দেশ? দুজনেই একসঙ্গে এ অভিযানে গেছল বলে তো মনে হয় না। তা যদি না গিয়ে থাকে তা হলে একজনের আমরা নিশ্চিত দেখা পেতাম।

পাহাড়ের দুর্ঘটনায় মারা না গিয়ে থাকলে হারীন রক্ষিত এক মাস অজ্ঞাতবাসের পর ইলেকশনের দিন চৌগড় থেকে কিছুতেই অনুপস্থিত থাকত না। আর বেঁচে থাকলে বারীন রক্ষিতের ফিরে না আসার কোনও মানেই হয় না।

নেহাত একটা আজগুবি সম্ভাবনার কথা ভাবা যায় অবশ্য। ভাবা যায় যে দুজনেই একই সময় মারা গেছে। একজন গেছে পাহাড়ের তুষার-ধস নেমে আর দ্বিতীয় জন ঠিক এই সময়েই অন্য কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে কোনও হাসপাতালে অসনাক্ত লাশ হয়ে আছে।

এ সমস্যার এরকম একটা মীমাংসা আমার মন কিন্তু মানতে চায় না। জীবন সব সময়ে নাটক হবে এমন কোনও কথা নেই, কিন্তু তাই বলে একেবারে এত কাঁচা হাতের বুনুন তা-ও নয়।'

'আচ্ছা ঠিক এরকম না হোক, অন্য আর-এক কিছুটা আজগুবি সম্ভাবনার কথাও তো ভাবা যায়?' আমি একটু দ্বিধাভরেই জানালাম, 'তাতে অবশ্য নেহাত সাধারণ সস্তা কল্পনারই পরিচয়।'

'বলে ফেলো,' পরাশর সাহস দিলে।

'ধরো, এমনও তো হতে পারে যে দুজনকেই নিজের পথ সরিয়ে ফেলার মতো কেউ আছে। এ কাজ তার।'

'দুটো জিনিস তা হলে দরকার হয়,' পরাশর আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে যেন বিচার করে বললে, 'একটা হচ্ছে এদের দুজনকেই সরিয়ে ফেলে লাভ করবার মতো কোনও স্বার্থ আর তার জন্যে অমন নির্মম হবার মতো কোনও মানুষ। যত আজগুবিই হোক সেই খোঁজই আপাতত করা যাক।'

পরাশর আমায় নিয়ে আসাই তারপর বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি নেবার সময় পর্যন্ত তাকে ইচ্ছে করেই কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। করলেও উত্তর পেতাম কি না সন্দেহ।

ট্যাক্সিতে ওঠবার পর ড্রাইভারকে আলিপুরে যাবার নির্দেশ দেওয়ায় প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি আলিপুরে কোথায় যাচ্ছ? তোমার বারীন রক্ষিতের বাড়ি বালিগঞ্জে না?'

'বারীন রক্ষিতের বাড়ি যাচ্ছি না, যাচ্ছি বারীন-হারীনের বকশিকাকু মানে শ্রীঅধরচন্দ্র বকশির বাড়ি নিউ আলিপুরে।'

হারীন ও বারীন রক্ষিতের পিতৃবন্ধু তাদের বকশিকাকুর পেশা কী ছিল তা জানি না, কিন্তু জীবনে তিনি যে আর কিছু না হোক, আর্থিক সাফল্যের উচ্চ চূড়ায় উঠেছেন তা তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িটি দেখলেই বোঝা যায়।

তাঁর নিজের চেহারা চরিত্রের মতো বাড়িটির স্থাপত্যেও একটা সম্ভ্রান্ত কাঠিন্যের ছাপ আছে।

নীচের দুটি তলা ফ্ল্যাট হিসেবে ভাড়া দিয়ে বকশিবাবু নিজে তেতলায় একলা থাকেন। সে তেতলায় যাবার জন্য একটি আলাদা সিঁড়ি তিনি করিয়ে রেখেছেন এইটেই তাঁর বিশেষত্ব।

পরাশর আমায় নিয়ে অপেক্ষাকৃত খাড়াই সে সিঁড়ি ভেঙে ওঠবার সময়ই একটা মন্তব্য না করে পারিনি। বলেছি, 'বকশিবাবু বুড়ো মানুষ বুঝতে পারছি, তবু এরকম একটা হাঁফধরা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা করেন।'

ওপরে গিয়ে বকশিবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর বুঝলাম, বকশিবাবুর বার্ধক্য তাঁর চুলে একটু

চুনকামের বেশি শরীরের আর বিশেষ কোনও পরিবর্তন করতে পারেনি। চেহারায়, চলনেবলনে এখনও তিনি জোয়ান।

বকশিবাবু ঘরে এসে বসবার পর আমার একটু পরিচয় দিয়ে পরাশর সোজাসুজি আসল কথাটাই পাড়ল।

'আচ্ছা', পরাশর প্রথম কথাটা অবশ্য একটু ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা করলে, 'বারীন ও হারীন রক্ষিতের বাবা মা তো বেঁচে নেই। তারপর ভাই বোন বা অন্য নিকট আত্মীয় আর কে আছে?'

'তার মানে,' বকশিবাবু ঘোরপাঁচ ছেড়ে একেবারে স্পষ্ট ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বারীন হারীন দুজনেই মারা গেলে ওদের যা কিছু আছে তার ওয়ারিশন কে বা কারা হবে জানতে চাইছেন?' একটু থেমে মুখে একটু অদ্ভুত হাসি নিয়ে বকশিবাবু বললেন, 'যার হবার কথা এখুনি তার দেখা পাবেন। একটু অপেক্ষা করুন।'

আমার বিমূঢ়তা ও পরাশরের নীরব জিজ্ঞাসাটা ঠিক মতোই লক্ষ করে বকশিবাবু তাকেই আবার বললেন, 'আপনার মনে এ কথা কখন উঠেছে জানি না, কিন্তু খবরের কাগজের সংবাদটা পাবার পর সে আর দেরি করেনি। ট্রেনে করে আসতে যেটুকু সময় লাগে শুধু সেইটুকু নষ্ট করে কালই অ্যাটর্নি অফিসে প্রথম গিয়ে, তার পর আমার সঙ্গে দেখা করেছে।'

একটু থেমে বকশিবাবু মুখের বিদ্রূপের হাসিটা আরও তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'তিনি অবশ্য শোকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। এরকম শোচনীয় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাই ছুটে এসেছেন এ ব্যাপারে সবকিছু জানবার জন্যে। আজ আমার কাছে সেই জন্যেই আবার সকালে আসবার ব্যবস্থা করেছেন।'

বকশিবাবুর কথার মধ্যেই ঘরের মধ্যে রাখা ফোনটা বেজে উঠল।

বকশিবাবু গিয়ে ফোনটা ধরবার পর তাঁর এদিকের আলাপ-কথা থেকেই ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করতে পারলাম।

'হ্যাঁ, মি. বকশি বলছি,' ফোন ধরে বকশিবাবু সাড়া দিলেন। তারপর একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, 'আজ সকালে আসতে পারছেন না! আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ওদিকের কিছু একটা কথার উত্তরে তিনি এবার একটু অপ্রসন্ন ভাবেই বললেন, 'না, অত্যন্ত দুঃখিত। আমি বৃদ্ধ হলেও একেবারে বেকার নই। আগে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে আমার পক্ষে যখন তখন সময় দেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, বেশ, পরে ফোন করলে দেখব সময় দিতে পারি কি না।'

বকশিবাবু যেরকম জোরের সঙ্গে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল বৃদ্ধ কোনও কারণে বেশ একটু বিরক্ত হয়েছেন।

বৃদ্ধের কিন্তু আত্মসংযম আছে। আমাদের কাছে এসে আবার বসার মধ্যেই মুখ থেকে বিরক্তির ছায়াটা সরিয়ে ফেলে একটু হেসেই তিনি বললেন, 'না, মানসী দেবীর সঙ্গে দেখা হওয়া আপনাদের ভাগ্যে নেই। তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করলেন।'

দেখা না হওয়ার ব্যাপারে যতটা নামটা শুনে আমরা তখন তার চেয়ে বেশি কৌতূহলী।

'তাঁর নাম মানসী দেবী?' পরাশর তার সরব চিন্তাটাই যেন জিজ্ঞাসার ধরনে প্রকাশ করলে।

'হ্যাঁ, নাম তাঁর মানসী দেবী। এবং তিনি একজন মহিলা।' বকশিবাবু আগেকার বিদ্রূপের হাসিটির সঙ্গেই বললেন, 'তাঁকে দেখলে আপনারা অখুশি বোধ হয় হতেন না।'

'তিনি বারীন হারীন রক্ষিতের কী রকম আত্মীয়া হন?' পরাশর আসল প্রশ্নটাই এবার করল।

বকশিবাবুর ভেতর যে কৌতুকরসের অভাব নেই তার এবারের উত্তরে সেটা বোঝা গেল। কৌতুকরসটা অবশ্য ঘৃণা অবজ্ঞায় বেশ একটু তিক্ত।

'কী রকম আত্মীয়া?' বকশিবাবু উপহাসের সম্মান-সম্বোধন ছেড়ে বললেন, 'আমায় যা বলেছে তাতে তেরাত্রের অশৌচের মধ্যে না পড়লেও সইয়ের বোনের বকুল ফুলের মতো কেউ

নয়। অর্থাৎ বেঁচে থাকলে হারীন বারীনের কারও সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও হতে পারত, আবার মারা গেলে ওয়ারিশন হবার অধিকারও বর্তায়।'

'কিন্তু,' পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তো বারীন হারীনদের পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাদের বাবার আমলের বন্ধু। আপনি মানসী দেবীকে চিনতে পারলেন না।'

'না, পারলাম না,' এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন বকশিবাবু, 'মানসী দেবী তার পিতৃপরিচয় যা দিয়েছে তা আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়। হারীনের বাবা শশধর রক্ষিতের মায়ের মামাতো ভাইয়ের দিবাকর রায় নামে এক ছেলে ছিল। তাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল বলে দিবাকরকে শশধরের বাড়িতে থেকেই কলেজের পড়াশুনা করবার সুযোগ দেওয়া হয়। দিবাকরকে তখন আমি জানতাম। পড়াশুনার পর একটা চাকরি পেয়ে দিবাকর সেই যে কেরালা না মহীশূর কোথায় চলে যায় তারপর থেকে এ বাড়ির সঙ্গে তার আর কোনও সম্বন্ধ ছিল বলে জানি না। মানসী সেই দিবাকরের একমাত্র মেয়ে বলে দাবি করছে। তার বাবা দিবাকর নাকি কিছুকাল আগে তাদের বর্তমান ঠিকানা দেরাদুনেই মারা গেছে। দূরে থাকলেও বারীন হারীনদের, বিশেষ করে বারীনের খোঁজখবর নাকি তারা বরাবর রেখে আসছে।'

'মানসী দেবী যা বলেছেন,' পরাশর বেশ একটু চিন্তিতভাবে বললে, 'তা মিথ্যে তো না হতেও পারে।'

'তা নিশ্চয় পারে,' বকশিবাবু তিক্ত গলাতেই বললেন।

'তা হলে উত্তরাধিকারের দাবিটাও একেবারে ভুয়ো হয় না।'

'না, তা হয় না,' স্বীকার করলেন বকশিবাবু।

'কিন্তু আজকের সকালের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কনসেল করার পর আপনি যেভাবে মানসী দেবীকে হটিয়ে দিলেন তাতে উনি আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করবেন কি না তাই ভাবছি।'

'ভাববার কিছু নেই,' বকশিবাবু তিক্ত স্বরে বললেন, 'নিজের গরজেই ও ঠিক আসবে। কিন্তু আপনার অধৈর্যটা একটু বেশি মনে হচ্ছে। তা যদি হয় তা হলে বারীনের অ্যাটর্নির অফিসেই একবার যান। ওরা হয়তো মানসীর এখানকার ঠিকানা জানতে পারে। আমায় কিছু সে জানায়নি। আমিও চেষ্টা করিনি জানবার।'

বকশিবাবুর কাছ থেকে অ্যাটর্নি অফিসেই যেতে হল তারপর।

বড় নয়, ছোটখাটো অফিস কিন্তু নড়বড়ে সেকেলে বাড়ির চারতলায় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যাওয়ার মজুরি পোষাল না।

কোনও খবরই সেখান থেকে পাওয়া গেল না। একজন ক্লার্কের কাছে শুধু জানা গেল যে একজন মিলিটারি চেহারার পুরুষ ও একজন যুবতী মহিলা সেখানে বারীন রক্ষিতের বিষয়ে খোঁজ নিতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঠিক পরিচয় না জানায় অ্যাটর্নি অফিসের কেউ তাঁদের জন্য মূল্যবান সময় নষ্ট করেননি।

না, কোনও ঠিকানা বা ফোন নম্বর তাঁরা দিয়ে যাননি।

কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পায়ের ঘর্ষণে ক্ষয়ে যাওয়া সেই প্রাক কোম্পানির আমলের নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মানসী দেবীকে কি সাজানো কেউ বলে মনে হচ্ছে? বকশিবাবুর ধারণাটা যেন তাই।'

'হ্যাঁ,' পরাশর একটু হেঁয়ালিভরে বললে, 'মহিলাটি মনে হচ্ছে রূপসি ও যুবতী। বকশিবাবুর মন তাইতেই বিরূপ হয়েছে।'

'শুধু কি তার জন্যে?' হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বয়স হয়েছে বলে রূপে যৌবনে অ্যালার্জি হবেই এমন কোনও কথা আছে কি?'

'না, তা নেই।' পরাশর আমার কথাটা মেনে নিলে —'কিন্তু মেয়েটির একবার দেখা পেলে ভাল হত। অন্তত এখানকার ঠিকানাটাও যদি পেতাম।'

'তার তো কোনও আশাই নেই। আটর্নি অফিসে এসে কোনও লাভই হল না।'

'না, একটা লাভ হয়েছে বই কী।'

'কী লাভ?' ঠাট্টা ভেবে পরাশরের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকালাম।

'একটা খবর অন্তত জানা গেছে,' পরাশর বললে, 'মানসী দেবী এখানে একা আসেননি, সঙ্গে মিলিটারি চেহারার একজন কেউ ছিল।'

'এইরকম সঙ্গী থাকার ওপর তুমি কি কিছু গুরুত্ব দিতে চাইছ?'

'না, তা এখনও দিতে চাই না,' পরাশর বললে, 'তবে বকশিবাবু এরকম কোনও এসকর্টের কথা বলেননি। সুতরাং তাঁর কাছে মানসী দেবী একলাই গিয়েছিলেন মনে হচ্ছে।'

মানসী দেবীর সঙ্গে দেখা না হলেও তরুণী ও মোটামুটি সুশ্রী একটি মেয়ের সঙ্গে সেইদিনই অমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হবে কে জানত।

বারীন রক্ষিতের অ্যাটর্নির অফিস থেকে বেরিয়ে আমি ও পরাশর যে যার বাসায় চলে এসেছিলাম।

কাজকর্ম সেরে সবে একটু বিশ্রামের আয়োজন করেছি এমন সময়ে পরাশরের জরুরি ফোন।

'এখুনি একবার হাওড়া স্টেশনে এসো। ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। আমিও এখুনি যাচ্ছি।'

হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে কেন এ প্রশ্ন করবার অবকাশ পরাশর দিলে না। নির্দেশটা দিয়েই যথারীতি ফোনটা নামিয়ে রাখলে।

ইচ্ছে করলে তার নম্বরটায় ডায়াল করে এমন অদ্ভুত আচমকা হুকুমের মানেটা দাবি করতে পারতাম। কিন্তু ফোনের যা হাল। লাইন পেলেই আর পেলেও কতক্ষণে পাব তার ঠিক নেই।

সুতরাং মনে মনে একটু গজরালেও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে হাওড়া স্টেশনেই রওনা হতে হল।

ভাগ্যটা একদিকে ভাল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মৌলালির মোড়েই একটা ট্যাকসি পেয়ে গেলাম এবং রাস্তায় কোনও ট্র্যাফিক জ্যামে না পড়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পৌঁছলাম স্টেশনে।

সাধারণত পরাশরের সঙ্গে এ ধরনের কথা রাখতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাগ ও বিক্ষোভের যে কারণ ঘটে এবারে তাও ঘটল না।

পরাশর সত্যিই আমার আগেই পৌঁছে ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু তার গলায় অমন একটা বেগুনি রঙের মাফলার জড়ানো কেন? এই গরমের দিনে কেউ গলায় মাফলার জড়ায়? তাও অমন একটা হতকুচ্ছিত রঙের?

তা ছাড়া এত তাড়াহুড়ো করে এই অদ্ভুত জায়গায় আমায় ডাকিয়ে আনার মানে কী?

'মানে একজনের জন্যে অপেক্ষা করা,' পরাশর আমার কৌতূহল মেটালে, 'এই সময়ে কোনও একটা লোকাল ট্রেনে সে আসছে। আর তাকে চেনবার সুবিধে করে দেবার জন্যে গলায় এই মাফলার।'

'যে আসছে সে তা হলে তোমায় চেনে না? তুমি তাকে চেনো?'

'না। নামটা শুধু জানি।' পরাশর আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। 'নামটা তুমিও জানো অবশ্য।'

'আমিও জানি!' অবাক হয়ে পরাশরের দিকে তাকালাম, 'কার কথা বলছ? নামটা কী?'

'নামটা দীপিকা!'

পরাশর প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যই আমার দিকে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

pathagar.net

'দীপিকা!' প্রতিক্রিয়াটা পরাশরের অনুমান মতোই হল নিশ্চয়। সবিস্ময়ে বললাম, 'চৌগড়ের সেই দীপিকা? কিন্তু চৌগড়ে গিয়ে ও নামের তো কারও খোঁজ পাওনি, সে তো প্রথমবার খবরের কাগজ মারফত চিঠি পাঠিয়ে তারপর এতদিন আর সাড়াশব্দই করেনি।'

এতদিন বাদে আবার করেছে। পরাশর ছ নম্বর গেটটার দিকে নজর ফিরিয়ে বললে, 'আজ বাড়িতে ফিরেই তার একটা চিঠি পেলাম। এবার নির্ভুল ঠিকানাতেই চিঠি পাঠিয়ে লিখেছে যে আমি চৌগড়ে গেছলাম তা সে জানে। আমার চৌগড়ে যাওয়া থেকে এইটুকু সে বুঝেছে যে তার আগের চিঠি আমি পেয়েছি। চৌগড়ে আমি যা যা করেছি তার ওপরও সে কিছুটা নজর রেখেছে। তবে উপায় নেই বলেই সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। আপাতত আমার সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত দরকার। কয়েকটা কথা আমায় না বললেই নয়। তাই আমার ঠিকানা জোগাড় করে বাড়িতেই এ চিঠি সে পাঠাচ্ছে। এ চিঠি পেলে আমি যেন অবশ্যই হাওড়া স্টেশনের এই ছ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে বিকেল চারটের পর থেকে—'

পরাশর আর কিছু বলতে পারল না। ছ নম্বরেই একটি ট্রেন থেমে তা থেকে পিল পিল করে লোক বেরিয়ে আসছে। তাদের বার হবার অবশ্য কোনও নির্দিষ্ট গেট নেই। যে যেখান দিয়ে সুবিধে চলে আসছে। প্ল্যাটফর্মটা সামনে বলে ছ নম্বরেই ভিড়টা একটু বেশি।

আমায় 'এসো' বলে ডেকে পরাশর একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছ নম্বরের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসা জনতার ওপর বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলাম।

দীপিকার চেহারা এখনও জানি না। কিন্তু মনে মনে অল্পবয়সি একটি স্মার্ট গোছের মেয়েই কল্পনা করেছিলাম।

সে রকম দু-একটি মেয়েকে ছ নম্বর গেট দিয়ে যে বার হতে দেখলাম না তা নয়, কিন্তু তারা কেউ একা নয়, পরাশরের মতো কাউকে খোঁজবার কোনও আগ্রহও তাদের দেখা গেল না।

ভিড় ক্রমশ একেবারে পাতলা হয়ে যাবার পর একটু চিন্তিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিঠি যা পেয়েছ সেটা ভাঁওতা নাকি? কোথায় তোমার দীপিকা?'

'হয়তো—হয়তো এ ট্রেনেই আসতে পারেনি।' পরাশর একটা খোঁড়া কৈফিয়তে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার দরকার হল না।

'নমস্কার, পরাশরবাবু।'

পেছনে বেশ মধুর গলায় এ সম্ভাষণ শুনে পরাশর ও আমি একসঙ্গে ফিরে তাকালাম।

ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিলাম তাই না হলেও একটি তরুণী ও সবসুদ্ধ জড়িয়ে মোটামুটি সুশ্রী একটি মেয়েই আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে।

একটু হেসে সে বললে, 'আমি ভুল করিনি বোধহয়।'

'না, ভুল করেননি।' পরাশর হেসেই জবাব দিলে, 'তবে একটু অবাক করেছেন।'

'ও, এ গেট দিয়ে না বেরিয়ে এই পেছন দিয়ে এসে ডাকলাম বলে?' দীপিকা একটু যেন দ্বিধা করে বললে, 'সে শুধু আমার চিঠির অনুরোধ সত্যিই আপনি রাখবেন, তা বিশ্বাস করতে পারিনি বলে।'

'বিশ্বাস করতে পারেননি।' পরাশর যেন একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, 'বিশ্বাস না হওয়ার কারণ ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আপনার প্রথম চিঠি পেয়ে আমি চৌগড় পর্যন্ত একটা ব্যাপারের খোঁজ করতে গেছলাম।'

'সেই জন্যেই তো আবার আপনি আমার মতো একটা অজানা মেয়ের চিঠির অনুরোধ রাখবার কষ্ট করবেন ভাবতে পারিনি।' দীপিকা একটু সলজ্জভাবে হেসে বললে, 'সেবারে চৌগড়ে গিয়ে আমার খোঁজ না পেয়ে আমার এবারের চিঠিটা মিথ্যে চলাকি ভাবাই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি তাই ছ নম্বর গেট দিয়ে না বেরিয়ে ওদিকের একটা গেট দিয়ে এসে এখানে সত্যিই আপনি এসেছেন কি না দেখে যেতে এসেছিলাম। তার জন্যে কিছু মনে করলেন না তো?'

'তা কেন করব?' পরাশর হেসে মেয়েটিকে আস্তে করে বললে, 'কিন্তু এখন আমাদের কোথাও বসা দরকার। আপনার যদি আপত্তি না থাকে স্টেশনের রেস্তোরাঁতেও আমরা বসতে পারি।'

'রেস্তোরাঁয়?' আমিই একটু আপত্তি না জানিয়ে পারলাম না, 'সেখানে তো রীতিমতো ভিড়।'

'গোপন কিছু আলোচনার জন্যে ভিড়ের জায়গাই সবচেয়ে ভাল,' পরাশর হেসে বললে, 'সেখানে নিজেদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত। অন্যের দিকে মন দেবার কারও অবকাশ নেই। তা ছাড়া দীপিকা দেবীকে বোধহয় চৌগড়েই ফিরে যেতে হবে, সুতরাং সময় যত কম নষ্ট হয় ততই ভাল।'

পরাশরের প্রস্তাবমতো শেষ পর্যন্ত স্টেশনের রেস্তোরাঁতেই গিয়ে বসলাম। ভিড় সেখানে আছে, কিন্তু একেবারে গায়ের ওপর পড়া ভিড় নয়। ওরই মধ্যে একটি কোণের টেবিলই ভাগ্যক্রমে মিলে গেল।

পরাশর টেবিলে বসে দীপিকাকে জিজ্ঞাসা করে দুটো করে টোস্ট আর এক কাপ করে চা অর্ডার দিয়ে এক মুহূর্ত আর কোনও রকম গৌরচন্দ্রিকায় নষ্ট করতে চাইলে না।

একেবারে সোজাসুজি আসল প্রশ্নটাই করে বসল—'বলুন, দীপিকা দেবী, বিশেষ কী কথাটা বলার জন্যে যেমন করে হোক আমার সঙ্গে দেখা করা আপনার এত জরুরি মনে হয়েছে?'

'আমার মানে—আমার—'

দীপিকা হঠাৎ এমন সরাসরি প্রশ্নের জন্যে নিশ্চয় প্রস্তুত ছিল না। বেশ থতমত খেয়ে খানিকটা আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে বললে, 'দেখুন, আমি যা বলতে এসেছি তা হয়তো সম্পূর্ণ আমার মনের ভুল। কিন্তু—'

'ভুল কি ঠিক সে বিচার এখন আপনাকে করতে হবে না,' পরাশর প্রায় ধমক দিয়েই বললে, 'যা বলবার জন্যে আমাকে এখানে আনিয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলে ফেলুন।'

দীপিকা তবুও চুপ। ধমক খেয়েই যেন সে আরও তখন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ওয়েটার এসে চা আর টোস্টের প্লেট রেখে গেছে।

পরাশর কী বুঝে আবার সুরটা পালটে একটু হেসে সহজভাবেই বললে, 'চা টোস্ট অবশ্য ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওগুলো আগে খেয়ে নেওয়া যাক।'

দীপিকা চা টোস্টে অবশ্য হাত দিলে না। কিন্তু নিজেকে ভেতর থেকেই যেন একটু শক্ত করে তুলে এবার ধীরে ধীরে বললে, 'শুনুন, আমি শুধু আমার একটা ধারণার কথাই আপনাকে বলতে এসেছি। ভুল হোক ঠিক হোক—স্পষ্ট করেই আমি তা জানাচ্ছি। চৌগড়ে সে রাত্রে ট্রেন থেকে যাকে নামানো হয়েছিল, আর পরে নিজের দলের আশ্রয় থেকে যে পালায় সে আমরা ওখানে যাকে জানি সেই হারীন রক্ষিত নয়।'

'হারীন না হলে সে কলকাতার অ্যাডভোকেট বারীন রক্ষিত বলছেন?' পরাশর একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই প্রশ্ন করলে।

'এখন তা-ই মনে করলেও তখন তা বুঝতে পারিনি।' দীপিকা এবার সহজভাবেই উত্তর দিলে, 'বারীন রক্ষিত বলে কেউ আছে তা-ই তখন জানতাম না।'

'কিন্তু তখন হারীন রক্ষিত সম্বন্ধে ওরকম সন্দেহ হয়েছিল কী করে?' আমিই এবার প্রশ্নটা করলাম।

'হয়েছিল তাকে অনেকক্ষণ কাছাকাছি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে,' দীপিকা একটু যেন বিষণ্ণ স্বরেই বললে।

'কাছাকাছি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন!' পরাশরের গলায় যেন একটু সন্দেহের আভাস পেলাম—'তার মানে আপনি হারীন রক্ষিতের পার্টিরই একজন?'

'না। ঠিক তার উলটো'—দীপিকার স্বর এবার যেন একটু কঠিন মনে হল 'আমি বিপক্ষ দলের একজন। ঘটনাচক্রে ওদের নেতাকে পালাতে দেখে আমি আমাদের দলের লোকের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যেই তার পিছু নিই। তাকে ধরাতে অবশ্য পারিনি।'

'সেই পিছু নেওয়ার সময়েই আপনার সন্দেহ হয় যে যাকে অনুসরণ করছেন সে হারীন রক্ষিত নয়?' পরাশর জিজ্ঞাস করলে।

'সন্দেহ ঠিক বলতে পারব না', দীপিকা ধীরে ধীরে নিজের কথাটা গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করলে, 'কারণ তখনও পর্যন্ত হারীন রক্ষিতের মতো আর কেউ থাকতে পারে তা তো আমার কল্পনার বাইরে ছিল। শুধু কয়েকটা ব্যাপারে, যেমন শুধু কথাবার্তা ব্যবহার নয়, চোখ মুখের ভাব পর্যন্ত, যে হারীন রক্ষিতকে আমরা জানি তার সঙ্গে যেন মেলাতে পারছিলাম না।'

'আপনার এই রকম মনে হওয়ার কথা নিজের লোকদের কাউকে বলেছিলেন?'

'না।' মাথা নাড়লে দীপিকা—'তা বলিনি। কথাটা নিজের কাছেই আজগুবি মনে হয়েছিল। তারপর খবরের কাগজে ওই পাহাড়ের দুর্ঘটনার খবর আর ছবিটা বার হবার পর আমার মনের সন্দেহটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই আর কাউকে বলতে না পেরে আপনার কাছে গোপনে ওই চিঠি লিখেছিলাম। সে চিঠিতে কোনও ফল হবে সত্যিই ভাবতে পারিনি।'

শেষ কথাগুলো বলার সময়ে দীপিকার গলা যেন হঠাৎ একটু বেশি ভারী হয়ে এল।

'সত্যিকার ফল এখনও অবশ্য কিছু হয়নি,' পরাশর সহানুভূতির সঙ্গেই এবার বললে, 'তবে আপনার ওই সামান্য চিঠি না পেলে মস্ত বড় একটা রহস্যভেদের তাগিদ হয়তো আমার আসত না—এটুকু আপনাকে বলতে পারি।'

একটু হেসে পরাশর আবার বললে, 'আপনাকে আবার এখনকার দূর ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আর আপনাকে দেরি করিয়ে দিতে চাই না। আপনি একটা যান আর আমার ঠিকানা যখন পেয়ে গেছেন তখন তেমন কিছু দরকার হলে অবশ্যই জানাবেন। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার,' বলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মুখে দীপিকা উঠে দাঁড়াবার পর আমিও তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবার জন্য উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরাশর আমায় অবাক করে দীপিকাকে আবার বললে, 'আমরা কিন্তু আপনাকে এগিয়ে দিতে যেতে পারছি না কিন্তু মনে করবেন না।'

কিন্তু মনে করবার কথাই দীপিকা যেন এ লৌকিকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার স্বস্তি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দীপিকা চলে যাবার পর একটু অবাক হয়েই পরাশরকে তার অদ্ভুত ব্যবহারের মানেটা জিজ্ঞাসা করলাম।

'হঠাৎ অমন অভদ্র হলে কেন? মেয়েটিকে ট্রেনে না তুলে দিই, একটু এগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল নাকি?'

'মেয়েটি তাতে মুশকিলে পড়ত।' পরাশর টেবিলের ওপর রেখে যাওয়া ঠান্ডা চায়ের পেয়ালাতে এতক্ষণে একটা চুমুক দিলে।

'মেয়েটি মুশকিলে পড়ত আমরা এগিয়ে দিলে?' প্রথমটা রেগে উঠলেও তার পরেই একটা কারণ ভেবে পেয়ে বললাম, 'কেন? বাইরে সঙ্গের কোনও প্রেমিকটেমিক অপেক্ষা করছে নাকি।'

'না, তা নয়।' পরাশর মাথা নাড়ল—'দীপিকা যার ছদ্মনাম সে একাই এসেছে বলে মনে করি। তবে আজকের ট্রেনে চৌগড় থেকে আসেনি, সেখানে আজ ফিরেও যাচ্ছে না।'

'সে আবার কী কথা! মেয়েটাকে ঠক ভাবছ?'

'না।'—পরাশর হেসে আমায় আশ্বস্ত করলে—'মেয়েটি সাচ্চা বলেই আমার বিশ্বাস। তবে কোনও একটা ব্যক্তিগত কারণে সত্যের একটু হেরফের করতে বোধহয় বাধ্য হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের ভেতর থেকে সে আজ বেরিয়ে আসেনি। বাইরে শহরের কোথাও থেকে সেই ছ

নম্বর গেটে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছে। সেখানেই এখন সে ফিরে যাবে বলে আমার ধারণা।'

'সামান্য হোক, আমাদের সঙ্গে এটুকু লুকোচুরির কারণ কী হতে পারে?'

'এখনও সঠিক জানি না, তবে অনুমান যা করছি তা ঠিক হলে এ রহস্য নাটকের একটা নতুন খেই পাব। যাই হোক, 'পরাশর এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে আসল প্রশ্নটাই এবার তুললে, 'মেয়েটি যা বলে গেল তাতে সমস্ত রহস্যটা কী দাঁড়াল একবার খতিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। তুমিই চেষ্টা করো না।'

আমি মুখে সামান্য অস্বস্তির ভাব দেখালেও পরাশরের এ প্রস্তাবে একটু গর্ববোধই করে বললাম, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখছি।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা আমরা যতটুক জেনেছি তার ওপর এই ভাবেই দাঁড় করালাম—

বারীন ও হারীন রক্ষিত দু যমজ ভাই, চরিত্রে ও জীবনধারায় প্রায় বিপরীত।

বারীন সত্যিকার উদীয়মান নামকরা একজন অ্যাডভোকেট আর হারীন মফস্‌সলের কোনও এক কারখানার মজদুর ইউনিয়নের বিজয়ী একটি পার্টির নেতা। নেতা হলেও প্রাণ ও মান বাঁচাতে সে লুকিয়ে বারীনের কাছে এসে আশ্রয় চায়।

বারীন রক্ষিত তখন এক পাহাড়ের চূড়ায় অভিযানে যাচ্ছে। সে হারীনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনকে নয়, একজনের অভিযানের সরঞ্জাম সমেত দূরপাল্লার একটি ট্রেনের কামরায় দেখা যায়। তাকে সে কামরা থেকে জোর করে নামিয়ে নেওয়া হয়। নামিয়ে নেয় চৌগড়ের লোকেরা। নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেও লোকটি কিন্তু আবার পালায়।

এ লোকটি কে—বারীন, না হারীন—এই হল প্রশ্ন।

হারীনের দলের লোকেরা বলছে তারা হারীনকেই বিপক্ষ দলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নামিয়েছিল।

নিজেদের দলের নেতাকে তারা চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়।

ওদিকে বিপক্ষ দলের একটি মেয়ের কাছে জানা গেল যে সে হারীনের দলের ব্যবস্থায় ট্রেন-থেকে-নামানো ও তাদেরই প্রায় থেকেই পালিয়ে-যাওয়া লোকটিকে বেশ কিছুক্ষণ অনুসরণ করে নিজের দলের লোক দিয়ে ধরাবার চেষ্টা করেছিল। মেয়েটির তখনই সন্দেহ হয় যে সে লোকটি হারীন নয়, অন্য কেউ।

তুষার-পাহাড়ে ওই দারুণ দুর্ঘটনার খবর পড়ে ও সেই সঙ্গে ছাপানো ছবিটি দেখে মেয়েটির এখন দৃঢ় বিশ্বাস যে সে চৌগড়ে যাকে অনুসরণ করেছিল সে বারীন রক্ষিত।

মেয়েটির ধারণা সত্য হলে রহস্য আরও ঘোরালো হয়। চৌগড়ে জোর করে নামাবার পর যে আবার পালিয়ে এসেছিল সে বারীন রক্ষিত হলে তারপর কোথায় গিয়েছিল? কলকাতাতেই ফিরে গিয়েছিল, না আবার সেই অভিযানের পাহাড়েই রওনা হয়েছিল।

পাহাড়ে গিয়ে তুষার-ধসে সে যদি মারা পড়ে থাকে তা হলে হারীন রক্ষিত কোথায় ছিল এ সময়ে? এখনই বা সে কোথায়?

আর মেয়েটির ধারণা যদি ভুল হয় তা হলেও সমস্যা কিছু সরল হয় না। হারীনই নিজের দলের কাছ থেকে পালিয়ে এসে থাকলে এখনও এমন নিরুদ্দেশ হয়ে আছে কেন?

তুষার-পাহাড়ের দুর্ঘটনায় সে-ই কি তা হলে মারা গেছে? তা গিয়ে থাকলে বারীন রক্ষিতও সঙ্গে সঙ্গে উধাও কেন?

যে দিক দিয়েই চেষ্টা করি, রহস্যটার কোনও মীমাংসার রাস্তা যেন পাওয়া যাচ্ছে না। এর ভেতর আবার বেয়াড়া এক ফ্যাকড়া জুটেছে বারীন হারীনের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ার হঠাৎ আবির্ভাবে।

তাঁর পরিচয় যথার্থ কি না এখনও যাচাই করা যায়নি। রক্ষিতদের পরিবারের বহুকালের

হিতৈষী বন্ধু বকশিবাবুর সন্দেহ যে মেয়েটি জাল।

এরকম প্রতারক কারও পক্ষে রক্ষিতদের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করতে আসার একটা কারণ আছে। হারীনের না থাক, বারীন রক্ষিতের পয়সাকড়ি বেশ কিছুই থাকার কথা। বারীন হারীন দুজনের কেউ না থাকলে, সে আর বারীন এরই মধ্যে কোনও উইল না করে থাকলে আত্মীয়তায় যে সবচেয়ে নিকটতম সে ই সব কিছুর ওয়ারিশ হবে।

'বাঃ,' আমার বিবরণ শেষ হবার পর পরাশর তারিফ করেই বললে, 'একটু-আধটু জট পাকিয়ে ফেললেও ব্যাপারটা তুমি ভাল করেই সাজিয়েছ।'

তার প্রশংসায় খুশি হয়েও ত্রুটিটুকুর কৈফিয়ত দিয়ে বললাম, 'জট কি সাধে পাকিয়েছি! রহস্যটার আগাগোড়াই যে জট।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' পরাশর একটু হেসে হেসে বললে, 'কিন্তু একটা কথা শুধু তুমি ভুলে গেছ!'

'কী।'

'মানসী দেবীর সেই মিলিটারি চেহারার এসকর্টের কথা!'

বেশ একটু বিমূঢ়ভাবে পরাশরের দিকে তাকালাম। কোনও উত্তর তার কাছে পেলাম না। ওয়েটারের আনা বিল চুকিয়ে দিতেই সে তখন ব্যস্ত।

দোকান থেকে বেরিয়েও পরাশরের হাত থেকে সেদিন নিস্তার পাওয়া গেল না।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়েই পাবলিক টেলিফোনে বুথে সে ফোন করতে ঢুকেছিল।

সেখান থেকে একটু যেন উত্তেজিত হয়েই বেরিয়ে এসে বললে, 'শিগগির এসো। ভাগ্যে থাকলে মানসী দেবীর দেখা আজ পাওয়াও যেতে পারে।'

তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায়?'

ভাগ্যক্রমে স্টেশনে সেদিন সেই সময়টায় ট্যাক্সির অভাব ছিল না। জবাবটা সে আমার বদলে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিলে।

তার পিছু পিছু সিটে উঠে বসে অবাক হয়ে তার হেঁকে বলা সেই ঠিকানার কথাটাই জিজ্ঞাসা করলাম।

'তুমি খিদিরপুরে যেতে বললে তো ট্যাক্সিকে। সেখানে কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথায় আর। নিজের বাড়িতে!' পরাশর আমার দিকে চেয়ে হাসল।

কিন্তু আমি তখনও হতভম্ব! বললাম, 'তোমার নিজের বাড়িতে মানে? খানিক আগে মানসী দেবীর সঙ্গে দেখা হতে পারে বললে না?'

'বলেছিই তো', পরাশর হেঁয়ালির মতো করেই ব্যাখ্যা করলে, 'পৃথিবীটা গোল যে! তাই সব ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় মিলেছে। আমার বাড়িটাও তার মাঝে পড়ে যাওয়া তো আশ্চর্য কিছু নয়।'

পরাশরের প্রায় কবিতার মেজাজে এসে গেছে বুঝে সভয়ে আর তাকে ঘাঁটালাম না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে পরাশরের বাড়িতে একরকম দুরু দুরু বুক নিয়েই অবশ্য ঢুকলাম।

মানসী দেবী সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি তাতে তাঁর সম্বন্ধে একটু উগ্র কৌতূহলই জেগেছে অস্বীকার করব না।

পরাশরের বাইরের ঘরে ঢুকে একটু বুঝি হতাশই হলাম তাই।

আমরা ঢোকার পর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পাশের সোফায় বসে থাকা মূর্তিটির দিকেই প্রথম দৃষ্টি যাওয়ায় ভদ্রলোককে তখন লক্ষ করিনি।

পাশে উপবিষ্টা মহিলাটিই যে মানসী দেবী তা কাউকে বলে দেবার দরকার ছিল না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে ওঠা ভদ্রলোক তখন সেই পরিচয়ই দিচ্ছেন।

আমরা ঢোকবার পর আমাদের দুজনের ওপর একবার চকিত চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরাশরকে ঠিক মতোই চিনে নিয়ে তিনি তখন বলছেন—'আপনিই তো মিস্টার পরাশর বর্মা? কিন্তু মানে

pathagar.net

করবেন না, মিস্টার বর্মা আপনার সঙ্গে আগে থেকে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই আমরা আজ আপনাকে একটু বিরক্ত করতে চাই।'

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ!' পরাশরও হাত জোড় করে লৌকিকতার পাল্লা দিয়ে বললে,'আপনারা অতিথি হয়ে এসেছেন এ তো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু '

পরাশর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মানসী দেবীর দিকে চাইতেই আগন্তুক ভদ্রলোক ইঙ্গিতটা বুঝেছেন।

মানসী দেবীর দিকে চেয়ে বলেছেন—'ইনি হচ্ছেন মানসী দেবী মানসী রায়। দেরাদুনে থাকেন। সেখান থেকে ওঁর দুজন আত্মীয়ের খবর নিতে কলকাতা এসেছেন। আমার পরিচয়ের কোনও দরকার নেই। আমি ওঁদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত, আপাতত কলকাতাতেই থাকি, তাই ওঁর সঙ্গী হিসেবে ওঁর কাজে একটু সাহায্য করছি।'

'আচ্ছা। আচ্ছা!' পরাশর উচ্ছ্বসিত আতিথেয়তা দেখিয়ে বললে, 'বসুন। বসুন। আমার কাছে যখন এসেছেন তখন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করতে।'

মানসী রায়ের সঙ্গী ও পরাশর দু জনেই এবার বসেছে। এ সমাবেশে অবহেলিত হলেও আমিও একটা আসন নিয়েছি।

পরস্পরের পরিচয় ও ভদ্রতা বিনিময়ের এ পালার মধ্যে আমি যতটুকু সম্ভব দুজন নতুন অতিথিকেই দেখে নিয়েছি।

বকশিবাবুর কাছে শুনে যে রকম একটা ধারণা যেন প্রত্যাশায় ছিল মানসী রায়কে দেখে তা সত্যিই পূর্ণ হয়নি। সুশ্রী সুঠাম চেহারা। আধুনিক বলে যে কথাটা লজ্জাশীলতার বাহুল্য নেই, আড়ষ্টতাও নেই চোখ মুখের ভঙ্গিতে। কিন্তু উগ্র অপরিচ্ছন্নতার কিছু তো আমার চোখে পড়ল না। বকশিবাবু আজকালকার আধুনিক সমাজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে খুব পরিচিত বোধহয় নন। বিচারটা তাই তাঁর ঠিক নিরপেক্ষ হয়নি।

মানসী রায়ের সঙ্গীর মিলিটারি [illegible] বর্ণনা মনে করে একটু কৌতুকই বোধ করছি এখন। ভদ্রলোক সমর বিভাগের [illegible] নৌবহর লোক নন, একটা বেসরকারি এয়ার সার্ভিসের পাইলট। নিজের সেই [illegible] পোশাকেই পরে এসেছেন বলে আনাড়ির চোখে তাঁকে মিলিটারি ধরা হয়েছে।

পরাশর ও আগন্তুকদের আলাপ ততক্ষণে লৌকিকতা ছাড়িয়ে আসল কথায় পৌঁছতে যাচ্ছে।

পরাশর বেশ একটু বোকা সেজে বলছে, 'কিন্তু মনে করবেন না, মানসী দেবী, আমার সাধ্য থাকলে আপনাকে নিশ্চয় সাহায্য করব। কিন্তু আপনি যা যা চাইছেন তার জন্যে আমার কাছে আসা কি ঠিক হয়েছে? আপনি বারীন ও হারীন রক্ষিত এই দুই ভাইয়ের হঠাৎ খোঁজ করতে চাইছেন। তার জন্যে তাঁদের আত্মীয়বন্ধুদের কাছেই আগে যাওয়া উচিত ছিল নাকি?'

মানসী রায়ের মুখে এবার একটু তিক্ত কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। পরাশরের দিকে চেয়ে বললে 'তা কি আর যাইনি? তবে ওঁদের আত্মীয় বলতে তো যতদূর জানি, এক আমি। আর বন্ধু বলতে যিনি আছেন তাঁর কাছে গিয়ে তো অপমান হতেই বাকি থেকেছি। তাঁর ধারণা আমি শুধু সম্পত্তির লোভে আত্মীয় সেজে বারীন হারীনের খোঁজ করছি।'

'আপনি কার কথা বলছেন?' পরাশর আবার বোকা সাজল।

'বলছি শ্রীঅধরচন্দ্র বকশি বলে রক্ষিত পরিবারের ও বারীন রক্ষিতের বাবা শশধর রক্ষিতের একজন বন্ধু।' মানসী রায় মুখে একটু বাঁকা হাসি নিয়েই বলে গেলেন 'মানুষ তিনি হয়তো খারাপ নন, কিন্তু মনে হল একেবারে গোঁড়া সেকেলে। আমার চেহারা পোশাক দেখেই ভুরু কুঁচকে ছিলেন এবং আমার কথা যে বিশ্বাস করেন না তা বুঝতে দিয়েছিলেন প্রথম থেকেই।'

একটু থেমে হঠাৎ হেসে ফেলে মানবী বললেন, 'তাঁর রকমসকম দেখে শেষ পর্যন্ত মজা

করে তাঁকে জ্বালাবার জন্যে গোল্ডডিগার-এর ন্যাকামির অভিনয়ই করে এসেছিলাম।'

মানসী আবার হেসে উঠলেন।

সেই হাসির হিল্লোলেই তাঁর মুখ চোখের যে উজ্জ্বল রূপান্তর হল তা দেখলে বকশিবাবু খুশি হতেন না বলেই মনে হয়।

'একটা কথা তা হলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি!' মানসী রায়ের হাসিটা উপভোগ করেই পরাশর এবার জানতে চাইল, 'একমাত্র আত্মীয় হিসেবে আপনি কীসের খোঁজ করতে এতদূর এসেছেন?'

'শুধু খোঁজ করতেই আসিনি,' এবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন মানসী দেবী, 'সেই খোঁজের ব্যাপারে একটা কথা জানিয়ে সাহায্য করতেও এসেছি। হারীনের কথা বিশেষ কিছু জানি না। অনেকদিন ধরে তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই নেই। কিন্তু সাক্ষাৎ দেখা না হলেও মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে বাবা বারীনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বারীনের ব্যাপারটাই তাই আমার বিশেষ সন্ধানের বিষয়।'

'কিন্তু বারীন রক্ষিত তো সেই তুষার পাহাড়ের দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিনি—'

'না।' পরাশরকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন মানসী রায়, 'বারীন মারা যেতে পারে না।'

'তা হলে তুষার-দুর্ঘটনায় হারীন রক্ষিতই মারা গেছে বলছেন!' পরাশর যেন ব্যাপারটা এই প্রথম বিচার করার ভঙ্গিতে বললে, 'কিন্তু তা যদি হয়, বারীন রক্ষিত তা হলে নিরুদ্দেশ কেন?'

'সেইটেই আমি জানতে চাই,' বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন মানসী রায়, 'সেই জন্যেই অন্য কোথাও না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি। পুলিশ এ কাজের নিয়ে মাথা ঘামাবে না, অ্যাটর্নি অফিসেরও দায় পড়েনি এ বিষয়ে কোনও কিছু করবার। পরিবারের বন্ধু হিসেবে অধর বকশি মশাই কিছু চেষ্টা হয়তো করতে পারতেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তা ছাড়া আমাকে তিনি বিশ্বাসই করেন না।'

'আচ্ছা, সবচেয়ে জরুরি কথাটাই এবার তাহলে বলুন।' পরাশর যেন দাবি করার ভঙ্গিতেই বললে, 'বারীন রক্ষিত যে তুষার পাহাড়ের দুর্ঘটনায় মারা যাননি একথা কীসের জোরে আপনি বলছেন?'

'বলছি, এ দুর্ঘটনার সব তাকে স্বচক্ষে দেখেছি বলে।' মানসী আমাকে অন্তত চমকে দিলেন তাঁর জবাবে— 'এ দুর্ঘটনার ক-দিন বাদেই বারীন প্রথম দেরাদুনে আমাদের বাড়ি যায়। এ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সবকিছু খবর নেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। যমজ ভাই হারীনের এই অভিযানে যাওয়ার জন্যে নিজেকেই দায়ী করে তখন তার মনের যন্ত্রণা আর আফসোসের অন্ত নেই। বাবা যে কিছুদিন আগে মারা গেছেন সে খবর সে জানত না। আমি আর মা তার কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে সত্যিকার অপরাধ তার কিছু হয়নি। হারীন এক মাসের অজ্ঞাতবাসের জন্যে অস্থির হয়ে তার কাছে এসেছিল। প্রথমে একটু দ্বিধা করলেও শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের অভিযানে যাওয়াই সে সবচেয়ে ভাল মনে করেছে। বারীন তখন তাকে বাধা দেয়নি এইটুকু মাত্র তার দোষ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাধা দিলেও হারীন তখন যা মরিয়া, কোনও নিষেধ মানত বলে মনে হয় না।

এ সব সান্ত্বনায় কোনও ফল কিন্তু হয়নি। ভেতরের বেশ একটা অস্থির যন্ত্রণা নিয়েই বারীন যে তুষার পাহাড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই এলাকায় আরও বিস্তারিত কিছু খবর পাওয়া যায় কি না দেখতে গেছে। কথা দিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে আমাদের দেরাদুনের বাড়িতেই ফিরে আসবে।

কিন্তু তা সে আসেনি। বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করে আমি তার কলকাতার ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছি। তারও কোনও উত্তর না পেয়ে একদিন ট্রাঙ্ককল করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু

তাতে বারীন রক্ষিত এখনও কলকাতা ফেরেনি জেনে অবাক আর চিন্তিত হয়ে কলকাতায় না এসে পারিনি।

আমার দু-এক দিনের মধ্যে দেরাদুনে না ফিরে গেলে নয়। আপনাকে তাই এ কাজের ভার আমি দিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে আমার জন্যে এ রহস্যভেদ করতেই হবে, মিস্টার বর্মা। আপনার যা ফি তা আমি দেব।'

এ ধরনের ব্যাপারে পরাশরকে ফি-এর কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতেই দেখেছি। এবারে কিন্তু তার অন্য চাল দেখলাম।

'খুব ভাল কথা!' পরাশর যেন পেশাদারি ভঙ্গিতে বললে, 'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। আপনি তো দু-একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন বলছেন। আপনার দেরাদুনের ঠিকানাটা সুতরাং রেখে যান। আমার অনুসন্ধানে যা পাব তার রিপোর্ট আর আমার চার্জের বিল সেখানেই পাঠাব।'

'অনেক ধন্যবাদ।' মানসী তাঁর হ্যান্ডব্যাগটা খুলতে খুলতে উঠে দাঁড়িয়ে তা থেকে পাঁচটা বড় নোট বার করে পরাশরের দিকে এগিয়ে ধরে একটু দ্বিধাভরে হেসে বললে, 'ওই ডিটেকটিভ নভেলে যা বলে সেই রিটেনার হিসেবে এই সামান্য অগ্রিম টাকা খুব কম হচ্ছে কি?'

'না, তা হচ্ছে না।' অম্লান বদনে নোটগুলো পকেটস্থ করতে করতে পরাশর গম্ভীর ভাবে বললে, 'আপনার ঠিকানাটা এবার বলুন।'

'ঠিকানা বলার দরকার নেই। আপনাকে খেপে খেপে কোনও রিপোর্ট দিতে হবে না।' মানসী রায় তাঁর সঙ্গীকে দেখিয়ে বললেন, 'এই গৌতম মানে মিস্টার পালই আমার হয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তেমন কিছু বেশি দরকার হলে অবশ্য ওই জানাবে আমায়। আচ্ছা, নমস্কার।'

নমস্কার জানিয়ে মানসী ও তাঁর সঙ্গী বেরিয়ে যাওয়ার পর পরাশরের পাশেই উঠে এসে বসে একটু হেসে বললাম, 'তুমি টাকাটা নিলে তা হলে?'

'বাঃ, ন্যায্য ফি-এর টাকা নেব না কেন?' পরাশরও হাসল আমার দিকে চেয়ে।

'তার মানে মেয়েটি সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তোমারও তা-ই!' একটু গর্বভরেই জানালাম।

'তোমার ধারণাটা কী?' জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

'ধারণা এই যে বক্সিবাবু ভুল করেননি। মেয়েটি সত্যিই জাল।'

'এ ধারণার পেছনে যুক্তিগুলো শুনি!' পরাশর যেন আমায় পরীক্ষা করবার জন্য জানতে চাইল।

'যুক্তি একটা নয়, অনেকগুলো।' পরাশরের সঙ্গে বুদ্ধির পাল্লায় যে পেছপাও নই তা বোঝাবার মতো করে বললাম, 'প্রথমত, এই বায়না দেওয়াই একটা প্রমাণ। এতগুলো টাকা হঠাৎ দরাজ হয়ে তোমায় অগ্রিম দিয়ে এইটুকু বোঝাতে চায় যে পয়সাকড়ির ব্যাপারে তার কোনও লোভই নেই। দ্বিতীয়ত, দেরাদুনের ঠিকানাটা তোমায় দিয়ে না যাওয়া। তৃতীয়ত, বারীন রক্ষিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার এমন একটা গল্প বানাল যাতে মনে হতে পারে যে বারীন বেঁচে আছে বলেই সে বিশ্বাস করে আর বারীনের মৃত্যু নয়, তার জীবিত থাকাই সে চায়।'

পরাশর চুপ করেই আমার কথা খুব মনোযোগের সঙ্গেই শুনছিল।

একটু হেসে বললাম, 'কেমন ঠিক বলিনি?'

'না।'

'না?' পরাশরের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকালাম—'তুমি আমার মীমাংসাটা ভুল বলছ? বলতে চাও যে মানসী দেবী জাল কেউ নয়। কেমন করে সেকথা বুঝলে শুনি?'

'বুঝেছি সেই অ্যাটর্নি অফিসে গিয়েই!'—পরাশর একটু মুচকে হাসল—'কীসে বুঝেছি তা তখনই বলেছিলাম।'

'তখনই বলেছিলে?' আকাশপাতাল ভেবে কিন্তু কী এমন পরাশর বলেছিল কিছুই মনে করতে পারলাম না।

একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই তাকে সেকথা বলতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।

একটু বিমূঢ় হয়েই বললাম, 'বলার মধ্যে তুমি তো মানসী রায়ের এসকর্ট হিসেবে মিলিটারি চেহারার লোকটি সম্বন্ধে একটু টিপ্পনি কেটেছিলে। বলেছিলে অ্যাটর্নি অফিসে এসে ওই খবরটুকু জানতে পারাই লাভ।'

'তা হলে তো ঠিকই বুঝেছ।' বললে পরাশর।

'না, কিছুই বুঝিনি।' এবার ঝাঁঝিয়েই উঠলাম 'মানসী রায়ের সঙ্গীর চেহারায় মিলিটারি হওয়ার সঙ্গে তার জাল না হওয়ার সম্বন্ধ কী ...'

'সম্বন্ধ নেই।' এবার একটু হেসে পরাশর তার ব্যাখ্যাটা জানাল, 'সঙ্গী মিলিটারি চেহারার এইটুকু শুনে তেমন কিছু অবশ্য বোঝা যায় না। তবে লোকটির ধড়াচূড়া যে কোনও সামরিক গোছের লাইনের একটু উঁচু পদের ইউনিফর্ম জাতীয় এটুকু অনুমান করা যায়।'

'কিন্তু আমরা তো দেখলাম, লোকটি মোটেই মিলিটারি নয়, তবে পোশাক প্রাইভেট কোনও এয়ার সার্ভিসের পাইলটের।'

'ঠিকই দেখেছ,' পরাশর এবার বোঝালে, 'কিন্তু মিলিটারি না হলেও পোশাকটা একটা বিশেষ পদের ইউনিফর্ম তো বটে। মানসী রায় জাল কেউ হলে সঙ্গে করে ও রকম পদমর্যাদার পোশাক পরা কাউকে আনত বলে মনে হয় না।'

একটু থেমে পরাশর তার নানা যুক্তিগুলোও শোনালে। বললে, 'সাধারণ লোকদের ভড়কি দেবার জন্যে ওরকম প্যাঁচ হয়তো চলে, কিন্তু যাদের সঙ্গে মানসী রায়ের কারবার, কলকাতার সেই অ্যাটর্নি অফিসের মতো ঝানুদের মহলে গিয়ে জাল হলে ও সস্তা চালাকি সে কখনওই করত না। মিথ্যে হলে তাতে ধরা পড়ার ভয় আরও বেশি। সুতরাং সঙ্গীর পোশাকটার কথা শুনেই এইটুকু আমি ধরে নিয়েছিলাম যে সে যার যা ই হোক, মানসী রায় সেজে-আসা কোনও প্রতারক নয়।'

পরাশরের যুক্তিগুলোর যে কিছু জোর আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। বেশ ফাঁপরে পড়ে তাই বললাম, 'তুমি যা বলছ তাতে মানসী রায়কে তো সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখতে হয়। আর তার কথা সত্য হলে রহস্যটা তো একেবারে অভেদ্য হয়ে ওঠে। এর আগে দীপিকার কথা আমরা যা শুনেছি তা তুমি অবিশ্বাস করোনি, এখন মানসীর কথাও যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় তা দেখছ তো।'

পরাশর আমার কাছেই সেটা শুনতে চায় দেখে বিস্তারিত করে বললাম, 'দীপিকা বলছে, হারীন নয়, আর কাউকে অর্থাৎ একই চেহারার বারীনকে সে চৌগড় থেকে পালাতে দেখেছে। তার কথার ওপর নির্ভর করে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বারীন রক্ষিত চৌগড় থেকে পালিয়েই সেই তুষার পাহাড়ের অভিযানে গিয়েছিল এবং সেখানকার দুর্ঘটনাতেই সে মারা যায়।

এখন মানসী রায় যা বলছে তাতে বারীনের ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু অসম্ভব, কারণ দুর্ঘটনার পরে মানসীদের বাড়িতে গিয়ে সে ক-দিন ছিল।

দীপিকা ও মানসী দু-জনের কথাই যখন সত্য মনে করছ তখন ধাঁধাটা তো সব মীমাংসার বাইরে চলে যায়।'

'তা যায়।' কিন্তু একটা গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে কী রকম একটু অন্যমনস্কভাবে পরাশর যেন নিজের মনেই বললে, 'তবু আমার কেমন মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এ রহস্যের একটা মীমাংসা হয়তো হয়ে যেতেও পারে।'

পরাশরের কথাটা যে অত তাড়াতাড়ি সত্য হয়ে উঠবে তা ভাবতেও পারিনি।

pathagar.net

পরের দিন সকালে নিজে থেকেই পরাশরের কাছে গেছলাম। চেষ্টা করেও এই যমজ রহস্যের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেই পারিনি। পরাশরের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নতুন কোনও খেই বার করা যায় কি না তাই দেখাই ছিল উদ্দেশ্য।

আলোচনাটা শুরু করার ফুরসত তখনও মেলেনি।

বাইরের ঘরে বসে পরাশরের বাসায় চমৎকার কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল।

ফোন যান্ত্রিক জিনিস, নেহাত কোথাও কিছু একটু বিগড়ালে তার আওয়াজের তারতম্য হয়। এ দিনের ফোনের আওয়াজটাই যেন আলাদা। অন্তত আমার কানে তার ঝনঝনানিটা একটা যেন উত্তেজনার তীব্রতা নিয়েই বাজল।

সেই উত্তেজনারই একটু আভাস দেখলাম পরাশরের চোখে, গলার স্বর তার ধীর স্থির। কিন্তু চোখের হঠাৎ ঝিলিকটা দৃষ্টি এড়াবার নয়।

ফোনে তার কথাগুলো শুনে অবশ্য কিছু বোঝবার উপায় নেই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি পরাশর বর্মা বলছি। নমস্কার।...ও! কালই খবরটা পেয়ে দেখা করতে এসেছেন।...ইচ্ছে করলে আমিও গিয়ে দেখা করতে পারি? করতে পারি কেন, নিশ্চয় করব। আমার বন্ধুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আপত্তি নেই তো?...আচ্ছা ধন্যবাদ?'

ফোনটা নামিয়ে রেখে পরাশর উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে ফিরল।

'নাও, কফিটা শেষ করে নাও। বেরোতে হবে এক্ষুনি।'

'ব্যাপারটা কী!' কিছুটা অনুমান করেই বললাম, 'বারীন-ওরীনদের রহস্য সংক্রান্ত কিছু?'

'হ্যাঁ,' আমার অনুমানের সীমাছাড়ানো খবরে পরাশর আমায় চমকে দিলে—'বারীন রক্ষিত ফিরে এসেছে। চলো, একবার দেখা করে আসি।'

বারীন রক্ষিত ফিরে এসেছে! সংবাদটার প্রকৃত তাৎপর্য মাথায় নিতে আমার বেশ একটু সময় লাগল।

এরপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়লেও সোজাসুজি বারীন রক্ষিতের বাড়িতে যাওয়া হল না।

বড় রাস্তায় যে মোড় থেকে বাঁক নিয়ে বারীনের বাড়ির পথ ধরতে হয় সেখানে পৌঁছেই পরাশর হঠাৎ বেশ একটু চেঁচিয়ে উঠেই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে।

প্রথমটা একটু অবাকই হয়েছিলাম। কিন্তু গাড়িটা রাস্তার ধারে এনে দাঁড় করাবার পর পরাশরের সঙ্গে রাস্তার অন্য পারে পরাশরের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে বুঝতে দেরি হল না।

ওপারের একটা লাইট পোস্টের ধারে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে এখানে এ অবস্থায় দেখার আশাই করিনি।

দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ নয়—দীপিকা।

তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাই কেমন ঠিক স্বাভাবিক লাগল না।

যেখানে সে দাঁড়িয়েছে সেখানে কোনও বাস বা ট্রাম স্টপ নেই। লাইট পোস্টটার গায়ে ঈষৎ ভর দেওয়ার ধরনটাতেই যেন তার ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্যহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে এ সময় তার অমন করে দাঁড়াবার কোনও কারণই তো নেই।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে ব্যস্ত ট্র্যাফিকের রাস্তা পার হয়ে যেতে একটু সময় লাগল।

ভয় ছিল, আমরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই যদি সে হঠাৎ মনস্থির করে কোনও বাস বা ট্রামে উঠে পড়ে।

তা না গেলেও কাছাকাছি যাবার পর আমাদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে উঠে সে প্রথম তাড়াতাড়ি অন্যদিকে হেঁটে আমাদের এড়াবারই চেষ্টা করলে।

এবার পরাশর কিন্তু আর দ্বিধা করলে না। ভদ্রতা শোভনতা জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে গিয়েই

দীপিকাকে সে ডেকে থামাল। বাধ্য হয়ে আমাকেও তখন হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে পৌঁছতে হয়েছে।

প্রথমটা আবক্তমুখ দীপিকা আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগই করলে।

'এ আপনাদের কী রকম ব্যবহার? আমাকে এভাবে থামাবার মানে?'

'আপনারও তো আমাদের দেখে পালাবার কোনও মানে হয় না।' পরাশর শান্ত সহানুভূতির স্বরে বললে, 'আমরা পুলিশের লোক নই। আপনি তো কাউকে ভয় করবার মতো অন্যায় কিছু করেননি। বারীন রক্ষিতের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়াটা কোনও অপরাধ নয়।'

রীতিমতো চমকে গিয়ে আমি বিমূঢ়ভাবে পরাশরের মুখটা একবার লক্ষ করে দীপিকার দিকে তাকালাম।

আমার চেয়েও অনেক তীব্র ও সচকিত দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে একবার তাকিয়ে সে তখন নিজের ঠোঁট কামড়ে মুখটা নিচু করে ফেলেছে।

পরাশর গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তখন বলছে, 'আপনি সেদিন যে চৌগড় থেকে আসেননি তা আমি তখনই বুঝেছিলাম। তার কয়েকদিন আগে থেকেই আপনি বোধহয় এখানকার কোনও আত্মীয়বাড়ি আছেন। আর রোজই—'

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে পরাশর এদিক ওদিক একটু লক্ষ করে আবার বললে, 'এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে কি? কাছেই একটা চায়ের দোকান দেখছি। বেশ ফাঁকাও আছে এখন। চলুন, একটুখানি ওখানে গিয়ে বসি। আপনাদের সঙ্গে খানিক কথা বললে হয়তো মনটা একটু হালকাও হবে।'

কাছাকাছি চায়ের দোকানটায় ফাঁকা একটা টেবিলে গিয়ে বসে তারপর দীপিকার সব কথা শুনেছি।

পরাশর ঠিকই অনুমান করেছিল। আমাদের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা করবার ক-দিন আগে থেকেই দীপিকা কলকাতায় তার এক মামার বাড়িতে এসে আছে। গেটা দুই চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্যেই সে এসেছে বলে সকলকে জানিয়েছে। তার আসল উদ্দেশ্য বারীন রক্ষিতের সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজ নেওয়া।

তুষার পাহাড়ের [illegible] বারীন রক্ষিতই মারা গেছে একথা দীপিকার মন মানতে চায় না। বারীন রক্ষিত পর্যন্ত একই সময়ে নিরুদ্দেশ হওয়ায় বারীনের বেঁচে থাকা সম্বন্ধে তার আশা আরও প্রবল হয়েছে।

কয়েকদিন ধরেই একবার করে বারীনের বাড়িতে সে নানা ছুতোয় যায়। আজ সকালে বারীন ফিরে এসেছে জেনে অধীর ঔৎসুক্যেই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

কিন্তু সেখান থেকে এমন আঘাত নিয়ে ফিরেছে, আমাদের কাছে মুখে বলতে না পারলেও, যা তার কাতর হতাশ মুখে আর অশ্রুসজল চোখে করুণভাবে ধরা পড়েছে। আঘাতটা বারীন রক্ষিতের ঔদাসীন্যের।

দীপিকা যখন দেখা করতে যায় তখন বারীন রক্ষিতের কাছে মানসী নামে আর-একটি সুন্দরী মেয়েকে সে দেখেছে। দীপিকার কথা থেকে বোঝা গেল, বারীন রক্ষিতের কাছে সেই মেয়েটির উপস্থিতিই তার ঔদাসীন্যের কারণ বলে সে মনে করে। ওই মেয়েটির সামনে বারীন তাকে চিনতে পর্যন্ত চায়নি। সে যেন এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

এইটুকু বলতে বলতেই দীপিকা একেবারে ভেঙে পড়ে টেবিলের ওপর দু হাতে মাথা গুঁজে কান্না চাপবার চেষ্টা করেছিল। বিপক্ষ দলের একজন হিসেবে নেহাত অল্পসময়ের সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ থেকেই এই মেয়েটির হৃদয়ে বারীন সম্বন্ধে কী গভীর আকুলতার যে জন্ম হয়েছে তা বুঝতে তখন আর আমাদের বাকি নেই।

আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনায় আমার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বার হতে চায়নি।

পরাশর শুধু গাঢ় স্বরে দীপিকার কথাটাই আবার বলেছে, 'অন্য মানুষ হয়ে গিয়ে চিনতে পর্যন্ত চায়নি।'

বিশেষ কোনও উৎসাহ বোধ না করলেও বারীন রক্ষিতের সঙ্গে এরপর গিয়ে দেখা করেছি।

বকশিবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেই সুন্দরী আধুনিক মানসীও। ধরনধারণে বোঝা গেছে বারীনের ফিরে আসায় দু জনের মধ্যে আগেকার সে বিরোধ আর নেই। বকশিবাবুই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'তোমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে এই মিস্টার বর্মাকেই আমরা অনুসন্ধানের ভার দিয়েছিলাম।'

'আপনি নিজে থেকে ফিরে এসে আমার সেই চাকরিটা ঘোচালেন—' ঠাট্টা করে হাসতে গিয়ে বারীনের মুখের দিকে চেয়েই পরাশর নিজেকে সংবরণ করল নিশ্চয়।

প্রথম থেকেই বারীন রক্ষিতকে এমনই বিষণ্ণ গম্ভীরই দেখছি। কারণটা বুঝতেও তারপর দেরি হল না।

পরিহাসের সুরটা বদলে পরাশর নিজেও এবার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ফিরতে আপনার এত দেরি হল কেন, মিস্টার রক্ষিত?'

'দেরি?' বারীনের হয়ে বকশিবাবুই জবাব দিলেন, 'দেরি করে যে এসেছে তা ই যথেষ্ট। ও তো আর আসবে না বলেও ভেবেছিল।'

'কেন?' পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'হারীনের মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে?'

'ঠিকই ধরেছেন।' এবার বললেন মানসী রায়, 'এখনই সে আবার পণ করেছে ল প্র্যাকটিসই করবে না।'

'না, না, সে চিরকালের জন্যে নয়।' বিষণ্ণ মুখে মৃদু প্রতিবাদ করলে বারীন, 'আপাতত, কিছুদিন এসব কাজে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন।' বারীনকে সমর্থনই জানাল পরাশর।

আর সামান্য কিছু মামুলি আলাপের পর আমরা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে এসে মানসী রায়কে বকশিবাবুর গাড়িতেই চলে যেতে দেখে একটু কৌতুক বোধ করলাম।

বাড়ি ফেরার জন্য আমাদের দু-দিকে যাবার দুটো ট্যাক্সি তখন দরকার। তারই চেষ্টা করছি। হঠাৎ পরাশর বললে, 'দাঁড়াও, ট্যাক্সি এখন থাক। ওখানে একবার ফিরে যেতে হবে।'

'ওখানে মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বারীন রক্ষিতের বাড়িতে আবার?'

উত্তর না দিয়ে পরাশর তখন ফিরে পা চালাতেই শুরু করেছে।

বেশ একটু দ্বিধা সংকোচ নিয়েই পরাশরের সঙ্গ নিতে হল এবার।

দ্বিধা সংকোচ যে অকারণ নয়, বারীন রক্ষিতের কাছে আমাদের অভ্যর্থনাটাতেই তার ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া গেল। নেহাত ভদ্র শিক্ষিত মানুষ। তাই মুখে একটা হাসি টেনেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। অপ্রসন্নতাটা কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট রইল না।

এসে অবশ্য প্রায় হাতজোড় করেই বলল, 'আবার ফিরে এলেন। কিছু ভুলে গিয়েছিলেন কি?'

'না, ভুলিনি হারীনবাবু?' পরাশর একটু হেসে বললে, 'তবে কয়েকটা কথা আপনাকে একলাই বলতে চাই বলে এখন আবার ফিরে এলাম।'

আমি আর বারীন রক্ষিত দু-জনেই তখন অবাক হয়ে পরাশরের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়েছি।

বারীন রক্ষিত গলাটা খুব মোলায়েম রাখবার চেষ্টা না করেই এবার বললে, 'মাফ করবেন, মিস্টার বর্মা। আমার নামটা আপনি একটু ভুল করছেন।'

'কিছুই ভুল করিনি, হারীনবাবু।' পরাশরের গলা এবার ক্রমশ যেন কঠিন হতে লাগল, 'যা যা বলছি, মন দিয়ে শুনে যান। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বারীনের মৃত্যুর জন্যে দায়ী অবশ্য নন, কিন্তু

পরোক্ষভাবে তাতে আপনার হাত আছে। বারীন রক্ষিত আপনাকে এখানে গোপনে থাকবার সুযোগ দিয়ে ট্রেনে তার অভিযানের পাহাড়ে রওনা হবার পর আপনিই গোপনে আপনার বিপক্ষ দলকে মিথ্যে খবর দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে হারীন রক্ষিত যেন অন্য ছদ্মবেশে ট্রেনে করে পালাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে বারীন রক্ষিতকে আপনার নিজের দলের লোকেরাই উদ্ধার করে আর তারপর তাদের হাত থেকেও পালিয়ে বারীন তার পাহাড়ি অভিযানের প্রথম ঘাঁটিতেই গিয়ে পৌঁছয়। তার অনুপস্থিতির জন্যে অভিযান ক-দিন পেছিয়ে যায়। কে জানে ঠিক সময়ে অভিযান আরম্ভ হলে এ দুর্ঘটনা একেবারেই ঘটত কিনা!

এ দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন আপনি এ বাড়িতে লুকিয়ে থেকে বারীন রক্ষিতের কাগজপত্র আপনার বিদ্যাবুদ্ধি মতো সব ঘেঁটে দেখেছেন। জাল করার ব্যাপারে আপনার হাত পাকা। বারীন রক্ষিতের চেকটেক কিছু যে সেসময় জাল করেননি তা আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধির প্যাঁচ আপনি খেলিয়েছেন দুর্ঘটনার খবরটা পাবার পর। ভাগ্যের এটা পরম বর আপনি মনে করেছেন। বারীনের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতেই মানসী দেবীদের চিঠি ও ঠিকানা আপনি পেয়ে গেছেন। মানসী দেবীদের দূর সম্পর্কের কথা আপনার অজানাও নয়। সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে আপনি বারীন সেজে দুর্ঘটনার পর যেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে দেরাদুনে মানসী দেবীদের বাড়ি গেছেন। তাদের বাড়ির কেউ বারীন বা হারীন কাউকেই চাক্ষুষে আগে দেখেনি। সেখানে আপনার বারীনত্ব প্রতিষ্ঠিত করে কিছুদিনের জন্যে ওই অঞ্চলেই গা ঢাকা দিয়ে থেকেছেন। বারীনের মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক খবর নেওয়াও তখন আপনার একটা কাজ ছিল নিশ্চয়।

এরপর বেশ কিছুদিন সকলকে উদ্বেগের মধ্যে রেখে বারীন হয়ে আপনি ফিরে এসেছেন। বারীন হওয়ার প্রধান বিপদ হল তার ওকালতির পেশা নিয়ে। খুব চালাকি করে সে বিপদ এড়াতে চেয়েছেন ভাইয়ের মৃত্যুর দুঃখে অর্ধ-বিবাগী সেজে কয়েক বছর আপনি যেন আর ওকালতির কাজ ছুঁতেই পারবেন না। কিন্তু ক-বছরে নয়, তার অনেক আগেই কলমের কারদানিতে বারীন রক্ষিতের সনদটাই যে আপনার ফাঁক করা মতলব তা কে আর কী করে বুঝবে।

প্ল্যান যা করেছিলেন তা সফল না হবার কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু কেমন করে যেন ধর্মের কল শেষ পর্যন্ত বাতাসে নড়ে।

চৌগড় থেকে পালাবার সময় সেখানকার একটি মেয়ে বারীন রক্ষিতকে দেখে। তখনকার শত্রুতার ভেতর দিয়ে তাদের সামান্য সময়ের মধ্যেই এমন একটা অন্তরের যোগাযোগ হয় যে কাগজে দুর্ঘটনার সংবাদ বার হবার পর মেয়েটি বারীন রক্ষিতের খোঁজে এখানে পর্যন্ত না এসে পারে না।

আজ খানিক আগেই সে মেয়েটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে নিদারুণ আঘাত পেয়ে চলে গেছে। সে না বুঝলেও তার আঘাতটার যথার্থ কারণ যে কী তা আমি বুঝেছি।

মেয়েটি আপনাকেই তার বারীন মনে করে আমাদের বলেছে যে আপনি যেন অন্যমানুষ হয়ে গিয়ে তাকে চিনতেই চাননি।

তার কথাটাই ঠিকমতো সাজিয়ে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে আপনি সত্যিই অন্যমানুষ। তাই—তাকে চিনতে চাননি নয়, চিনতেই পারেননি।

আপনার সঙ্গে তর্ক করবার সময় বা প্রবৃত্তি আমার নেই। কাল সকাল পর্যন্ত আপনাকে আমি সময় দিয়ে যাচ্ছি। এরই মধ্যে যদি কিছু গুছোতে পারেন তাই নিয়ে বিনা উপদ্রবে আবার যদি নিরুদ্দেশ না হন তা হলে আর কিছুতে নয়, শুধু আপনার কপালের নতুন কাটানো দাগ দিয়েই আপনাকে আমি ধরিয়ে দিতে পারব। ছেলেবেলায় ঘায়ের দাগের সঙ্গে দু-দিন আগের কাটা দাগের চামড়া মেলে না এটা মনে রাখবেন।'

হারীন রক্ষিতের উত্তরের জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা না করে পরাশর আমায় নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসেছে।

বাইরে যেতে যেতেই রীতিমতো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আচ্ছা, মানসী রায় আর দীপিকা দু-জনের কথাই সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস করেছিলে। তার মধ্যে দীপিকার কথা থেকেই হারীনের সঠিক স্বরূপ ধরলে কী করে?'

'ধরলাম কী করে?' পরাশর একটা চলতি ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে উঠতে উঠতে বললে, 'ধরলাম, বিশ্বাস দু-জনকে করলেও ভালবাসার চোখের ওপর বেশি নির্ভর করি বলে। দুখিনী দীপিকা সেই ভালবাসার চোখেই হারীনের মধ্যে তার বারীনকে খুঁজে পায়নি।'

বেইমান বাটকারা

pathagar.net

'একটা বাটকারা।'

'বাটকারা?'

'হ্যাঁ, বাটকারা বোঝো নাকি? যাকে দাঁড়িপাল্লা বলে।'

'বাটকারাও বুঝি, দাঁড়িপাল্লাও বুঝি। কিন্তু দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তুমি করবে কী?' রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বললাম, 'অনেক রকম গোয়েন্দাগিরির কথা শুনেছি, কিন্তু খুনের কিনারা করতে দাঁড়িপাল্লার কথা কখনও শুনিনি। আর দাঁড়িপাল্লার যদি তোমার কবিতার মিল চাও তো বলে দিচ্ছি, মাঝিমাল্লা বাক্তাল্লা যেটা খুশি লাগাতে পারো।'

কথাটা যে স্বনামধন্য গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মার সঙ্গে হচ্ছিল, তা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। কোথায় কেন কীভাবে হচ্ছিল তারই একটু এবার বলতে হয়।

সত্যিই একটা খুনের রহস্যের মীমাংসা করার মধ্যে পরাশরের ওই আজগুবি বাতিক।

গোয়েন্দারা সাধারণত এইরকম এলোমেলো কথা বলে, কি গল্পের বইয়ে কি সত্যিকার জীবনে পাঠক বা সঙ্গীদের গুলিয়ে দেয়—এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। শার্লক হোমস থেকে শুরু করে, কাঁচা পাকা সব গোয়েন্দার ধরনই এই।

পরাশর কবিতা যত অদ্ভুতই লিখুক, গোয়েন্দাগিরিতে এই সনাতন ধারা থেকে আলাদা নয়।

খানিকটা আমায় একটু বোকা বানাবার জন্যেও হয়তো সে ওরকম গোলমেলে কথা বলে।

কিন্তু কোথায় সেকেন্দ্রাবাদের ধনকুবের ছোটিরাম বজৌরির রহস্যজনক হত্যা আর কোথায় দাঁড়িপাল্লার খোঁজ—মাপ করার পক্ষে এটা গোয়েন্দার সাত খুনের ওপর আট-খুন হয়ে যাচ্ছে নাকি!

হায়দ্রাবাদের খুনের রহস্যের কিনারা করতেই আমরা আসিনি। এসেছিলাম ক-দিনের জন্যে বেড়াতে। কিংবা কলকাতার নাগাড়ে একঘেয়ে বৃষ্টি এড়াতে বলা যেতে পারে।

এসে এই খুনের ব্যাপারে পরাশরকে মাথা লাগাতে হয়েছে।

এখনকার গোয়েন্দা বিভাগের রেড্ডি সাহেব পরাশরের পুরনো বন্ধু। তিনিই পরাশরের পরামর্শ নিতে একদিন এসেছেন আমাদের হোটেলে।

হায়দ্রাবাদ স্টেশনের কাছেই একটা মাঝারি গোছের হোটেলে আমরা দু-কামরার একটা সুইট নিয়ে আছি। এমন কিছু আহামরি হোটেলও নয়। কিন্তু শহরের এইরকম বুকের ওপর বসে থাকতেই পরাশর ভালবাসে। এতে তার নাকি কবিতা আসে ভাল।

ইতিমধ্যে সে কতগুলো কবিতা লিখে ফেলেছে জানি না। আমাকে এখনও শুনতে বসতে হয়নি এই আমার সৌভাগ্য। পরাশর হোটেল থেকে বড়-একটা বেরোয় না। আমাদের দোতলার বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে তার কবিতার খোলক জোগাড় করে। আমি ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদের যা কিছু দ্রষ্টব্য—সালারজঙ্গ মিউজিয়াম থেকে গোলকুণ্ডা দুর্গ প্রায়ই সবই দেখে ফেলেছি।

হায়দ্রাবাদ থেকে এতদিনে হয়তো ফিরেই যেতাম। কিন্তু হঠাৎ দেশজোড়া রেলের ধর্মঘটে আটকে পড়তে হয়েছে।

আটকে না পড়লে বজৌরি হত্যারহস্যের মীমাংসা হত কি না সন্দেহ।

রেড্ডি সাহেব দেখা করতে এসে সেদিন বিকেলে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা জানালেন।

ছোটিরাম বজৌরি হায়দ্রাবাদের একজন ধনকুবের। লোকটি কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতির। টাকার কুমির হয়েও হাড়কঞ্জুস যাকে বলে। হায়দ্রাবাদেরই জোড়া শহর সেকেন্দ্রাবাদে একটা সাধারণ বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটা দেখতে সাধারণ, কিন্তু কয়েকটা বিশেষত্ব আছে। সমস্ত বাড়িতে মাত্র তিনটি ঘর। একটিতে বজৌরি নিজে থাকতেন, আর একটিতে তাঁর প্রধান উত্তরাধিকারী ও ভাগ্নে রামসহায়। বাড়িতে এক বজৌরির ঘরে ছাড়া বড় জানলা কোথাও নেই। সে জানলাটা থাকা একটু বিচিত্র, কারণ বাড়ির অন্য দরজা-জানলা প্রায় সেকেলে দুর্গের দরজা জানলার মতো খুদে খুদে ও মজবুত। সে দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে ছাড়া সাধারণ মাপের লোক গলতে পারে না। সংকীর্ণ জানলা দিয়ে আকাশের আলোকেও ভয়ে ভয়ে ঢুকতে হয়।

শুধু বজৌরির নিজের ঘরের জানলাটা যেমন প্রশস্ত তেমনই শুধু মোটা দামি কাচের শার্সি দিয়ে আঁটা। এত সাবধান সত্ত্বেও বজৌরিকে শুধু এই খেয়ালটুকুর জন্যই প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁর ওই কাচের শার্সি বসানো জানলাই ভেঙে কেউ কয়েক দিন আগে রাত্রে ঢুকে তাঁকে হত্যা করে গেছে। সে হত্যাকারী কে হতে পারে, বোঝা এইজন্যেই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হাড়কঞ্জুস হলেও খুন করবার মতো শত্রুতা তাঁর দুনিয়ায় কারও সঙ্গে ছিল না। যে দু-জনের ওপর কোনওরকম সন্দেহ আসতে পারে, তাদের একজন রামসহায় আর একজন রঘুনাথ নামে বজৌরির আর-এক ভাগ্নে। কিন্তু রঘুনাথ সেদিন হায়দ্রাবাদেই ছিল না বলে প্রায় অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বয়সে এখনও একরকম যুবক হলেও চেহারায় সে একটি জলহস্তি বিশেষ। তার পক্ষে জানলার শার্সি ভেঙে ঢোকা অসম্ভব বললেই হয়।

বাড়ির মধ্যে একা রামসহায়ই ছিল। তার ঘর যদিও আলাদা আর বজৌরি যদিও নিজের ঘরে প্রতিদিন খিল দিয়ে শুতেন, তবু সন্দেহটা স্বাভাবিকভাবে তার ওপরই পড়েছে বেশি করে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, মামা বজৌরিকে হত্যা করবার কোনও উদ্দেশ্যই তার বেলায় পাওয়া যাচ্ছে না। মারা যাওয়ার চেয়ে মামা বেঁচে থাকলেই তার লাভ বেশি। বজৌরির ওই দুই ভাগ্নে ছাড়া তিনকুলের কেউ নেই। ভাগ্নের মধ্যে রামসহায়ই তাঁর প্রিয়। বছর দুই থেকে অন্য ভাগ্নে রঘুনাথের ওপর তিনি খাপ্পা হয়েই আছেন। রঘুনাথকে তাই বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকতে হয়। রামসহায় শুধু মামার সঙ্গে থাকে তা নয়, বজৌরির বিষয়আশয় ব্যবসা দেখা শোনার সব ভার তার ওপরে। বজৌরি বছর কয়েক আগে উইল করে, দুই ভাগ্নেকে সমানভাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন বটে, কিন্তু সে উইলও তিনি সম্প্রতি সপ্তাহখানেক আগে নাকি বদলাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ঘরের উকিল ইফতিকার

সাহেবের কাছে। উইল বদলাবার ইচ্ছে যে কেন, তা বুঝতে কারও বাকি থাকেনি। সমানভাবে রঘুনাথ ও রামসহায়কে উত্তরাধিকারী করার বদলে রামসহায়কেই তিনি নিশ্চয় তাঁর সবকিছু দিয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন। সুতরাং উইল বদলাবার আগে তাঁর এই মৃত্যু আর যাবই হোক রামসহায়ের বাঞ্ছনীয় হওয়ার কথা নয়। এ মৃত্যুতে সুবিধে যা কিছু হয়েছে তা রঘুনাথের।

একজনের বেলায় সুবিধে থাকলেও কারণ ও উদ্দেশ্যের অভাব, আর অপরজনের বেলায় উদ্দেশ্য ও কারণ থাকলেও সুবিধের ও প্রমাণের অভাব, এই দুই সমস্যা-সংকটের মধ্যে পড়ে রেড্ডি সাহেব পরাশরের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলেন।

সমস্ত শুনে আমি অবশ্য একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এই দুই ভাগ্নে ছাড়া সন্দেহ করবার মতো লোক কি আর কেউ নেই? এমনও তো হতে পারে যে, কোনও বদমাশ গুণ্ডা কাচের জানলা ভেঙে ঢুকে বজৌরিকে খুন করে গেছে?'

কথাটা তুলে বেশ একটু গর্বভরেই রেড্ডি ও পরাশরের দিকে চেয়েছিলাম। এই সম্ভাবনার কথা পরাশরের অন্তত ভাবা উচিত ছিল!

পরাশর কিন্তু লজ্জিত হওয়ার বদলে কেমন একটু কৌতুকভরেই আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'রেড্ডি সাহেবের মাথায় কি ওরকম সম্ভাবনার কথা আসেনি মনে করো? নেহাত বাজে বানানো গোয়েন্দা গল্পে ছাড়া পুলিশ অত আহাম্মক হয় না।'

রেড্ডি সাহেব হেসে আমাকেই যেন সান্ত্বনা দিতে বলেছিলেন, 'না, না পুলিশও ভুল করে বই কী! তবে এক্ষেত্রে ওরকম ভুল আশা করি হয়নি। বাইরের কোনও খুনে বদমাশেরও বজৌরিকে খুন করার একটা কোনও উদ্দেশ্য তো থাকা দরকার। শুধু হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ নয়, এ অঞ্চলের কারও জানতে বাকি নেই যে, বজৌরি পয়সাকড়ির ব্যাপারে যেমন কঞ্জুস তেমনই হুঁশিয়ার ছিলেন। বাড়িতে তিনি দু-দশ টাকার বেশি কখনও রাখতেন না। প্রতিদিন ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে এনে তাঁর সংসার খরচ চলত। সেই দু-দশ টাকার লোভে কাচের জানালা ভেঙে তাঁকে খুন করার ঝুঁকি কোনও গুণ্ডাই পারতপক্ষে নেবে না। এ ছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে খুনে গুণ্ডাদের উপর সন্দেহ আসে না। বজৌরি নেহাত পাগলামির খেয়ালে আতবড় কাচের জানলা ঘরে বসায়নি। কাচের জানলার সঙ্গে এমন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছিল যে, কাচের জানলার বাইরে থেকে কেউ ঘা দিলেই ভেতর থেকে তীব্র আলো জ্বলে উঠে বাইরে চারিদিক আলো করে দেবে, আর তার সঙ্গে সাইরেনের মতো বিকট এক বিদ্যুৎ-যন্ত্র বাজতে থাকবে। বজৌরি সাহেবের সেকেন্দ্রাবাদের বাড়িটা একটা নির্জন জায়গায় হলেও একেবারে লোকালয়ের বাইরে নয়। তাঁর বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরেই একটা বস্তি। অন্ধ্র দেশের একটা বড় পরব উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা সেই বিশেষ রাত্রে সারারাত জেগে গান-বাজনা করেছে। ওরকম একটা বিদঘুটে আওয়াজ কিছুক্ষণ ধরে হলে তারা নিশ্চয় টের পেত। কিন্তু—

পরাশর এই পর্যন্ত শুনে হঠাৎ বাধা দিয়ে বলেছিল, 'দাঁড়ান রেড্ডি সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন তো এইমাত্র যা বললেন, আর একবার তা শুনতে চাই।'

আমি শুধু নই, রেড্ডি সাহেবও একটু অবাক হয়েছিলেন এ অনুরোধে।

আমি তো বুঝতেই পারলাম না বজৌরি সাহেবের জানলার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার বর্ণনা দু-বার শুনবার আগ্রহ কেন হতে পারে। এ রকম বৈদ্যুতিক প্যাঁচ তো আজগুবি আশ্চর্য কিছু নয়। পরাশর নিজেই তো এ রকম প্যাঁচ অনেক জানে। তার সঙ্গে আলাপের পর তার খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়ে প্রথমবার রীতিমতো চমকেই গিয়েছিলাম।

বিস্মিত হলেও রেড্ডি সাহেব পরাশরের অনুরোধ রেখে আবার আগের কথাগুলো বলেছিলেন।

পরাশর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বস্তির লোকেরা কোনও আলো দেখেনি বা কোনও আওয়াজ শোনেনি?'

'না।' রেড্ডি সাহেব বলেছিলেন, 'খুব ভাল করে সে খোঁজ নিয়েছি। বস্তিসুদ্ধ লোকের মিথ্যে বলবার কোনও কারণ নেই। তাইতেই বোঝা যাচ্ছে জানলা ভেঙে যে ঢুকেছে, ভেতরের বৈদ্যুতিক কল তার জানা। জানলা ভেঙে ঢুকেই সে গুপ্ত সুইচটা অফ করে কল বিকল করে দিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আলো জ্বলে উঠে যন্ত্র বেজে উঠলেও তা গান বাজনায় মত্ত বস্তির লোকেদের সজাগ করেনি। এখন এই গুপ্ত সুইচের কথা জানা সম্ভব শুধু দু জনের, রঘুনাথ আর রামসহায়ের। শুধু তাই নয়, বজৌরিকে হত্যা করা হয়েছে তাঁরই নিজের রিভলবার দিয়ে। সে রিভলবারও তাঁর খাটের মাথার একটি গোপন খোপে থাকত। সে খোপের খবরও সাধারণ গুন্ডা-বদমাশের জানার কথা নয়। সুতরাং আমাদের সন্দেহ—'

এইবার আমিই বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'মাফ করবেন রেড্ডি সাহেব, আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বজৌরিকে হত্যা করতে পারে মাত্র দু-জন—রঘুনাথ আর রামসহায়, আর এ হত্যায় লাভ শুধু রঘুনাথের। কিন্তু রঘুনাথ যে সেদিন হায়দ্রাবাদের বাইরে ছিল তার অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। কী সে সাক্ষ্য-প্রমাণ জানতে পারি?'

'সাক্ষ্য-প্রমাণ পুলিশেরই।' রেড্ডি সাহেব হেসেছিলেন।

'পুলিশেরই।' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'হ্যাঁ, এখান থেকে কিছু দূরে বিদরি বলে একটা জায়গা আছে বোধহয় জানেন, সেখানকার লোহার ওপর রুপোর মিনের কাজ শুধু ভারত নয়, পৃথিবী বিখ্যাত। রঘুনাথ যে সেদিন বিদরিতে ছিল পুলিশই তার সাক্ষী, আর সেখানকার থানার ডায়েরি তার প্রমাণ। রঘুনাথ একেবারে যাকে বলে উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে। জুয়ার নেশায় সে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে। বজৌরির তার ওপর খাপ্পা হবার কারণও ওই। সেবারে বিদরির এক জুয়ার আড্ডায় সে খেলতে গেছল। পুলিশ সেই আড্ডায় হানা দিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখে, তার মধ্যে রঘুনাথও একজন।'

'বুঝলাম।' এইবার আমার আসল কথাটি ছেড়েছিলাম, 'কিন্তু রঘুনাথ যদি ভাড়াটে কোনও গুন্ডাকে দিয়ে এই খুন করিয়ে থাকে, তাকে বজৌরির ঘরের সমস্ত গুপ্ত কায়দার হদিস দিয়ে?'

রেড্ডি সাহেব এবার চুপ করে গেছলেন।

পরাশরও কিছু না বলে বেশ যেন প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল।

রেড্ডি সাহেব কিছুক্ষণ বাদে চিন্তিত মুখে বলেছিলেন, 'এ কথাটা আমাদের যে মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু এ অঞ্চলের সব গুন্ডাই আমাদের জানা। তন্নতন্ন করে খোঁজ নিয়ে যা জেনেছি, তাতে তাদের কেউ একাজ করেছে বলে মনে হয় না।'

'আপনাদের এ অঞ্চলে ছাড়া আর কোথাও কি গুন্ডা নেই!' রেড্ডি সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম, 'রঘুনাথের পক্ষে বাইরে কোনও জায়গার গুন্ডা ভাড়া করিয়ে আনাই তো সুবিধে, আর সে তাই নিশ্চয়ই করেছে।'

রেড্ডি সাহেব এবার একেবারে চুপ।

পরাশর পর্যন্ত মনে মনে এ যুক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বুঝতে পারছিলাম।

খানিক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভেবে সে বলেছিল, 'আপনি তো এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেননি, রেড্ডি সাহেব?'

'না, তবে দু-জনকেই নজরবন্দি রেখেছি।'

'তা হলে রঘুনাথের কাছে একবার নিয়ে যেতে পারেন?' অনুরোধ করেছিল পরাশর।

'নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, তাকে জেরা করতে কিছুই বাকি রাখিনি। আর সে জেরা আর তার জবাব দুয়েরই লিখিত বিবরণ আপনাকে দিতে পারি।'

'বেশ তা-ই দেবেন। তবু এই জুয়াড়িটিকে একবার চাক্ষুষ দেখতে চাই,' বলেছিল পরাশর।

রেড্ডি সাহেবের পুলিশের গাড়িতেই তারপর রঘুনাথের বাসায় গেলাম।

হায়দ্রাবাদ অতি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর। কিন্তু তারও নোংরা ঘিঞ্জি পাড়া আছে। মামার স্নেহবঞ্চিত হয়ে রঘুনাথ এইরকম পাড়ারই একটি পুরনো বাড়ির দুটি ঘর ভাড়া করে থাকে।

বেলা তখন প্রায় দশটা হবে।

কিন্তু রঘুনাথ তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি জানলাম তার চাকরের কাছে। রঘুনাথের চরিত্রে কোনও গুণের অভাব নেই বলেই মনে হল। আগের রাত্রে মৌতাতটা একটু মাত্রাছাড়া হওয়াতেই বোধহয় এত বেলা পর্যন্ত ঘুম।

দুটি ঘরের একটি বসবার আর একটি শোবার। বসবার ঘরের আসবাবপত্র সাজসজ্জার দুর্দশা দেখেই রঘুনাথের বর্তমান অবস্থা বোঝা কঠিন নয়।

ছোবড়া বেরোনো ময়লা দুটো কৌচ। রাজ্যের সিনেমা আর খেলাধুলোর পুরনো ছেঁড়া পত্রিকা ছড়ানো একটা টেবিল। তার দু-পাশে গোটাতিনেক ভাঙা বেতের আর রং চটা টিনের চেয়ার। দেওয়ালে ফিল্মের নামকরা সব নায়িকাদের ছবি নানা জায়গায় আঠা দিয়ে আঁটা। গোটা চারেক সুন্দরী মেয়ের ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার আর-একদিকের দেওয়ালে লাগানো একটা ব্র্যাকেটে গোটাকতক রুপো ও ব্রোঞ্জের খেলাধুলো ব্যায়ামে উৎকর্ষের পুরস্কার স্বরূপ ট্রফি।

রেড্ডি সাহেবের ধমকে চাকর শশব্যস্ত হয়ে মনিবকে জাগাতে ছুটল। আমি ও রেড্ডি সাহেব ছেঁড়া কৌচের ওপরই বসলাম। পরাশর শুধু ঘুরে ঘুরে ওই ঘরে কী যে অত মনোযোগ দিয়ে দেখবার পেলে সে ই জানে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, কোনওরকমে মুখে চোখে একটু জল দিয়েই বোধহয় রাত্রের শোবার পোশাকেই রঘুনাথ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেড্ডি সাহেবের দিকে চেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, 'আবার জ্বালাতন করতে এসেছেন! এ রকম দগ্ধে না মেরে একেবারে গ্রেপ্তার করলেই তো পারেন। পথ ল্যাটা চুকে যায়!'

রেড্ডি সাহেব হেসে বললেন, 'ব্যাটা কি অত সহজে চোকে। গ্রেপ্তার করতে হলে আটঘাট বেঁধে তো করতে হবে, ফাঁতে একবার বাঁধা পড়লে আর ফসকে পালাবার সুযোগ না পান।'

আমি রেড্ডি সাহেবের কথা বলার মধ্যে রঘুনাথকে ভাল করে লক্ষ করেছিলাম। রেড্ডি সাহেবের কাছে জলহস্তির মতো চেহারা বলে তার যা বর্ণনা শুনেছিলাম, সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয় দেখলাম। চেহারা বিশাল ও বেশ একটু স্থূল হলেও বেশ আঁটসাঁট।

পরাশরের পরের প্রশ্নে বুঝলাম সে ও এটাই লক্ষ করেছে।

পরাশর তার চেহারার দিকেই যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি এককালে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন মনে হচ্ছে, রঘুনাথজি?'

রঘুনাথ ভ্রূকুটির সঙ্গে পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, ছিলাম। তাতে অপরাধটা কী হয়েছে?'

'না, অপরাধ কেন হবে! এটা তো গর্বের কথা।' পরাশর হেসে বললে, 'বন্দুকটাও আপনি চালান ভাল দেখছি। একবার পিস্তল ছোড়ার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে একটা ট্রফি পেয়েছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' রঘুনাথের গলা আগের মতোই রুক্ষ, 'কিন্তু এসব খোঁজে আপনার কী দরকার? কে আপনি?'

'মনে করুন, আপনার হিতৈষী।' পরাশর হাসল।

'আমার হিতৈষী!' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরে রঘুনাথ বললে, 'পুলিশের সঙ্গে এসেছেন আমার হিতৈষী সেজে।'

'পুলিশকেই বা আপনার শত্রু ভাবছেন কেন!' পরাশর এবার একটু গম্ভীর স্বরেই বললে,

'আপনি সত্যি দোষী না হলে পুলিশ আপনারই সহায়, জানবেন।'

'থাক।' রঘুনাথ রাগের সঙ্গে বললে, 'পুলিশের হয়ে ওকালতি শোনবার আমার সময় নেই। কী জন্যে আবার বিরক্ত করতে এসেছেন চটপট বলে ফেলুন।'

রেড্ডি সাহেব এবার পরাশরের মুখের দিকে তাকালেন। বোঝাই গেল যে তিনি পরাশরকে যা প্রশ্ন করবার, করতে বলছেন। তাঁর নিজের নতুন করে জেরা করবার কিছু নেই।

আমাদের নীরবতা আর মুখ চাওয়া-চাওয়ি দেখে রঘুনাথ আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কী? জিজ্ঞাসা করবার কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না?'

পরাশরের পরের প্রশ্নে রঘুনাথের অনুমানই ঠিক মনে হল।

পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'যে রাত্রে আপনার মামা খুন হন, সে রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?'

আমরা তো মনে মনে হাসলামই, রঘুনাথও গলা ছেড়ে এবার হেসে উঠল।

তারপর পরাশরের দিকে চেয়ে অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে বললে, 'এর চেয়ে ভাল প্রশ্ন আর খুঁজে পেলেন না?'

'বেশ।' পরাশর যেন লজ্জিত হয়ে বললে, 'আরেকটা প্রশ্ন তা হলে করি। আপনি তো সিনেমার ছবি খুব বেশি দেখেন। শান্তারামের "আদমী" ছবিটা কেমন বলতে পারেন?'

রেড্ডি সাহেব ও আমি দুজনেই বোধহয় একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। কিছু না পেয়ে এরকম আবোলতাবোল প্রশ্ন করা অন্তত পরাশরের উচিত হয়নি।

রঘুনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জবাব দিলে, 'ও তো অনেক পুরনো ছবি। এককালে খুব নাম করেছিল।'

'হ্যাঁ। তাই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি।' পরাশর নিজের প্রশ্নটা নিরর্থক বুঝেই যেন জেদ করে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছবিটা কেমন?'

'ভালই।' সংক্ষেপে জানালে রঘুনাথ।

'ধন্যবাদ।' বলে পরাশর রেড্ডিকে উঠতে ইঙ্গিত করলে।

'আপনাদের জেরা হয়ে গেলে' ব্যঙ্গভরে রঘুনাথ বললে, 'এরকম জেরা হলে রোজ আসতে পারেন। তবে আর একটু বেলায়। দশটার আগে আমি ঘুম থেকে উঠি না।'

'জেনে রাখলাম। এর পর তাই আসব।' যেন কৃতার্থ হয়ে বলে পরাশর অদ্ভুত একটা অনুরোধ জানিয়ে বললে, 'আপনার এখানে অনেক ছবির পত্রিকা দেখছি, এই পুরনো ফিল্মল্যান্ড পত্রিকাটা আপনার কাছে ধার চাইতে পারি ক দিনের জন্যে?'

পরাশর টেবিলের ওপর থেকে একটা ছেঁড়া পুরনো পত্রিকা সত্যিই হাতে তুলে নিয়ে দেখাল।

'পারেন।' অবজ্ঞাভরে রঘুনাথ বললে, 'ধার নেবার দরকার নেই। ওটা আপনাকে দান করলাম।'

'আবার ধন্যবাদ,' বলে পরাশর অম্লানবদনে পত্রিকা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

পুলিশের গাড়িতে এসে উঠবার পর রেড্ডি সাহেব আমাদের হোটেলেই গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পরাশর তাঁকে থামিয়ে বললে, 'না, রেড্ডি সাহেব। বজৌরির দুই ভায়ের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। রঘুনাথকে দেখলাম, একবার রামসহায়কেও দেখতে চাই। সেকেন্দ্রাবাদে বজৌরির বাড়িতেই চলুন।'

'তাই যাচ্ছি,' বলে হেসে রেড্ডি সাহেব সেই নির্দেশ দিলেন।

বজৌরির বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে তখনও পুলিশ পাহারা রয়েছে। রেড্ডি সাহেবের

কাছে জানলাম, বজৌরির ঘরটিও হত্যার পর যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই রাখা হয়েছে এখনও। শুধু পোস্টমর্টেমের জন্য লাশ নিয়ে গিয়ে পুলিশ ফটোগ্রাফার ঘরের সবকিছুর ফটো তুলে গেছে। বলা বাহুল্য, ঘরের কোথাও কোনও কিছুতে পুলিশ কারও হাতের বা পায়ের ছাপ কিছু পায়নি।

রামসহায়কে বাড়িতেই আমরা পেলাম। বজৌরি আর রামসহায়ের ঘর আলাদা। তার ঘরের পাশেই বাইরে বেরোবার দরজা। বাড়ির ভেতরেও একজন পুলিশ মোতায়েন করে তাই রামসহায়কে সেখানেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরোনো সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নিষেধ নেই, তবু শুনলাম রামসহায় বাড়ি থেকে একেবারে বেরোয় না বললেই হয়।

রেড্ডি সাহেবের কাছে যেমন বর্ণনা শুনেছিলাম, ঘরটা অবিকল তাই। আমার মতো খাটো লোককেও মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। ঘরে একটিমাত্র জানলা, তাও আষ্টেপৃষ্ঠে লোহার শক্ত শিক দিয়ে আঁটা। ইচ্ছে করে কেউ এরকম ঘরে থাকতে রাজি হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। তবে মানুষের রুচি নানারকম—তা ছাড়া অভ্যাসে সবই সয়ে যায়।

রামসহায়ের ছোট ঘরটি রঘুনাথের ঠিক উলটো। জিনিসপত্র বেশি কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা পরিচ্ছন্ন ও দামি। একটি ভাল সোফা সেট। ছোট একটি পুরনো কালের কাজ-করা খাট। একটি ছোট টেবিল আর গুটি-দুয়েক গদি-দেওয়া মানানসই চেয়ার। একটি ড্রেসিং টেবিলের ওপরকার প্রসাধন দ্রব্য দেখে বোঝা যায় রামসহায় বেশ শৌখিন। এ ছাড়া ঘরে আছে একটি সেকেলে ধরনের ওয়ার্ডরোব ও একটি বইয়ের আলমারি। বইয়ের আলমারিটি ঝকঝকে তকতকে সাজানো। বইগুলি দেখলেই বোঝা যায় রামসহায়ের এ বিষয়ে যত্ন আছে। বইগুলি লক্ষ করে দেখলাম, বেশির ভাগই দেশ-বিদেশ ভ্রমণ কাহিনীর।

পরাশরেরও যে তা চোখে পড়েছে তাই প্রথম প্রশ্নে বোঝা গেল।

আমরা ঘরে গিয়ে বসবার পরই আলমারিটার দিকে চেয়ে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি খুব বেড়াতে ভালবাসেন, না রামসহায়জি!'

রামসহায়ের চেহারা রুগ্ন না হলেও রঘুনাথের ঠিক উলটোই বলা যায়। পাতলা একহারা গড়ন। চোখে মুখে একটু ভাবুক গোছের ভাব। কিন্তু মেজাজ দু-জনেরই সমান তিরিক্ষি।

পরাশরের প্রশ্নে রামসহায় প্রায় জ্বলে উঠে বললে, 'পুলিশের সঙ্গে এসেছেন, পুলিশের মতোই প্রশ্ন করুন। আপনাদের সঙ্গে অবান্তর আলাপের আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

পরাশরকে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য রেড্ডি সাহেব বললেন, 'কোনটা সংগত আর কোনটা অবান্তর প্রশ্ন, সে বিচার করবার ভার তো আপনার ওপর নয়। যা প্রশ্ন হয়েছে তার জবাব দিতে পারলে দিন।'

রামসহায়ের মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠল এ কথায়। কিন্তু সে কিছু বলবার আগে পরাশরই যেন লজ্জিতভাবে বললে, 'না, না, ও প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে না। যদি আপত্তি না থাকে রঘুনাথ আপনার সহোদর ভাই কি না জানাবেন?'

'না, সহোদর নয়।' রামসহায় অপ্রসন্ন স্বরেই জানাল, 'রঘু আমার ছোট মাসির ছেলে। তবে আমরা সহোদরের মতোই মানুষ হয়েছি একসঙ্গে। আমাদের দু-জনের মা-ই ছেলেবেলায় মারা যান। মামাই আমাদের মানুষ করেছেন।'

'তাই যদি হয় তা হলে আপনার মামা বজৌরি রঘুনাথের ওপর শেষে অত বিরূপ হয়েছিলেন কেন?'

'সে মামার নিজের বোঝার ভুল। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে বদরাগি লোক ছিলেন। কোনও একটা ভুল ধারণা করে তিনি খেপে গিয়ে ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেন।'

পরাশর একটু হেসে বললে, 'আপনার মাসতুতো ভাই রঘুনাথের চরিত্র খুব নিষ্কলঙ্ক বলে তো মনে হয় না।'

রামসহায় অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'আমার ভাইয়ের চরিত্র নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারব না।'

পরাশর হেসে বললে, 'কিন্তু চরিত্রের জন্যে যদি না হয় তা হলে কেন আপনার মামা রঘুনাথের ওপর খেপে গেলেন, তা তো আমাদের জানা দরকার!'

রামসহায় খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'টাকাপয়সার ব্যাপারে মামা ওকে মিথ্যে সন্দেহ করেছিলেন।'

'তার মানে, টাকাপয়সার কিছু গোলমালের সঙ্গে রঘুনাথ জড়িত ছিল?' রেড্ডি সাহেবই এবার বললেন, 'কিন্তু বজৌরির সন্দেহ যে মিথ্যে ছিল, তা আপনি জোর করে বলছেন কী করে?'

'বলছি রঘুকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি বলে। জালজুয়াচুরি করা তার পক্ষে অসম্ভব।'

'কিন্তু সে তো জুয়া খেলে!' রেড্ডি সাহেব আবার মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, জুয়াও খেলে, একটু-আধটু মদও খায়, ফিল্ম সম্বন্ধেও তার নেশা আছে, কিন্তু তাই বলে চোর জোচ্চোর হতে যাবে কেন? মামা অন্যায় করে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর ওসব বদখেয়াল বাড়িয়েছিল।'

'আচ্ছা, আপনার মামার মৃত্যুর পর রঘুনাথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?' পরাশরই এবার প্রশ্ন করল।

'না।'

'কবে শেষ দেখা হয়েছে তার সঙ্গে?' পরাশর আচমকা অত্যন্ত কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

'এ সেই—' এইটুকু বলেই রামসহায় হঠাৎ চুপ করে গেল।

'বলুন, থামলেন কেন?' পরাশর অত্যন্ত জবরদস্ত হয়ে উঠল, 'সেই রাত্রেই তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, কেমন?'

'না।' রামসহায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'জোর করে আমার মুখে কথা বসাবার চেষ্টা করবেন না।'

'তা হলে, কবে কখন শেষ দেখা হয়েছে বলুন।' রেড্ডি সাহেব এবার কোতোয়ালি ধমকই দিলেন।

'আমার মনে নেই।' রামসহায় কিন্তু অটল।

রেড্ডি সাহেব আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন। পরাশর তাঁকে ইঙ্গিতে থামিয়ে হঠাৎ কথাটা ঘোরাবার জন্যেই একটা আজগুবি প্রসঙ্গ তুলে বসল।

আগের প্রশ্নটা সম্বন্ধে যেন আর কোনও কৌতূহলই নেই এইভাবে ড্রেসিং টেবিলটার কাছে গিয়ে একটা শিশি তুলে নিয়ে বললে, 'এটা তো খুব ভাল কোল্ড ক্রিম দেখছি। আপনি মেয়েদের মতো রাত্রে কোল্ড ক্রিম মাখেন!'

এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপটুকুতেও কোনও কাজ হল না।

রামসহায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে একবার শুধু চেয়ে চুপ করে রইল।

'আপনার যদি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন রেড্ডি সাহেব। আমি বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে আসি,' বলে পরাশর আমাদের একটু অবাক করে দিয়েই বেরিয়ে গেল।

রেড্ডি সাহেব নতুন প্রশ্ন আর কী করবেন! কড়া গলাটা এবার মোলায়েম করে তিনি সেই পুরনো প্রশ্নই করলেন আবার।

'বলুন না রামসহায়জি, সত্যি কবে শেষ রঘুনাথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

রামসহায়কে নিরুত্তর দেখে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তার পরে—'বুঝতেই পারছেন, সত্যি

কে খুনি, ধরবার জন্যে সমস্ত খবর আমাদের জানা দরকার। আপনি কি চান না যে, আপনার মামার প্রকৃত খুনি ধরা পড়ে?'

'চাই।' রামসহায় এবার মুখ খুলল—'কিন্তু রঘুনাথ খুনি নয়।'

'আমারও তো তা বলছি না, কিন্তু ওর সম্বন্ধে সব সঠিক খবর সেই জন্যেই জানা দরকার।'

'বেশ, যত পারেন জানুন। কিন্তু আমার সঙ্গে কবে তার শেষ দেখা হয়েছে, তার সঙ্গে খুনের ব্যাপারের সম্পর্ক কী।'

রেড্ডি সাহেব মিছেই তারপর রামসহায়কে আবার বোঝাতে বসলেন। তার মুখ যেন সাঁড়াশি দিয়ে আঁটা, তার কাছ থেকে কিছুই আর বার করা গেল না।

হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, পরাশর বজৌরির ঘরের বাইরে ঘাসের জমির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা আতস কাচ দিয়ে তন্ময় হয়ে কী দেখছে। পাহারাদার পুলিশ তার পেছনে কৌতুকভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে।

রেড্ডি সাহেবকে দেখে পুলিশ মুখখানা তাড়াতাড়ি গম্ভীর করে ফেলে কর্তব্যের খাতিরেই বোধহয় জানালে, 'সাব, অন্দরমে ভি এইসা কিয়ে হ্যায়।'

পুলিশের গলার শব্দে চমকে পরাশর নিজেই যেন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের দিকে চেয়ে হাসল।

রেড্ডি সাহেবও হেসে বললেন, 'পায়ের দাগ খুঁজছিলেন, মিস্টার বর্মা। সে কি আমরা কিছু খুঁজতে বাকি রেখেছি! তা ছাড়া ইতিমধ্যে ক-বার বৃষ্টি হয়ে গেছে, জানেন! দাগ কিছু এতদিন কি থাকে!'

'হ্যাঁ, তাই দেখলাম।' পরাশর লজ্জিতভাবে জানালে, 'কোনও দাগ নেই।'

রেড্ডি সাহেবের পুলিশের গাড়িতেই আবার বেরোলাম। কিন্তু সেদিন পরাশরের খামখেয়ালিতে বেলা দুপুর পর্যন্ত রেহাই পেলাম না।

গাড়ি কিছুদূর যাবার পরই পরাশর বললে, 'বজৌরির উকিল বন্ধুর নাম ইফতিকার সাহেব, না?'

রেড্ডি সাহেব মাথা নেড়ে সায় দিতে পরাশর বললে, 'তার কাছে যে একবার যেতে হয়।'

রেড্ডি সাহেব অনিচ্ছার সঙ্গেই বোধহয় রাজি হলেন। পরাশরের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাবার জন্য এখন বোধহয় মনে মনে তিনি আফসোসই করছিলেন।

ইফতিকার সাহেব যে বনেদি বংশের লোক তা তাঁর ঘরবাড়ি শুধু নয়, চেহারা দেখেও বোঝা যায়। উকিলের চেয়ে নবাব-বাদশা বলেই মনে হয় দেখলে। ওকালতিটা শখ করেই বোধহয় করেন। নইলে তাঁর কিছুর অভাব আছে বলে মনে হয় না।

রেড্ডি সাহেব পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেবার পর সাদরে বসতে বলে আমাদের জন্য শরবত আনতে দিয়ে তিনি হেসে বললেন, 'কী করতে পারি আপনাদের জন্যে, বলুন?'

পরাশর তাকে হঠাৎ যা বলে বসল, তাতে আমি ও রেড্ডিসাহেব দু জনেই থ।

কোনওরকম ভূমিকা না করেই পরাশর বললে, 'আপনার ক-জোড়া জুতো আছে যদি দয়া করে বলেন।'

ইফতিকার সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে পরাশরের দিকে বোধহয় তার মস্তিষ্ক সুস্থ কিনা বোঝবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বললেন, 'তা তো ঠিক গুনে রাখিনি! তবে কুড়ি-বাইশ জোড়া সব রকম মিলিয়ে হবে বোধহয়।'

'সেইসব জুতো জোড়া অনুগ্রহ করে আপনার চাকরকে একবার আনতে বলবেন কি?'

পরাশরের সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে করে রেড্ডি কী বলতে যাচ্ছিলেন, ইফতিকার সাহেবই হেসে বাধা দিয়ে বললেন, 'বেশ, তাই আনাচ্ছি।'

চিত্র-বিচিত্র কাজ-করা দামি ট্রে-তে তখন শরবত এসে গেছে।

ইফতিকার সাহেব আমাদের শরবত দেবার পর চাকরকে তাঁর সব জুতোজোড়া আনতে বলে দিলেন।

শরবতে চুমুক দিতে দিতে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তো বজৌরির বন্ধু ও উকিল দুই-ই ছিলেন?'

ইফতিকার মাথা নাড়লেন।

'আচ্ছা, বজৌরি তাঁর পুরনো উইল বদলাবার কথা কতদিন আগে তোলেন?'

'তাঁর মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে।'

'কেন কীভাবে উইল বদলাতে চান, তা কিছু বলেছিলেন?'

'না। তিনিও তখন ব্যস্ত, আমারও অন্য কাজে বোম্বে যাবার কথা ছিল। তাই শুধু উইল বদলাতে চান, এই কথাই জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নতুন উইলের খশড়া তিনি করেই রাখছেন। আমায় দেখাবেন পরে।'

পরাশর এবার রেড্ডি সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করলে, 'সে উইলের খশড়া বজৌরির ঘরে পেয়েছেন?'

রেড্ডি সাহেব জানালেন, 'না।'

'আপনার কাছে পুরনো উইলের কপি যদি থাকে একবার দেখাতে পারেন?' পরাশর ইফতিকার সাহেবকে অনুরোধ জানালে।

রেড্ডির কাছে চোখের দৃষ্টিতে যেন অনুমতি চেয়ে ইফতিকার সাহেব বললেন, 'নিশ্চয় পারি।'

চাবি দেওয়া একটা স্টিলের আলমারি খুলে ইফতিকার সাহেব উইলটা পরাশরের হাতে দিলেন।

পরাশর মনোযোগ দিয়ে সেটা পড়ে বললে, 'এতে তো ভারী মজার একটা কথা লেখা দেখছি। রামসহায় ও রঘুনাথকেই সব আগ্রিকারে দেওয়া আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি অপুত্রক মারা যায় তা হলে তাঁর এবং দু জনেই সেভাবে মারা গেলে দু-জনের সমস্ত উত্তরাধিকার আপনিই ট্রাস্টি হিসেবে পাবেন। শুধু তাই নয়, এই দুই ভাগ্নের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পত্তির পুরো দখল তারা পাবে না। সম্পত্তির ট্রাস্টি হিসেবে আপনিই ততদিন তাদের সম্পত্তির আয় ভাগ করে দেবেন, আর তাদের কেউ বা দু-জনেই যদি রাজদ্বারে দণ্ডিত হবার মতো বা বংশের অমর্যাদাকর কোনও কাজ করে, তা হলে তাদের উত্তরাধিকার ট্রাস্টি হিসেবে আপনার দখলেই আসবে।'

ইফতিকার সাহেব একটু হেসে বললেন, 'আমার বন্ধু বজৌরি একটু একগুঁয়ে খামখেয়ালি ছিলেন। রঘুনাথের চালচলনে সন্তুষ্ট না হয়েই ওরকম আজগুবি ব্যবস্থা উইলে করেছিলেন। আমার মনে হয় নিজের ভুল বুঝেই তিনি উইল আবার সংশোধন করতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু ওদের দু-জনের ভালমন্দ কিছু হলেই তো আপনার লাভ, ইফতিকার সাহেব!'

পরাশরের এই বেমক্কা কথায় ঘরে যেন একটা বোমা পড়ল।

আমরা স্তম্ভিত। ইফতিকার সাহেবের আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপমারা মুখ এক মুহূর্তে রাঙা হয়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে তিনি শান্ত অথচ তীব্র স্বরে বললেন, 'আপনি হায়দ্রাবাদের লোক নয় বুঝতে পারছি, মিস্টার বর্মা, নইলে জানতেন, আমাদের বংশের অনেক কিছু গিয়েও এখনও যা আছে, তাতে বজৌরির সম্পত্তিতে লোভ করার আমার দরকার নেই।'

ঘরের অত্যন্ত থমথমে অবস্থা। রেড্ডি সাহেব সেটা হালকা করবার চেষ্টায় বন্ধুকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, ইফতিকার সাহেব। আমার বন্ধু মিস্টার বর্মা ওসব ভেবে কিছু বলেননি। কথাটা নেহাতই ঠাট্টা।'

ইফতিকার সাহেব তা মেনে নিলেন কিনা জানি না। কিন্তু পরাশরকে মোটেই লজ্জিত বা অপ্রস্তুত বলে মনে হল না।

চাকর তখন প্রায় বিশ জোড়া জুতো ঘরে এনে ফেলেছে। তার মধ্যে গোটা-তিন জোড়া কী বুঝে জানি না বেছে নিয়ে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'এই তিন জোড়া জুতো দু দিনের জন্যে নিয়ে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন,' বলে ইফতিকার সাহেব এবার বোধহয় আগের আঘাতের শোধ নিলেন— 'কিন্তু আমার গরিবখানায় এসে শুধু জুতোই নিয়ে যাবেন। এই সঙ্গে এটাও অনুগ্রহ করে নিলে কৃতার্থ হব।'

ইফতিকার সাহেব ঘরের একটা ছোট টেবিলে রাখা লোহার ওপর রুপোর কাজ করা বিদরির একটি অপরূপ বাহারি ছোরা খাপসমেত পরাশরকে উপহার দিলেন।

পরাশর অম্লান বদনে সেটা নিলে। ইফতিকার সাহেবের আদেশে তাঁর চাকর তিন জোড়া জুতোর সঙ্গে সেটাও আমাদের সঙ্গে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

ইফতিকার সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়েও নিস্তার নেই।

পরাশরের এবারের বায়না একেবারে সৃষ্টিছাড়া। বজৌরি সাহেবের যে কাচের জানলা ভেঙে গেছে তা আবার নতুন করে লাগাতে হবে।

'কিন্তু সেরকম কাচ কোথায়?' রেড্ডি সাহেব অনেক দুঃখেই হেসে বললেন বোধহয়।

'যেখান থেকে বজৌরি ও কাচ কিনেছিলেন, সেখানেই গিয়ে দেখা যাক না কেন?' পরাশর জেদ ধরলে, 'অনেক সময় এক মাপের কাচ ওদের একটার বেশিই থাকে তো।'

দোকান খুঁজে পেতে গিয়ে সত্যিই তা পাওয়া গেল। দোকানের মালিক জানালেন, ওইরকম সরেস কাচের এক মাপের ছ-টি জানলা তাঁর দোকানে ছিল। পাঁচটি বিক্রি হয়ে আর-একটি মাত্র আছে। বেজোড় বলে হয়তো বিক্রি হবে না মনে করে তাঁরা সেটা কাটাবার কথা ভাবছেন।

'আর কাটাতে হবে না। আমিই এটা নেব,' বলে সত্যিই পরাশর নিজে থেকে টাকা দিয়ে সেটার বায়না দিয়ে এল।

পরাশরের বাড়াবাড়িতে আমি তো বটেই, রেড্ডি সাহেবও তখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

রাস্তায় বিশেষ আর কোনও কথা হল না। আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে তখনকার মতো রেড্ডি সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আবার সন্ধের পর। পরাশর তার মধ্যেই কী জন্যে জানি না একলাই একবার শহর ঘুরে এসেছে।

রেড্ডি সাহেব আমাদের হোটেলের ঘরের বারান্দায় আমাদের সঙ্গে চা খেতে বসে বললেন, 'আপনি আজ অনেক কিছুই করেছেন, মিস্টার বর্মা, কিন্তু সমস্যার কোনও খেই তাতে মিলবে কি?'

'আপনার নিজের কার ওপর সন্দেহ হয়, রেড্ডি সাহেব?' পরাশর পালটা প্রশ্ন করে বসলে।

'ইফতিকার সাহেবের ওপর অন্তত নয়।' রেড্ডি সাহেব হেসে বললেন, 'আর রঘুনাথ তো সে রাত্রে বিদরির হাজতেই ছিল।'

পরাশর কেমন দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, 'তা বটে! আচ্ছা, এই ছবিটা একটু দেখুন তো রেড্ডি সাহেব!'

রঘুনাথের ঘর থেকে ফিল্মের যে পত্রিকাটা পরাশর চেয়ে এনেছিল, সেইটেই ঘর থেকে এনে এক জায়গায় পরাশর খুলে দেখাল।

আমি ও রেড্ডি সাহেব ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

'এ তো কোনও ফিল্মের একটা দৃশ্য দেখছি।' আমি বললাম, 'চার-পাঁচজন আর্টিস্ট রয়েছে।'

'হ্যাঁ,' বললে পরাশর, 'লোকগুলোকে ভাল করে দেখো।'

'তাই তো', রেড্ডি সাহেব সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'রঘুনাথও এদের মধ্যে আছে মনে হচ্ছে।'

'এবার নীচের নামগুলো পড়ুন।' পরাশর নির্দেশ দিলে।

পড়ে কিন্তু রঘুনাথের নাম তার মধ্যে পেলাম না।

'রঘুনাথ কি ছদ্মনামে ফিল্মে নামে নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'প্রায় ঠিকই ধরেছেন। শুধু কথাটা একটু উলটে বলতে হবে।' পরাশর তার স্বভাবসিদ্ধ হেঁয়ালি করলে।

'তার মানে?' রেড্ডি সাহেব একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

'মানে রঘুনাথ ছদ্মনামে ফিল্মে নামে না, রঘুনাথেরই ছদ্মনাম নিয়ে অন্য কেউ হাজতে যায়!' পরাশর আমাদের হতভম্ব করে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

'কী বলছেন আপনি!' রেড্ডি সাহেবের কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস।

'যা বলছি তা খোঁজ করে মিলিয়েই দেখুন। ওই ছবির তলায় যার নামটা পাচ্ছেন, সেই বচ্চন সত্যিই ছোটখাটো একজন আর্টিস্ট। রঘুনাথের সঙ্গে তার চেহারার খুব বেশি মিল। রঘুনাথের ফিল্মের নেশা প্রচণ্ড। এই মিল চোখে পড়তেই রঘুনাথ বোম্বাই গিয়ে খোঁজটোঁজ করে বচ্চনের সঙ্গে ভাব করে। রঘুনাথ তাতে ফিল্মে নামতে পারেনি অবশ্য, কিন্তু বচ্চনের সঙ্গে বন্ধুত্বটা গভীরই হয়েছে। রঘুনাথ সুবিধে পেলেই বোম্বাই যায় বচ্চনের সঙ্গে স্ফূর্তি করতে। বচ্চনও মাঝে মাঝে আসে হায়দ্রাবাদে—যেমন এসেছিল বজৌরি খুন হবার সময়ে। খুন হবার রাত্রে বচ্চন কিন্তু হায়দ্রাবাদে ছিল না, ছিল বিদরিতে এক জুয়ার আড্ডায়।'

'আপনি এসব কথা জানলেন কী করে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'বলছি। তার আগে বলুন তো, পুলিশ সেদিন বিদরিতে জুয়ার আড্ডায় যে চড়াও হয়েছিল, সে কি নিজে থেকেই, না কারও কাছে গুপ্ত খবর পেয়ে?'

'ঠিকই তো আপনি ধরেছেন!' রেড্ডি সাহেব বললেন সবিস্ময়ে, 'বিদরির থানায় সেদিন ফোনে একজন ওই গোপন জুয়ার আড্ডার খবর দেয়। পুলিশ সে খবর বিশ্বাস না করলেও একবার দেখতে না গিয়ে পারেনি। গিয়ে অবশ্য সত্যিই জুয়ার আড্ডা পেয়েছিল ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার মধ্যে রঘুনাথও ছিল। পরের দিন সকালে জামিনে সে খালাস পায়।'

'যে ধরা পড়ে ও যে খালাস পায় সে রঘুনাথ নয়, বচ্চন।' পরাশর এবার বোঝালে, 'বচ্চনের তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ তার নিজের নামে কোনও বদনাম হল না। আর রঘুনাথ সামান্য একটু পুলিশের কেসে পড়ে অন্য জায়গায় থাকার অছিলায় খুনের দায়ের আসামি হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলে।'

'এখন বলুন, এসব আপনি জানলেন কী করে?' জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'প্রথমত আঁচ করলাম, রঘুনাথের ঘরে ফিল্মের কাগজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বচ্চনের সঙ্গে রঘুনাথের চেহারার মিল দেখে, ও বচ্চনের ছবি যাতে আছে অধিকাংশ সেইরকম কাগজ ওখানে পেয়ে। রঘুনাথ যে এই কাগজগুলোই সব কেনে ও রাখে তার কোনও তাৎপর্য আছে বলে মনে হল। দ্বিতীয়ত একেবারে যাকে বলে সরেজমিনে তদন্ত করে জানলাম, বিকেলবেলা ম্যাজিস্টিক সিনেমা হল-এ গিয়ে সেখানকার একজন গেটকিপারকে বচ্চনের এই ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে।'

'কী গোলমেলে কথা বলছ?' আমিই এবার বললাম, 'ম্যাজিস্টিক সিনেমা হল-এর সঙ্গে এ ব্যাপারের কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এই—' পরাশর কাগজটারই আর ক-টা পাতা সরিয়ে একটা সিনেমার টিকিটের আধখানা অংশ বার করল। তারপর আমাদের হতভম্ব অবস্থাটা যেন উপভোগ করেই বললে, 'যেদিন বজৌরি খুন হল এটা সেই দিনেরই সন্ধ্যা ছ-টার শো-র টিকিট একদিনের জন্যে সে তারিখে পুরনো "আদমী" ছবিটা ম্যাজিস্টিকে দেখানো হয়েছিল। আর সে ছবি দেখতে গেছল

রঘুনাথ। এ টিকিটের অর্ধাংশটা যে তার বিরুদ্ধে মারাত্মক সাক্ষী হয়ে উঠতে পারে জানলে নিশ্চয়ই ছিঁড়ে কোথাও ফেলে দিত। এটা আমাদেরই ভাগ্যে এই কাগজটার মধ্যে থেকে গেছল।'

'ও, এই জন্যেই সেদিন "আদমী" ছবিটার কথা রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ও ছবিটা আমার নিজেরই প্রিয়। একদিনের জন্যে এখানে দিয়েছিল, আমি জানতাম। টিকিটের ছেঁড়া অংশটা পেয়ে তারিখ দেখে বুঝতে পারি যে, ওই "আদমী"-র শোয়েরই টিকিট। আজ বিকেলে ম্যাজিস্টিক সিনেমায় গিয়ে ওই টিকিট যে ক্লাসের, তার গেট-কিপারকে জিজ্ঞেস করেই জানতে পারি যে, রঘুনাথ সেদিন সিনেমায় সত্যিই এসেছিল। রঘুনাথ প্রায়ই সিনেমায় যায়। গেটকিপার তাকে চেনে।'

রেড্ডি সাহেব খানিক গম্ভীর হয়ে আপন মনে কী ভেবে নিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! রঘুনাথ এই হায়দ্রাবাদেই থেকে পুলিশকে এভাবে ধোঁকা দিয়েছে। অথচ আমরা কিছুই জানতে পারিনি!'

'জানতে কিন্তু পারতেনই। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তা হলে বিদরিতে যে ধরা পড়েছিল, সে যে রঘুনাথ নয় এ খবর গোপনে দু-এক দিনের মধ্যেই পাবেন।'

'বলেন কী!' রেড্ডি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এ খবর আমাদের কেউ গোপনে জানাবে?'

'হ্যাঁ, বিদরির জুয়ার আড্ডার খবর যেমন জানিয়েছিল, তেমনই?'

পরাশরকে তার পরের মুহূর্তে বাকসিদ্ধ বলে মনে করলে কোনও দোষ হত না।

রেড্ডি সাহেব এই হোটেলে আমাদের কাছে যে আসবেন থানায় জানিয়ে এসেছিলেন নিশ্চয়। একজন কনস্টেবল জরুরি চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেই মুহূর্তেই দেখা করতে এল। চিঠিটা খুলে পড়ে কনস্টেবলকে বিদায় করে রেড্ডি সাহেব ভ্রূকুটির দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ চিঠিতে কী লিখেছে জানেন?'

'কী? বিদরির ধরা পড়া রঘুনাথ যে জাল তাই কেউ গোপনে ফোনে জানিয়েছে, এই খবর তো?'

'ঠিক তাই! ধন্যবাদ, মিস্টার বর্মা। আমি চললাম। আর এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই।' রেড্ডি উঠে দাঁড়ালেন।

'অত ব্যস্ত হবেন না, রেড্ডি সাহেব!' পরাশর হেসে বললে, 'আপনার খুনি পালিয়ে যাচ্ছে না। তার ঘোরালো প্যাঁচ কেউ কাটতে পারে না, এই অহংকারে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। আপনি শুধু যাবার সময় এই লেফাফার মধ্যে যে কাগজটুকু আছে, তা আপনাদের ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে দিয়ে যাবেন তো। পরীক্ষা করে কালই সকালে যাতে রিপোর্টটা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন।'

'কী আছে ওতে?' আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'কালই সকালে জানা যাবে,' বলে হেসে পরাশর কথাটা চাপা দিলে।

রেড্ডি সাহেব খামটা নিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে হায়দ্রাবাদের স্থানীয় খবরের কাগজটা খুলেই পরাশর উত্তেজিতভাবে বললে, 'দেখছ রেড্ডি সাহেবের কাণ্ড!'

যে খবরটা দেখে পরাশরের এত উত্তেজনা, তা পড়ে আমিও একটু উত্তেজিত না হয়ে পারলাম না। খবরটা বজৌরিকে খুন করার দায়ে রঘুনাথের গ্রেপ্তার হওয়ার।

পরাশর সেই তখনই বাটকারার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

'একটা বাটকারা চাই এখুনি,' বললে উত্তেজিতভাবে।

প্রথমটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বললে?'

'একটা বাটকারা।'

সেই বটিকারার জন্য শেষ পর্যন্ত থানায় রেড্ডি সাহেবকে ফোন করলে আমার সামনেই। ফোন করে যা বললে তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

একটা বড় নির্ভুল দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ইফতিকার সাহেব, রামসহায় এমনকী হাজত থেকে অনুমতি করিয়ে রঘুনাথকেও নিয়ে আমরা বজৌরির বাড়িতে একঘণ্টা বাদে জড়ো হচ্ছি এই ব্যবস্থার কথাই ফোনে হল শুনলাম। কাচের দোকান থেকে তার সেই বায়না করা কাচটা আর দোকানের মালিককেও আনবার কথা সে বলে দিলে, আর সেই সঙ্গে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্ট।

এক ঘণ্টা বাদে বজৌরির বাড়িতে আমরা সবাই গিয়ে উপস্থিত হলাম।

পরাশর ছাড়া আর সকলেরই কেমন দিশাহারা ভাব। পরাশর কী যে করতে চায় কেউই আমরা জানি না। ইতিপূর্বে পরাশরের কাছে সাহায্য পাবার কৃতজ্ঞতাতেই নিশ্চয় রেড্ডি সাহেব এত তোড়জোড় করে সবকিছু জোগাড় করে এনেছেন। তাঁর মুখ দেখে কিন্তু মনে হল ব্যাপারটা তাঁর কাছে পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

পরাশর প্রথমেই যা করল, তাকে পাগলামি ছাড়া আর কী বা বলা যায়। বজৌরি সাহেবের ঘরের কোনও কিছু এ পর্যন্ত নড়ানো হয়নি। ভাঙা কাচগুলো পর্যন্ত যেখানে যেমন তেমনই ছড়ানো ছিল। পরাশরের নির্দেশে সেই সমস্ত ভাঙা কাচের টুকরো খুঁটে খুঁটে তুলে একটা পাল্লায় রাখা হল, আর-একটা পাল্লায় সেই দোকানের আস্ত কাচটা।

ওজন করতে কিন্তু আস্ত কাচের দিকের পাল্লাটাই ঝুলে পড়ল।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু পরাশর কাচের দোকানের মালিকের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করে বললে, 'কী মশাই, আপনি-না ছ-টা এক জাতের এক মাপের সরেস কাচের জানলা আপনার ছিল বলেছিলেন? এই ঘরের একটা কাচের গুঁড়োও আমরা ফেলিনি, সব পাল্লাতেই তুলেছি। তবে এদিকটার ওজন এত হয় কেন? আপনার তা হলে ঠকাবার ব্যবসা?'

কাচের দোকানের মালিক পুলিশের তলবেই এসে এতক্ষণ একটু ভয়ে ভয়েই ছিলেন, কিন্তু এ কথায় একেবারে জ্বলে উঠলেন। 'আমি ঠকাবার ব্যবসা করি। চলুন আমার দোকানে। বম্বে থেকে যাদের অর্ডার দিয়ে এসব কাচ আনিয়েছি, তার চালান আমার কাছে এখনও আছে। হেঁজিপেঁজি কোম্পানির মালও নয়। দেখবেন চলুন, সব এক মাপের এক দরের জিনিস কিনা!'

'আহা, অত চটছেন কেন?' পরাশর এবার তাঁকে শান্ত করলে, 'আপনার মাল যদি ঠিক হয়, তা হলে গোলমাল এখানে কিছু আছে। এ ঘরে কোথাও কাচের টুকরো আর পড়ে নেই তো!'

পরাশরের কথায় আবার তন্ন তন্ন করে ঘরের চারিদিকে দেখা হল। কোথাও একটা কণাও আর নেই।

এই সময়ের মধ্যে ইফতিকার সাহেবই প্রথম বিরক্ত হয়ে উঠে বলে ফেললেন, 'এসব ছেলেখেলার জন্যে আমায় এখানে ডেকে আনার মানে কী আমি জানতে চাই, রেড্ডি সাহেব!'

'পারবেন! পারবেন! এখুনি জানতে পারবেন!' রেড্ডি সাহেবের বদলে পরাশরই জবাব দিলে, 'আপনার জুতোর তলায় যেটুকু কাচের গুঁড়ো ছিল, তা ও আমি চেঁচে এনেছি এই যে!'

পরাশর পকেট থেকে একটা ছোট কাগজের মোড়ক বার করে সকলকে খুলে দেখাল। কাগজের মধ্যে প্রায় ধুলোর মতো অতি সামান্য ক-টা কাচের গুঁড়ো। পরাশর কাগজটা ভাঙা কাচের পাল্লাটার ওপর ঝেড়ে দিয়ে আবার বললে, 'আপনি সেদিন রাত্রে কেন একলা লুকিয়ে এসেছিলেন তা এখুনি অবশ্য বলবার দরকার নেই।'

ইফতিকার সাহেবের মুখ-চোখ আগুন হয়ে উঠল। তিনি তীব্র স্বরে বললেন, 'না, এখুনি আমি বলতে চাই। বজৌরি সেদিন রাত্রে আমায় গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। তাই আমি এসেছিলাম।'

'বজৌরি কি চিঠিতে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল?' পরাশরের গলায় বিদ্রূপের স্বর।

'না, তিনি ফোন করেছিলেন। রাত এগারোটার পর। বলেছিলেন বিশেষ জরুরি দরকার। তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন। তাই উইলটা সম্বন্ধে এখুনি ব্যবস্থা করতে চান। আমি যেন রাত বারোটার মধ্যে নিশ্চিত ওখানে যাই।'

'আপনি তাই গেছলেন। ভাল। কিন্তু ফোনে বজৌরির গলা আপনি চিনতে পেরেছিলেন?'

'না, একটু অন্যরকম লেগেছিল। ফোনে অনেকের গলা বদলে যায়, তা ছাড়া ভেবেছিলাম অসুস্থ বলে গলাটা ওরকম হয়েছে।'

'ওঃ, ভেবেছিলাম!' পরাশর যে রকম ব্যঙ্গের স্বরে কথাটা বললে তাতে ইফতিকার সাহেবের গায়ে জ্বালা ধরা স্বাভাবিক।

তিনি আগুন হয়েই বললেন, 'আমি কি মিথ্যে কথা বলছি!'

'যা বলেছেন তার সত্য-মিথ্যা এখুনি প্রমাণ হবে।' এবার যেন নরম সুরেই পরাশর বললে, 'কিন্তু দাঁড়িপাল্লার রহস্যটার তো মীমাংসা হচ্ছে না? আচ্ছা এইটা দিয়ে দেখা যাক।'

পরাশর পকেট থেকে আর একটা কাগজের মোড়ক বার করে, তা থেকে দু টুকরো কাচ পাল্লার মধ্যে ফেলল।

'আশ্চর্য! সেই দুটো টুকরো কাচেই পাল্লা দুটো প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। ওপরের কাঁটার যেটুকু তফাত রইল তা ধর্তব্যই নয়।'

'ওটা কোন কাচের টুকরো আপনি দিলেন?' জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'এই কাচেরই টুকরো! পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পারেন।' পরাশর ভালমানুষের মতো জবাব দিলে পরাশর।

'তা বুঝলাম। কিন্তু ও টুকরো আপনার পকেটে গেল কোথা থেকে?'

'ওই বাইরে থেকে কুড়িয়ে আমি পকেটে রেখে দিয়েছিলাম,' বলে একটু হেসে পরাশর বললে, 'হ্যাঁ রেড্ডি সাহেব, আমি ওখানে সেদিন পায়ের দাগ খুঁজিনি। খুঁজছিলাম কাচের টুকরো।'

'ওই বাইরে কাচের টুকরো খুঁজছিলেন।' রেড্ডি সাহেব বিমূঢ়—'ওই বাইরে কাচের টুকরো যাবে কী করে?'

'সেটাই তো ভাববার!' বলে পরাশর হাসল।

'আপনি খুব বাহাদুর, মিস্টার বর্মা!' এবার রামসহায়ের তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠ শোনা গেল—'কিন্তু আপনার বুদ্ধির তারিফ করবার জন্যে এভাবে বসে থাকাটা আমাদের কাছে অসহ্য। যা করতে চান, তাড়াতাড়ি করুন। কিছু না পারেন, আমাকেই গ্রেপ্তার করুন।'

'তা-ই করলাম, রামসহায়জি!' পরাশরের স্বর এবার বজ্রকঠিন।

আমরা সবাই অবাক হলেও রেড্ডি সাহেব এক নিমেষে দেখলাম পকেট থেকে হাতকড়া বার করে রামসহায়ের সামনে ধরেছেন।

রামসহায় সেদিকে চেয়ে তীব্র স্বরে বললে, 'কী করছেন আপনারা, জানেন?'

'জানি বই কী, রামসহায়জি!' পরাশর তেমনই কড়া গলায় বললে, 'আমরা কী করছি জানি, আপনি কী করছেন তা-ও। এক ঢিলে লোকে দু পাখিই মারতে চায়। আপনি একেবারে তিন পাখি মারবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম মামা বজৌরিকে খুন। দ্বিতীয়ত, বজৌরির একান্ত বন্ধু হিতৈষী ও সহায় ইফতিকার সাহেবের মতো শরিফ ইমানদার মানুষকে অপদস্থ করে ট্রাস্টিগিরি থেকে সরানো। তৃতীয়ত, আপনার একমাত্র পথের কাঁটা রঘুনাথকে খুনের দায়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সরিয়ে দেওয়া। রঘুনাথের নামে যেসব কথা লাগিয়ে আপনি আপনার মামার কান ভারী করেছিলেন সেসব এতদিনে মিথ্যে বলে ধরে ফেলেই তিনি উইল বদলাতে চাইছিলেন। উইলের সেই খশড়া গোপনে দেখে নিয়ে আর রঘুনাথকে তার বন্ধু বচ্চনের সঙ্গে দেখেই

আপনার মনে এই শয়তানি ফন্দি আসে। মামাকে হত্যা করবার দিন ঠিক করে আপনি প্রথমে রঘুনাথকে সে রাত্রে, রাত বারোটা নাগাদ আপনাদের বাড়ির বাইরে এসে অপেক্ষা করতে বললেন। সম্ভবত তাকে বুঝিয়ে ছিলেন যে ইফতিকার সাহেব ওই সময়ে বজৌরির ডাকে নতুন উইল বদলাবার জন্যে আসবেন। সে নতুন উইলে রঘুনাথকে বঞ্চিত করা হবে বলেই বুঝিয়েছিলেন। তাই ইফতিকার সাহেবকে ওখানে ঢুকতে না দিলে বা ঢোকার পরও উইলের খশড়া নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় ধরে খশড়া কেড়ে নিলে কিছুদিনের জন্যে এখন উইল করা অন্তত বন্ধ হবে। কিছুদিন বন্ধ করতে পারলেই আপনি বুঝিয়েসুঝিয়ে মামার মত বদলাতে পারবেন বলে রঘুনাথকে আশা দিয়েছিলেন। রঘুনাথ জুয়াড়ি হলেও সত্যিই সরল। সে আপনার কথা বিশ্বাস করেছিল। এমনকী ইফতিকার সাহেবের ওপর হামলা করা সত্ত্বেও ধরাছোঁয়ার মধ্যে না থাকায় যে ফিকির আপনি রঘুনাথকে বলেছিলেন, মজার বলে তা-ও সে কোনওরকম সন্দেহ না করে কাজে লাগিয়েছিল। তার বন্ধু বচ্চন হায়দ্রাবাদে তখন এসেছে। বচ্চন ফুর্তিবাজ ফিল্মের লোক। সে এ মজার ফন্দিতে এককথায় রাজি হয়েছিল তার কোনও লোকসান নেই জেনে। কী রঘুনাথজি, ঠিক বলছি কি না?'

রঘুনাথের দিকে ফিরে একথা জিজ্ঞাসা করতেই সে থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। রামসহায় আমায় বুঝিয়েছিল যে মামাজি আমার ওপরে খেপে গিয়ে এখুনি উইল বদলে ফেলতে যাচ্ছেন। দু দিনের জন্যে তাঁকে ঠেকাতে পারলে আবার তাঁকে ঠান্ডা করা যাবে। ও যে আমার বিরুদ্ধে মামাজিকে মিথ্যে করে লাগিয়েছে, আমি কোনওদিন ভাবতেও পারিনি।'

তাকে হাত তুলে থামিয়ে পরাশর আবার রামসহায়ের দিকে ফিরে বললে, 'সেই রাত্রেই আপনি মামা বজৌরির গলা যথাসম্ভব নকল করে ইফতিকার সাহেবকে ফোন করেন। ইফতিকার সাহেব ফাঁদে পড়তে এলে ভালই, না এলেও আপনার কোনও ক্ষতি নেই। ফোন করে এসেই আপনি নিঃশব্দে মামার ঘরে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েন।'

একটু থেমে রেড্ডি সাহেবের দিকে চেয়ে পরাশর বললে, 'দেখি ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্টটা।'

রেড্ডি সাহেব পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পরাশরের হাতে দিলেন। পরাশর সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, 'আপনি যে মামার ঘরে খাটের তলায় লুকিয়েছিলেন এই তার অকাট্য প্রমাণ।'

'কী!' রামসহায় চিৎকার করে উঠল।

'হ্যাঁ, আপনি মেয়েদের মতো রাত্রে কোল্ড ক্রিম মাখেন। সেদিনও মেখেছিলেন। খাটের তলায় ঘাপটি মেরে থাকবার সময় আপনার মুখের কোল্ডক্রিম মেঝেতে একটু লেগেছিল। আমি সেদিন ঘরটা পরীক্ষা করবার সময় ওই দাগ দেখে ফেলে একটা কাগজে তা ঘষে তুলে নিয়ে পরে ল্যাবরেটরিতে পাঠাই। এই ল্যাবরেটরির রিপোর্ট। আপনি যে দামি বিশেষ ব্রান্ডের কোল্ড ক্রিম মাখেন তারই ছোপ ছিল খাটের তলায়।'

'হতে পারে না। লাগতে পারে না দাগ মেঝেয়!' রামসহায় চিৎকার করে উঠল, 'সেদিন ক্রিম মেখে আমি ওঘরে—'

রামসহায় হঠাৎ চুপ করার সঙ্গেই খুট করে দু-বার শব্দ হল। দেখলাম হাতকড়া দুটো এতক্ষণে রেড্ডি সাহেব রামসহায়ের হাতে এঁটে দিয়েছেন।

রামসহায় কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে নিজের নির্বুদ্ধিতায়। পরাশর হেসে উঠে বললে, 'এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, রামসহায়জি। আপনার নিজের মুখে এই ধরা দেওয়াটুকুর জন্যে। এ ল্যাবরেটরির রিপোর্ট কিছু নয়। কোল্ড ক্রিম আর কোথায় পাব, আমি নিজে একটু মাথার তেল একটা কাগজে লাগিয়ে মিছিমিছি ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরির এ রিপোর্টেও কোল্ড ক্রিমের কথা কিছু নেই। আপনি অত্যন্ত ধড়িবাজ। আপনার ঘরে কোল্ড

ক্রিমের কৌটো দেখে আপনার ওপরও টেক্কা দেবার এই ফন্দি আমার মাথায় আসে। ফন্দিটা সফলও হয়েছে। অবশ্য কী করে আপনি মামার ঘরে ঢুকেছিলেন এখনও জানি না। যদি ইচ্ছা করেন, বলতে পারেন। না বললেও কোনও ক্ষতি নেই। কারণ, কী করে ঘরে ঢুকেছিলেন, না জানলেও কী আপনি করেছিলেন তা আমরা জানি। আপনি মামার ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর খাটের গোপন খোপ থেকে রিভলবার বার করে প্রথম তাঁকে গুলি করেন, তারপর ভেতরে থেকে জানলাটা ঘা মেরে ভাঙেন। জানলার যা ব্যবস্থা ছিল তাতে বাইরে থেকে ধাক্কা দিলেই আলো জ্বলবে ও সাইরেন যন্ত্র বাজবে। ভেতর থেকে ভাঙায় সেসব কিছু হয়নি। তারপর জানলাটা বাইরে থেকে ভাঙা হয়েছে বোঝাবার জন্যে আপনি বাইরের সমস্ত কাচ যতদূর সম্ভব তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভেতরে এনে ফেলেন। তা সত্ত্বেও দুটো টুকরো আপনার নজরে পড়েনি। তাতে কিছু ক্ষতিও হত না, যদি না জানলাটা ভেতর থেকেই ভাঙা হয়েছে সন্দেহ করে আমি বাইরে টুকরো খুঁজতে না যেতাম। কাচের টুকরো ভেতরে সব ফেলে আপনি বিদরির থানায় ফোন করেন গোপন জুয়ার আড্ডার খবর দিয়ে জাল রঘুনাথকে ধরাবার জন্যে। পরে সেদিন আবার সে রঘুনাথ যে জাল সে খবর আপনিই জানিয়েছেন। বিদরিতে ফোন করার পর সে রাত্রে ইফতিকার সাহেব ও রঘুনাথকে একেবারে যাকে বলে অকুস্থলে সন্দেহজনক অবস্থায় ধরবার জন্যে আপনি নিশ্চয় এখানকার থানাতেও ফোন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কেন যে ফোনে ধরতে পারেননি, বলতে পারি না।

'ফোন তখন সম্ভবত এনগেজড ছিল। কারণ ইফতিকার সাহেব ওই সময়েই আমায় ফোন করেছিলেন থানায়—আমার মনে আছে,' বলেন রেড্ডি সাহেব।

'ইফতিকার সাহেব।' পরাশর একটু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তা হলে আপনিই ফোনে পুলিশের কাছে খবরটা দেন।'

'হ্যাঁ,' বললেন ইফতিকার সাহেব, 'আমি সে রাত্রে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে ওইটুকু হেঁটে আসতে আসতেই দেখতে পাই বজৌরি সাহেবের ঘরের আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। বজৌরির আমার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকার কথা। সুতরাং হঠাৎ আলো নেবার মানে বুঝতে না পেরে আমি একটু চিন্তিতভাবে তাঁর জানলার দিকেই আগে যাই। আমার কাছে রাত্রে সব সময়েই টর্চ থাকে। সেই টর্চের আলো ফেলে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাই। জানলার কাচ ভাঙা আর ভেতরে যেভাবে বজৌরির রক্তাক্ত দেহ খাটের ধারে পড়ে আছে তাতে খুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে আর না দাঁড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এসে রেড্ডি সাহেবকে ফোন করি। আমার জুতোর তলায় কাচের গুঁড়ো যদি লেগে থাকে তখনই লেগেছিল।'

'সে আমি জানি,' বললে পরাশর, 'আর তাই জন্যেই আপনাকে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে তক্ষুনি বাদ দিয়েছি। রঘুনাথের জুতো আমি পরীক্ষা করে দেখিনি। কিন্তু তাতে কাচের গুঁড়ো বোধহয় পাওয়া যাবে না।'

'না। সে রাত্রে মামাজির ওখানে যেতে আর আমার ইচ্ছেই হয়নি। "আদমী" ছবিটা দেখে মনটা এমন ভরে গিয়েছিল যে, ওরকম নোংরা কাজ করতে যেতে আর প্রবৃত্তিই হয়নি। ভেবেছিলাম, মামাজি যদি অন্যায় করে আমায় উইলে বঞ্চিত করতে চায় তো করুক। মামাজি যে সেদিন খুন হয়েছেন আমি কল্পনা করতেও পারিনি।'

পরাশর সহানুভূতির সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ, আপনি কী করে জানবেন যে, আপনার শয়তান ভাই খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় মামাকে গুলি করে মারছে তখন।'

'ঘুমন্ত অবস্থায় মেরেছি!' রামসহায় গলায় বিষ ঢেলে বলে উঠল, 'তোমার মতো ছুঁচো গোয়েন্দা ওর চেয়ে বেশি কী বুঝবে। শোনো তা হলে আহাম্মক, আমি বাইরে থেকে ক-টা ন্যাকড়া আর ভিজে খড়ে আগুন ধরিয়ে তার ধোঁয়া দরজার ফাঁক দিয়ে হাওয়া করে মামার ঘরে

চালিয়ে দিয়ে "আগুন আগুন" বলে চিৎকার করে মামার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। মামা ভয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠে দরজা খুলতেই অন্ধকারে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে খাটের মাথার খোপ থেকে রিভলবার বার করে তাঁকে গুলি করেছিলাম। বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আমাকে উইল থেকে বাদ দিলে কী হয়।'

পরাশর হেসে উঠে বললে, 'তারপর সে উইলের খশড়াটাও ঘর থেকে সরিয়ে নষ্ট করে বা পুড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়।' দাঁতে দাঁত চেপে বললে রামসহায়।

পরাশর গম্ভীরভাবে একবার বললে, 'পাষণ্ড বদমায়েশদের দণ্ডই তাদের কাল হয় এই আমাদের বাঁচোয়া, নইলে কোনও গোয়েন্দাই বোধহয় তাদের চুলের ডগাও ছুঁতে পারত না।'

pathagar.net

ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা

pathagar.net

ঘুড়ি ওড়ালেন পরাশর বর্মা

এক-এক সময়ে আফসোস হয়।

হ্যাঁ, সত্যিই আফসোস হয় পরাশরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বলে।

পরাশরের সঙ্গে আমি অবশ্য নিজে যেচে আলাপ করতে যাইনি। সে নিজেই এসেছিল তার কবিতার বাতিকের ঠেলায়।

সেদিন সে অবশ্য শুধু একটা ব্লটিং প্যাড দেখে আমার প্রেসের মস্ত বড় একটা রহস্যের সমাধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে যাওয়াটা আমারই অপরাধ।

বন্ধু সুরেশ্বরবাবুর ডাক বাকসের সেই তিনটি রহস্যময় চিঠির সমস্যা নিয়ে তখন যদি অত খুঁজে পেতে খিদিরপুরের একটা বাড়িতে না যাই, তা হলে পরাশরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই আর হয় না।

কুমতি ক্লাবের কথা অবশ্য তা হলে অজানাই থাকে আর পরাশরের অনেক কীর্তির সঙ্গে নিজে জড়িয়ে পড়ি না, কিন্তু তাতেও খুব লোকসান কি হয়? সুখের চেয়ে সোয়াস্তি যে অনেক ভাল, সে কথা কি মিথ্যে?

হঠাৎ মেজাজ এমন বেগতাল কেন, এবং কী নিয়ে, তা অবশ্য সবাই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তা মেজাজ বেগড়াবে না!

পরাশরের সঙ্গে বুনো হাঁসের পেছনে অনেকবারই ছুটতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সে হয়তো অনেকবারই ঘোড়ার চালে কিস্তিমাতের কেরামতি দেখিয়েছে। কিন্তু ধকলটা পুরোপুরি সইতে হয়েছে আমাকেই।

যত আজগুবি ধান্দায় এ পর্যন্ত সে আমায় টেনে নিয়ে গেছে তার মধ্যে এবারেরটিই কিন্তু একেবারে মোক্ষম।

ধারে কাছে কোথাও হলে তো বুঝতাম। এমন জায়গায় যেতে হয়েছে যার নাম পর্যন্ত এর আগে কখনও শুনিনি। আমাদের এই উত্তর ভারতের ক-জনই বা নেহাত টাইম টেবলের পোকা না হলে সে নাম জানে।

একেবারে নিতান্ত হেলাফেলার ছোটখাটো স্টেশন নয়। ভিকারাবাদ জংশন। তবু জানা না থাকলে সমস্ত অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে গাইড তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ নাম বার করা সহজ হত না। আর কোথায় সে স্টেশন।

কলকাতা থেকে যাওয়াই একটা জটিল ব্যাপার। প্রথম হাওড়া থেকে দুপুর বারোটায় চড়তে হয়েছে হাওড়া হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেসে।

নামে এক্সপ্রেস। গদাইলসকরি চালে পুরো প্রায় দু-টি দিন গর্ভযন্ত্রণা দিয়ে সে ট্রেন সকাল সাতটায় গিয়ে পৌঁছেছে সেকেন্দ্রাবাদে। পৌঁছবার কথা আরও ঘণ্টাখানেক আগে। তবে মাত্র এক ঘণ্টা যে লেট করেছেন সেই ভাগ্যি।

ট্রেন থামতে না থামতে নিজেরাই হোল্ডঅল সুটকেস ঘাড়ে করে ছুটতে হয়েছে আর-এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরবার জন্যে। সে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আমাদের জন্য মিনিট দশেক ছাড়তে দেরি

pathagar.net

করেছেন বলে কোনওরকমে মালপত্রগুলো তুলে পড়ি-কি-মরি করে তাতে উঠতে পেরেছি। এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখনও অন্তত সওয়া তিনটি ঘণ্টা আমাদের কাটাতে হবে। তারপর দেখা পাব ভিকারাবাদ জংশনের।

এই ভিকারাবাদ জংশনে যাবার জন্যই তিনদিন ধরে এত হয়রানি। মাথায় পোকাটা নড়ে ওঠবার পর পরাশর আমায় এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয়নি। বৃহস্পতিবার রাত বারোটার সময় তার ফোন পেয়ে প্রথম ব্যাপারটা ঠাট্টাই ভেবেছিলাম। বারোটা বেজে তখন মিনিট দুয়েক হবে।

রিং শুনে শোবার ঘর থেকে উঠে এসে ফোনটা ধরতে হয়েছে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গেই। রং নম্বর বলেই তখন ধরে নিয়েছি। কী রকম তেতে জবাবটা দেব মনে মনে তাও ভাবছি।

কিন্তু রং নম্বর নয়। ঠিক ডাকই এসেছে।

'কৃত্তিবাস? ঘুমোচ্ছিলে বুঝি! হ্যাঁ, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। কাল দুপুরেই রওনা হতে হবে। বেশি কিছু নয়, দিন সাতেকের মতো যা লাগে, নিয়ো। টিকিট আমি করে রেখেছি।'

একটানা এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যে জবাবে কিছু বলবার মতো এতটুকু ফাঁক পরাশর রাখেনি। তার ভাষণ শেষ হবার পর তাই একটু হেসে বলেছি, 'ঠিক আছে। আমিও বাকস প্যাঁটরা বেঁধে প্রস্তুত। তবে শীতের পোশাক নেব, না গরমের তাই শুধু ভাবছি। পুরি যাচ্ছ, না দার্জিলিং।'

'না না, পুরি-দার্জিলিং নয়,' পরাশর নেহাত ঠান্ডা গলাতেই জানিয়েছে 'যাচ্ছি ভিকারাবাদ। যেতেই প্রায় দু দিন লাগবে।'

'কোথায় যাচ্ছ?' এবার গলাটা আপনা থেকে চড়া হয়ে উঠেছে, 'কী বললে? ভিকারাবাদ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভিকারাবাদ। ভিকারাবাদ জংশন। যাক, সে তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি শুধু দশটার আগে তৈরি থেকো। আমি ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে তোমায় তুলে নেব।'

এর পর পরাশরের ওদিকে ফোন নামিয়ে রাখবার শব্দ।

মেজাজটা তখন কী হয়েছে তা বোধহয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

পর পর অন্তত পাঁচবার পরাশরের নম্বর ডায়াল করেছি। একবার তাকে ফোনে পেলে যা বলব তখন ঠিক করেছি, তার জ্বালায় রিসিভারই হয়তো চিড় খাবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হল কই।

পরাশর তার রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু ক্রেডলেই বোধহয় নয়। বার বার চেষ্টা করেও কানেক্ট করতে পারলাম না।

তা সত্ত্বেও সকালবেলা ঠিক সময়েই তৈরি হয়ে থেকে তার আনা ট্যাক্সিতে উঠে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা ধরলাম কেন!

সেইখানেই তো গলদ। পরাশরের কিছু সম্মোহন মন্তর-টন্তর জানা আছে নিশ্চয়। যতই ফোঁস ফোঁসাই, শেষ পর্যন্ত তার কথা ঠেলতে পারিনি। অন্তত এখনও নয়।

ট্রেনে উঠে বসবার পর আমাদের এই আজগুবি অভিযানের কারণটা শোনবার পর কিন্তু সত্যিই তখুনি চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে নেমে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। বলে কী পরাশর? সত্যিই খেপে গেছে নাকি?

সেই দু-দিনের রাস্তা ভিকারাবাদ জংশন আমরা যাচ্ছি কী কারণে তা সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ বুঝি ভাবতেও পারবে না।

যাচ্ছি জাতিস্মর একজনের খোঁজে!

পরাশরের মুখে কথাটা শুনে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিলাম। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। দিনের বেলা হলেও আমাদের কুপেটায় আর কেউ ওঠেনি। পরাশর সারা দিন রাত্রের জন্যই সেটা রিজার্ভ করেছে।

কামরায় আর কেউ থাকলে আমার মুখের চেহারাটা তার নিশ্চয় নজর এড়াত না। বিস্ময়

বিমূঢ়তার সঙ্গে সেখানে বেশ তীব্র একটা ক্ষোভও ফুটে উঠেছিল। এমনই একটা আজগুবি ধান্দায় জরুরি সব কাজকর্ম ফেলে পরাশরের সঙ্গে আমায় যেতে হচ্ছে! পরাশরের সত্যিই কোনও কাণ্ডজ্ঞান কি নেই?

কিন্তু এই নিয়ে রাগারাগি করে তো লাভ নেই। সত্যিই চেন টেনে নেমে যেতে তো পারব না। নিজেকে সামলে তাই যথাসম্ভব শান্ত গলাতেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'জাতিস্মরটি কে? আর তার খোঁজে ওই অতদূর যাওয়া!'

'জাতিস্মর তো আমার সুবিধামতো আমার বাড়ির পাশে জন্মায় না।' পরাশর হেসে বলেছে, 'যেখান থেকে তার খবর আসে সেখানেই তাই যেতে হয়।'

'কিন্তু এ খবর তোমার কাছে এল কী করে?' একটু সন্দিগ্ধভাবেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'জাতিস্মর খোঁজবার জন্যে তোমার কি চর লাগানো আছে নাকি?'

'চর লাগানো থাকবে কেন?' পরাশর বলেছে, 'খবরের কাগজ থেকেই যা জানবার জেনেছি।'

'খবরের কাগজ!' ইতিমধ্যে অবাক হতে হয়েছে এবার—'খবরের কাগজে এ খবর বেরিয়েছে! আমরা কি খবরের কাগজ পড়ি না!'

'আহা, এখানকার কাগজ তো নয়!' পরাশর আমায় বুঝিয়েছে, 'ওদিকের একটা উর্দু কাগজ, তা ও দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক। গুলবর্গা থেকে বার হয়।'

'সেই উর্দু কাগজ তুমি পড়েছ? আর তার খবরেই বিশ্বাস করে আমাকে সুদ্ধ সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছ?' সন্দেহটা গলায় স্পষ্ট করে তুলেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'এ কাগজ তুমি পেলে কোথায়? আর পড়লেই বা কী করে? তুমি উর্দু জানো তা তো জানতাম না।'

'জানি মানে তাকে কি সত্যিকার জানা বলে!' পরাশর বিনয় দেখিয়েছে, 'তবে কোনওরকমে অক্ষর টক্ষরগুলো পড়তে পারি।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এ কাগজ তোমার হাতে এল কী করে?'

পরাশর এবার খানিকক্ষণ চুপ। তখন ট্রেন খড়্গপুর ছাড়িয়ে এসেছে। বর্ষাকালেই রওনা হয়েছি। হঠাৎ বৃষ্টির ছাট আসায় জানলা বন্ধ করতে উঠার ছুতোয় আমার প্রশ্নের জবাবটা সে এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। পরাশর জানলা বন্ধ করে ফিরে আসবার আগেই আবার প্রশ্ন করেছি, 'কই! এ উর্দু কাগজ তোমার কাছে কী করে এল বলছ না কেন?'

'বলছি না মানে', পরাশর আবার ভেতরের সিটে এসে বসে একটু গড়িমসি করে বলেছে, 'মানে, সে কথা আর শুনে কী হবে? কোনওরকমে এসেছে এইটেই ধরে নাও না।'

'না, তা ধরে নিতে যাব কেন?' আমি কড়া হয়েছি এবার—'কাগজটা কী করে তোমার কাছে এসেছে তা বলতে বাধা কী?'

'বাধা এই যে,' পরাশর আমার দিকে চেয়ে একটু যেন কিন্তু হয়ে বলেছে, 'শুনলে তুমি রাগ করবে!'

'শুনলে আমি রাগ করব!' আমি সত্যিই তাজ্জব—'তোমার কাছে কী করে কোন ধাপ ধাড়া গোবিন্দপুর মুলুকের একটা উর্দু কাগজ এসেছে তা জানলে আমার রাগ হবে কেন?'

'মানে—' পরাশর তখনও একটু দ্বিধাগ্রস্ত—'কাগজটা তো ঠিক আসেনি। ওই খবর যে পাতায় বেরিয়েছে সেই পাতাটা কেউ কেটে ওই খবরটা দাগ দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আর তুমি সেই উড়ো খবরের ওপর নির্ভর করে—' হতাশার সঙ্গেই এবার বলেছি, 'না, তুমি সত্যিই সব বিচারের বাইরে।'

'রাগ করলে তো!' পরাশর অপরাধীর মতো আমার দিকে তাকিয়েছে।

'তা রাগ করা কি খুব অন্যায়!' আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছি, 'কোথাকার কার পাঠানো একটা চোখা কাগজের খবরের কাটিং পেয়ে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সব লোপ পেয়ে গেছে! যাক, এখন আর রাগারাগি করে কোনও লাভ তো নেই। খবরটা কী তাই একটু বুঝিয়ে বলো, শুনি।'

দুই

শুক্রবার দুপুরে রওনা হয়ে দু-দিন বাদে আবার সেই দুপুরবেলায় ভিকারাবাদ জংশনে পৌঁছনোর মধ্যে পরাশরের কাছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব জেনে নিয়েছি। পরাশরের কাছে কিছু জানা অবশ্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজে সে কি কিছু বলতে চায়! প্রায় আখের মতো চাপ দিয়ে নিংড়ে তার কাছ থেকে কথা বার করতে হয়েছে।

যা জেনেছি তাতে পরাশরের নির্বুদ্ধিতা আর খামখেয়ালিটাই অবাক করেছে। নগণ্য উর্দু একটা সাপ্তাহিকের যে খবরটা পরাশরের কাছে কাটা কাগজের টুকরোয় পৌঁছয় নেহাত আহাম্মক না হলে কেউ তার কোনও গুরুত্ব বোধহয় দেয় না।

খবরটা এই যে ভিকারাবাদ শহরের একটি মেয়ের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভুত একটা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যদিও তার মাতৃভাষা উর্দু, তবু মেয়েটি নাকি তেলুগু তামিল মরাঠিতে শুধু নয়, হিন্দি ইংরেজিতেও গড়গড় করে কথা বলতে পারে। এ ছাড়া তার আর-একটি অদ্ভুত ক্ষমতা হল পূর্বজন্মের সব কথা স্মরণ করতে পারা। এক জন্ম নয়, এর আগের দু তিন জন্মের কথা সে নাকি সবিস্তারে বলে যাচ্ছে।

এ খবরটুকু পড়লে প্রথমেই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তা না হয়ে পরাশর অন্ধ বিশ্বাসে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভক্তের মতোই সেখানে ছুটে চলেছে।

ট্রেনে আসতে আসতে তার মনের এই মূঢ়তার ঘোর কাটাবার চেষ্টা করিনি, তা নয়। বলেছি, 'তুমি সত্যি এই খবর বিশ্বাস করো। সত্যি জাতিস্মর বলে কিছু আছে বলে তোমার ধারণা?'

'বাঃ, জাতিস্মর নেই!' পরাশর এইবারই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারপর প্যারাসাইকোলজির জয়গান করে তা থেকে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছে, 'এসব তুমি গাঁজাখুরি মনে করো? জন্মান্তর কি সত্যি হয় না?'

'হয়তো হয়,' হাল ছেড়ে দিয়ে এবার বলেছি, 'কিন্তু জন্মান্তরবাদ আর প্যারাসাইকোলজিতে তোমার টান কবে থেকে হল? আগে তো কখনও দেখিনি!'

'আগে না হলে আর পরে হতে নেই?' বলে এক কথায় পরাশর আমায় থামিয়ে দিয়েছে।

বাতুলকে সুবুদ্ধি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা বলে আমিও চুপ করে গেছি।

ভিকারাবাদ নেমে প্রথম একটি হোটেলের সন্ধান করতে হল। কিন্তু ওই অখদ্দে শহরে হোটেল বলতে যা বুঝি তা কোথায়?

শেষ পর্যন্ত স্টেশনের ওয়েটিংরুমই আশ্রয় করে স্নানটান আর সামান্য কিছু খাওয়াদাওয়া সেরে লেফট লাগেজে মাল রেখে শহরে উর্দু কাগজে দেওয়া ঠিকানা খুঁজতে বার হলাম।

খোঁজার জন্য বেশি কেন, কোনওরকম হাঙ্গামাই পোহাতে হল না। কাগজে ঠিকানা দেওয়া ছিল সুরজমহল্লার। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে টাঙ্গায় উঠে সুরজমহল্লার নাম করতেই টাঙ্গাওয়ালা একগাল হেসে বললে, 'জানতে হ্যায়, হুজুর!'

জানতে হ্যায় কী? পুরো ঠিকানা না বলতেই টাঙ্গাওয়ালা জানল কী করে? পরাশর সেই কথাই বলতে গেল। বললে, 'আরে শুধু সুরজমহল্লা শুনেই জেনে গেলে! সুরজমহল্লার মোকান কি একটাই? কোথায় যাচ্ছি তা তো এখনও বলিনি!'

'বলার জরুরত নেই, মালিক।' টাঙ্গাওয়ালা তখন চাবুকের আওয়াজ করে তার বাহনকে চালু করে দিয়েছে—'মোতিকোঠিতে যাবেন তা কি আর জানি না।'

'তুমি জানো!' পরাশরের চেয়ে আমিই এবার বেশি অবাক হলাম। এ শহরে এক জাতিস্মরের খবর জানা গেছে। সেই সঙ্গে এখানকার টাঙ্গাওয়ালারাও অন্তর্যামী নাকি?

সোজাসুজিই এবার টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মোতিকোঠিতেই যে যেতে চাই তা তুমি জানলে কী করে?'

'নতুন আমদানি বহু সওয়ারিই ওই ঠিকানায় যেতে চায় বলে, কেমন?' জবাবটা এবার টাঙ্গাওয়ালার বদলে পরাশরের।

টাঙ্গাওয়ালাও তাতে সায় দেওয়াতে রহস্যটা পরিষ্কার হল। টাঙ্গাওয়ালার কথাতেই জানা গেল গত কয়েকদিন ধরে এ স্টেশনে নেমে অনেক যাত্রীই সুরজমহল্লার ওই মোতিকোঠিতে যেতে চাচ্ছে। ঠিকানাটা তাই তার জানা হয়ে গেছে। কেন যে এত লোক ওখানে যাচ্ছে তা-ও টাঙ্গাওয়ালার অজানা নয়।

'কেন যেতে চায় তা জানো!' পরাশরই প্রশ্ন করলে এরপর।

'হাঁ, মালিক।' টাঙ্গাওয়ালা বেশ একটু গর্বভরে জানালে, 'ভিকারাবাদের মানুষ হয়ে এ কথাটা জানব না। সারা শহরে কে না জানে এ কথা।'

'আচ্ছা, কী জানো ঠিক করে বলো তো!' আমি এবার জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

লোকটা তার ছিপটি নাড়তে নাড়তেই মুখ ফিরিয়ে একবার আমায় যেন একটু সন্দিগ্ধ ভাবে দেখে বললে, 'আপনাকে আর আমি কী বলব হুজুর! কোথা থেকে এত কষ্ট করে আপনারা কি কিছু না জেনে এখানে এসেছেন!'

টাঙ্গাওয়ালাকে এরপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে হল না।

জিজ্ঞাসা করলেও সুরজমহল্লার মোতিকোঠিতে গিয়ে যা দেখে আমি অন্তত সত্যিই অপ্রত্যাশিত একটা চমক পেলাম তা সে বলতে পারত কি না সন্দেহ।

পরাশরের কাছে এত সব শুনেটুনে এসেও মোতিকোঠিতে জাতিস্মর বলে দাবি করা মেয়েটিকে দেখবার পর সত্যিই রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম।

ভিকারাবাদ স্টেশনে নামবার পর যা মনে হয়েছিল সুরজমহল্লায় পৌঁছে সে অবজ্ঞার ভাবটা আর থাকেনি। সত্যিই বেশ পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে পাড়া। বাড়িগুলি সবই একটু মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাবে তৈরি। পুরনো হলেও তাই তার আর-একটা আলাদা মহিমা আছে।

এরই মধ্যে মোতিকোঠিটা একটু দুখিনী গেছেব। দেখলে মনে হয় এ মহল্লার পত্তন হবার সময়ে প্রথমেই বোধহয় এটি তৈরি হয়েছিল। তারপর খুব সুদিন তার যায়নি একটুও, তাই এখন ভগ্নদশা।

বাড়িটি মহল্লার তুলনায় যেমনই হোক, ভেতরে গিয়ে বসবার পর প্রাথমিক লৌকিকতা সারা হলে যা দেখলাম তা চমকে দেওয়া শুধু নয়, একেবারে হতভম্ব করবার মতো।

যে ঘরটিতে বসেছিলাম তার সৌভাগ্যের দিন অনেক আগেই গত হয়েছে। মেঝের কার্পেট ছেঁড়া ও ময়লা। গালিচা একটা যা পাতা আছে তা জীর্ণ বিবর্ণ, মখমলের তাকিয়া আছে ঠিকই, কিন্তু তা দেখলে তার ওপর হেলান দিতে উৎসাহ হয় না। বড় চৌকির ওপর পাতা ফরাসটা ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার। তার ওপর আমি অন্তত একটু আড়ষ্ট হয়েই বসেছিলাম। পরাশরের অবস্থাও আমার চেয়ে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের বোধহয় নয়।

তবে অস্বস্তিটা লুকোবার জন্য সে ঘরের এদিক ওদিক খুব যেন খুঁটিয়ে দেখবার ভান করছিল। ভানটা অবশ্য বৃথা।

কী আছে ঘরটার দেখবার! পুরনো আমলের বৈঠকখানা ঘর। দেওয়ালে ছবিটবি দু-একটা টাঙানো, তা সেই প্রথম কোম্পানি আমলের এদেশি রহিসদের খিচুড়ি ফ্যাশনের। তাতে সস্তা বিলাতি ফক্স হান্টিং-এর সওয়ার আর কুকুরের পালের ছবি রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলোর নামকরা ছবির কপির সঙ্গে সমান আদরে টাঙানো হয়েছে। সেসব ছবি রং চটা ভাঙা ফ্রেমের মধ্যে ধুলোয় ময়লায় অস্পষ্ট বলে সবক-টিই প্রায় এক বলে মনে হয়।

আড়ষ্টভাবে বসে থাকতে থাকতে মনের মধ্যে উদ্‌বেগও অনুভব করছিলাম।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়াবার পর মাথায় পাগড়ি বাঁধা যে বৃদ্ধ লোকটি আমাদের ভেতরে

নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন তাঁকে আমাদের আগমনের হেতু কিছু বলা হয়নি। তিনি সে সুযোগও দেননি। ক-টা ছোট ধাপ বেয়ে উঠে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে-না দাঁড়াতেই তাঁর দেখা পেয়েছিলাম।

তিনি যেন ভেতর থেকে কী কাজে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াতে পরাশর সবিনয়ে আমাদের পরিচয় ও আসার কারণ জানাতে গেছল। কিন্তু কথা শুরু করতে না করতেই বৃদ্ধ 'আসুন আসুন' বলে একটু আপ্যায়নের হাসি হেসেছিলেন। তারপর এই ঘরে এনে বসিয়ে সেই যে চলে গিয়েছেন এতক্ষণের মধ্যে আর দেখা নেই।

মনের মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন ওঠার জন্যই উদ্‌বেগটা হচ্ছিল। প্রথমত, বৃদ্ধ আমাদের কথা ঠিক বুঝেছেন তো? আমরা কলকাতা থেকে আসছি পরাশর তো এর বেশি আর কিছু জানাবার সুযোগই পায়নি।

দ্বিতীয়ত, আমরা ঠিক বাড়িতেই কি এসেছি? এইটিই যে মোতিকোঠি তা কাউকে জিজ্ঞাসা করে আমরা জেনে নিইনি। মোতিকোঠি বলে কোনও লেখাও বাইরে কোথাও চোখে পড়েনি আমাদের। টাঙ্গাওয়ালার কথায় বিশ্বাস করেই আমরা এখানে নেমে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। সে যে আমাদের মতো বিদেশি যাত্রী পেয়ে একটু জব্দ করবার রসিকতা করেনি তার ঠিক কী?

তাকে সন্দেহ হবার কারণ যে একেবারে নেই তা নয়। সুরজমহল্লা বলতেই বুঝে নিয়েছে ভান করে মোতিকোঠির নাম করলেও কেন যে জায়গাটা ভিকারাবাদ শহরে হঠাৎ বিখ্যাত তা সে স্পষ্ট করে জানায়নি একবারও, বরং কথাটা এড়িয়েই গেছে প্রায়ই করে।

এ ছাড়া যে কারণে আমরা এখানে এসেছি তার জন্য ভিকারাবাদে মোতিকোঠি যদি বিখ্যাতই হয়ে উঠে থাকে তা হলে তার লক্ষণ কি এই?

আমরা ছাড়া আর কোনও কৌতূহলী দর্শনার্থীকে তো দেখছি না।

pathagar.net

তিন

মনের মধ্যে এইসব প্রশ্ন তোলপাড় করার মধ্যেই ভেতর মহলে একটা ঘণ্টার শব্দে সচকিত হলাম। ভেতরের মহলে কোথাও কোনও পুজো হচ্ছে। সেই পুজোরই ঘণ্টার টানা শব্দ।

সে শব্দ থামবার পর আমাদের দরজার সামনে দিয়ে নানা বয়সের বেশ কিছু পুরুষ-মেয়েকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। তারা বাইরে থেকে পুজো দেখতেই এসেছিল সন্দেহ নেই।

পুজোর ঘণ্টাধ্বনিতে প্রথম চমকটা শুধু শব্দের জন্যই লাগেনি বুঝলাম। সুরজমহল্লার বাড়িঘরগুলির স্থাপত্যের ধরনে মনে যে দাগটা লেগেছিল তার সঙ্গে পুজোর ঘণ্টা ঠিক খাপ খায়নি। এখন অবশ্য বোঝা গেল যে মহল্লার চেহারাটা যেরকমই হোক মোতিকোঠি বাড়িটা অন্তত হিন্দুর।

ঘণ্টাধ্বনি থামবার পর বাইরের ভক্ত দর্শকরা চলে যাবার পর পাগড়ি-পরা বৃদ্ধ এতক্ষণে আবার দেখা দিলেন।

এবার আর একা নয়। সঙ্গে একজন ভৃত্য। ভৃত্যের হাতে একটি বড় পরাত। আর সে পরাতের ওপর দু-টি রেকাবিতে ফলমূল মিষ্টি আর দু-টি গেলাসে শরবত গোছের কোনও পানীয়। কাচের নয়, গেলাসগুলি পাথরের বলে পানীয়ের স্বরূপটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

ভৃত্য এসে আমাদের সামনে পরাত থেকে খাবারের রেকাবি ও পানীয়ের গ্লাস নামিয়ে দেবার পর বৃদ্ধ আগের মতোই আপ্যায়নের হাসি হেসে বললেন, 'নিন, একটু পুজোর প্রসাদ খান।'

'পুজোর প্রসাদ?' একটু বিস্ময় প্রকাশ করেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী পুজো?'

বৃদ্ধ যে পূজার নাম করলেন আমি অন্তত কখনও তা শুনিনি।

শুনতে ভুল করেছি মনে করে একটু অবিশ্বাসের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার পুজো বললেন? দর্পণা দেবীর?'

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'কিন্তু এরকম পুজোর কথা বা এরকম দেবীর নাম তো কখনও শুনিনি!'

বিমূঢ়তাটা প্রকাশ করলাম।

'না শোনবারই কথা,' বৃদ্ধ একটু হাসলেন, 'এ দেবী দেওয়ানীর একেবারে নিজের। শুধু তার কাছেই উনি দেখা দিয়ে পুজো চেয়েছেন বলে দেওয়ানী একবছর ধরে ওঁর পুজো করে আসছে।'

বেশ একটু বিভ্রান্ত হয়ে চুপ করতে বাধ্য হলেও ভুল ঠিকানায় ভুল বাড়িতে যে আসিনি এইটুকু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ধড়ে তখন প্রাণ এসেছে। জাতিস্মরা মেয়েটির নাম যে দেওয়ানী অর্থাৎ দেবযানী তা অন্তত জানা গেল। তার নিজের আবিষ্কার করা দেবীর পুজো এক বছর আগে আরম্ভ হয়েছে জেনে তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণের ক্ষমতাও সেই থেকে দেখা দিয়েছে অনুমান করা যেতে পারে। এর মধ্যেই নিজে থেকে পুজো করা থেকে মেয়েটির বয়সও কিছুটা আঁচ করা যায়। পুজো আচ্চা অবশ্য মেয়েরা খুব ছোটবেলায়ও শুরু করে। তা হলেও দেওয়ানী একেবারে শিশু নয় এটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে। কিন্তু অনুমান তো অনেক কিছুই করা যাচ্ছে। আসল দর্শনলাভটা হবে কখন?

পরাশরের দিকে চাইলাম। তার সে ব্যাপারের জন্য কোনও ব্যস্ততাই যেন নেই। দেওয়ানীর মতো জাতিস্মরা মেয়ের যেখানে বাস সে বাড়িতে একটু বসতে পেয়েই সে যেন কৃতার্থ।

লৌকিকতার খাতিরে প্রসাদ বলে পরিবেশিত খাবার তখন একটু মুখে তুলতে হচ্ছে। বৃদ্ধ আমাদের খাওয়া তদারক করবার জন্যই একটু দূরে ফরাসের ওপর গিয়ে বসেছেন।

শেষ পর্যন্ত অন্যকের মতো এই প্রসাদ খাইয়েই বিদায় করবে নাকি!

পরাশরের তাতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। কিন্তু আমার পক্ষে তো এমন করে তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকা অসম্ভব।

যে ক টা দিন এই [illegible] যাওয়ায় নষ্ট হবে সেটাই সময়ের সম্পূর্ণ লোকসান। সে লোকসান যত কমের মধ্যে রাখা যায় সেই চেষ্টা আমায় করতেই হবে।

ফলমূল পেঁড়া জাতীয় মিষ্টি একটু মুখে ছুঁইয়ে শরবতের গ্লাসটায় চুমুক দিয়ে বেশ একটু তৃপ্তিই পেলাম। স্টেশনে নেমে এক কাপ চা খাওয়ারও তো পরাশর সুযোগ দেয়নি। চা না হোক, জলীয় একটা পানীয়ের বিশেষ দরকার ছিল।

শরবতটা শেষ করতে করতে পরাশরের দিকে একবার চাইলাম।

আমি তো এতক্ষণ অনেক আলাপ চালালাম। এবার আসল কথাটা যাতে সে তোলে চোখের ইঙ্গিতে তাকে সেই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। পরাশর তার প্রসাদ খেতেই তন্ময়। শরবতের গ্লাস পর্যন্ত এখনও পৌঁছয়নি। অগত্যা নিজেকেই কথাটা তুলতে হল। বেশ একটু মিনতির সুরে বললাম, 'আচ্ছা শেঠজি—'

বাধা পেতে হল ওইখানেই। শেঠজি বলে যাঁকে সম্মান দেখাতে চেয়েছিলাম পাগড়ি-বাঁধা সেই বৃদ্ধ বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি শেঠজি-টেঠজি নই, ও সম্বোধন করে আমায় অপমান করবেন না।'

এ আবার কী কাণ্ড! শেঠজি বলাটা অপমান? শেঠজি না বলে কী বলব? বৃদ্ধ নিজেই অবশ্য সমস্যাটা মিটিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমরা এদেশে এসে বসবাস করলেও কাশ্মীরি দৈবাচার্য বংশ। আমায় পণ্ডিতজি বলতে পারেন।'

'তা হলে মিনতিটা শুনুন পণ্ডিতজি,' বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললাম, 'আপনার ওই দেওয়ানীকে যদি একবার দেখিয়ে দেন।'

'দেওয়ানীকে দেখিয়ে দেব?' বুড়ো পণ্ডিতজি আমার দিকে একদৃষ্টে খানিক তাকিয়ে রইলেন।

এবার কিন্তু সে চোখের দৃষ্টিতে বা মুখের ভাবে ক্ষোভ কি রাগের কোনও চিহ্ন নেই। আছে তাতে পুরোপুরি অবজ্ঞা মেশানো কৌতুক।

এ কৌতুক জাগাবার মতো কী করেছি বুঝতে না পেরে আমি তখন পরাশরের দিকেই সাহায্যের আশায় তাকিয়েছি। সাহায্য অবশ্য পেলাম না।

পরাশর যেন কীসের তন্ময়তায় ইহজগতেই নেই। আমার প্রশ্ন আর বৃদ্ধ পণ্ডিতজির উত্তর তার কানেই যায়নি মনে হল।

কৌতুকের সঙ্গে একটু করুণা মুখের ভাবে মিশিয়ে তিনি এবার বললেন, 'দেওয়ানীকে দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা কি অধিকার কারও নেই। সে যদি ইচ্ছে করে তা হলে নিজেই এসে আপনাকে দেখা দেবে। আপনারা যে এসেছেন তা হয়তো এতক্ষণে সে নিজে থেকে জেনেছে।'

হতভম্ব হয়ে পণ্ডিতজির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুড়ো বলে কী! হয়তো এতক্ষণে আমাদের আসার কথা জেনেছে! তার মানে অন্তর্যামী এই কথাই বুঝতে হবে। পরাশরের পাল্লায় পড়ে ভাল বুজরুকির মধ্যে তো এসে পড়লাম।

পণ্ডিতজি যা বললেন তার আর-একটা তাৎপর্যও তো রীতিমতো গোলমেলে।

দেওয়ানী নিজে থেকেই আমাদের আসার কথা জানতে পারবেই হবে না, তার আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছেও হওয়া চাই!

সে ইচ্ছেই যদি আজ না হয়?

ভয়ে ভয়ে সেই সম্ভাবনা নিয়ে বাইরে যথাসম্ভব ভক্তিভাব দেখিয়ে এবার প্রশ্ন করলাম, 'আজ আমাদের দর্শন পাবার আশা তা হলে আছে কি?'

'কেমন করে বলব!' পণ্ডিতজি একেবারে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন আমাদের ওপর। 'এখুনি পেতে পারেন। আবার একটা মাস ধন্না দিয়েও বিফল হয়ে ফিরে যেতে পারেন। অমন গেছেও অনেকে।'

ও বাবা, এ যে একেবারে পয়লা নম্বর ধড়িবাজের হাতে পড়েছি!

সরাসরি পরাশরকেই তাই এবার জিজ্ঞেস করতে হল, 'শুনলে তো পরাশর! আজ হয়তো দেখা না-ও হতে পারে!'

'আজ না হয় কাল হবে!' নির্বিকারভাবে জানালে পরাশর। 'এ তো জোর-জুলুমে আদায় করবার জিনিস নয়।'

পরাশরের জবাব শুনে আমার চক্ষুস্থির। পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে উঠল এই নির্বিকার উত্তরে। গলাটা মোলায়েম রাখবার চেষ্টা না করেই বললাম, 'আমায় তো তা হলে আজই ফিরে যেতে হয়। আর অপেক্ষা করবার উপায় আমার নেই।'

চার

অপেক্ষা করবার দরকার হল না।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পণ্ডিতজিকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম।

আমাদের দিকে ফিরে একটু হেসে তিনি বললেন, 'আপনাদের ভাগ্য ভাল। দেওয়ানী নিজে থেকেই আপনাদের দর্শন দিতে ডাকছেন।'

ডাকছে! শুনে চমকিত হলাম। কিন্তু পণ্ডিতজিও অন্তর্যামী নাকি! ডাকছে যে সেকথা উনি জানলেন কী করে?

না, টেলিপ্যাথি গোছের কিছু নয়। বাস্তব দূত অর্থাৎ দূতী মারফতই দেওযানীর ডাকের খবরটা এসেছে।

বাইরের মহলে আমাদের বসবার ঘর। তারপর একটা পাথরে বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে ভেতর মহল, যেখান থেকে আগে পুজোর ঘন্টার শব্দ পেয়েছি।

আমাদের ঘর পর্যন্ত আসবার আগে উঠোন পার হবার সময়ই পণ্ডিতজি তাকে দেখতে পেয়ে তার বার্তাটা নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন।

পণ্ডিতজি যা বলেছেন দূতী এসে সেই কথাই আমাদের জানাল।

তার কথা শুনব কী, তার চেহারা পোশাকের দিকেই অবাক হয়ে তখন তাকিয়েছি। দূতী হয়ে যে এসেছে, রাজনটী বললেই তার যথার্থ পরিচয় হয়। পোশাকের যেমন জৌলুস তেমনই চটক চেহারার। চলায়-বলায় যেন লাস্যের ঢেউ তুলে যাচ্ছে! পুজোআচ্চা নিয়ে তন্ময় জাতিস্মরা একটা মেয়ের এই প্রতিনিধি! দূতীকে দেখে যদি অবাক হয়ে থাকি স্বয়ং দেওযানীকে দেখে যাকে বলে একেবারে স্তম্ভিত।

প্রথম বিস্ময় হল দেওযানীর বয়স বুঝে। জাতিস্মরা মেয়ে বলতে নেহাত শিশু না হোক বালিকা বয়সের বেশি কিছু ভাবিনি। সাধারণত জন্মান্তরের স্মৃতি এই ছোটবেলাতেই কারও কারও মধ্যে দেখা যায়। একটু বয়স বাড়লেই সে স্মৃতি আর থাকে না।

কিন্তু বালিকা দূরের কথা, এ যে কিশোরীও নয়, রীতিমতো পূর্ণযৌবনা যুবতী।

আর যুবতী শুধু নয়—কী তার বেশভূষা আর রূপ! দূতী যদি মর্ত্যরাজ্যের রাজনটী হয় তা হলে দেবযানী মুনিমনোলোভা বিলোলকটাক্ষ স্বর্গের অপ্সরী!

বাইরের উঠোন পেরিয়ে ভেতর মহলের যে ঘরটিতে তখন আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুরনো হলেও তার আসবাবপত্র সাজসজ্জা খুব বিবর্ণ নয়।

সেই ঘরেরই পেছন দিকে ছাদ থেকে ঝোলানো একটি জরি দেওয়া মখমলের পরদার সামনে দেওযানী একটি ছোট নিচু চৌকির ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে। আগেকার দিনের রাজকুমারীদের মতো তার চৌকির দু-পাশে দু-জন করে সখী দাঁড়িয়ে।

আমাদের ঢুকতে দেখে দেওযানী একটু সোজা হয়ে উঠে বসল। তারপর পাশের একটি চৌকিতে আমাদের বসতে ইঙ্গিত করে বিশেষ করে আমার দিকেই ফিরে চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বললে, 'এতদিন বাদে এলে? কিন্তু এখনও এত অবিশ্বাস?'

কী বলছে কী জাতিস্মরা সুন্দরী! আমিই কি ভুল শুনছি! খানিক আগে থেকে মাথাটায় কেমন একটা ঝিমঝিমে ভাব হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি মাথা খারাপ তো হয়নি। তা হলে মানে কী এসব কথার!

দেওযানী তখন শুধু আমার কথাই নয়, পরাশরের কথাও বলে যাচ্ছে। বলছে, 'তোমার বন্ধুর নেশা তো গোয়েন্দাগিরি! তবু তার মনে তো এত সন্দেহ নেই।'

দু-চোখ তখন আপনা থেকে বিস্ফারিত। মুখে যেন কথাই সরতে চায় না। তবু কোনওরকমে অতি কষ্টে বিমূঢ় বিস্ময়টা প্রকাশ করলাম, 'তুমি, মানে—মানে আপনি আমাদের পরিচয় জানেন?'

'জানি।' দেওযানীর মুখে রহস্যময় হাসি। 'আর তোমার সঙ্গে পরিচয় কি আজ!'

'তার মানে?'

'মানে যদি বলি এখন কি কিছু লাভ হবে?' দেওযানীর মুখে সেই রহস্যের হাসি, 'সেসব কথা তুমি বিশ্বাসই করবে না। তবে কলকাতা থেকে এতদূর তোমায় বৃথাই এসে ফিরে যেতে দেব না। আগের স্মৃতি না ফিরুক, এখনকার স্মৃতি খানিক মুছে দিচ্ছি। এই নাও—'

ডানহাতটা নেড়ে আমার দিকে কী যেন ছিটোবার ভঙ্গির সঙ্গে দেওয়ানীর ওই শেষ কথাটুকুই শুনেছি। তারপর কী যে হল কিছুই মনে নেই। সবকিছু যেন এক মুহূর্তে চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল। পা দুটো যেন টলে গেল আপনা থেকে। তারপর সবকিছু ফাঁকা।

জ্ঞান ফিরে আসার স্মৃতিটা কিন্তু সুমধুর। গোড়ায় বিছানার কোমলতাটাই টের পেলাম। তারপর চোখ খুলে কয়েকটা মুখ। তার মধ্যে দেওয়ানীর মুখটাই সবচেয়ে স্পষ্ট।

এক মুহূর্তে সব কথা স্মরণ হতেই এক ঝটকায় উঠে বসলাম। যে ঘরে দেওয়ানীর দর্শনের জন্য এসেছিলাম সেই ঘরেই আছি। তবে এতক্ষণ দেওয়ানীর নিজের বসবার চৌকির উপরই শুয়েছিলাম। ঘরে এখন দেওয়ানী আর পণ্ডিতজি ছাড়া আর কেউ নেই। দেওয়ানী আমার মাথার কাছেই বসেছিল। উঠে বসতে একটু হেসে বললে, 'আমায় মাফ করো। তুমি যে এত দুর্বল তা আমার মনে ছিল না।'

সে কথার জবাব না দিয়ে বেশ একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'পরাশর, মানে আমার বন্ধু কোথায়?'

'কোথাও না, এই তোমার সামনে।' পরাশর হাসিমুখে ঘরে ঢুকে একান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললে, 'তুমি জাগোনি বলে দর্পণা দেবীকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি একবার দেখবে নাকি?'

'না।' এবার উঠে দাঁড়িয়েই বললাম, 'তোমার কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো এখন চলো। স্টেশনে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই যান মিস্টার ভর্মা!' দেওয়ানী আমার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে কৌতুকভরা মুখে বললে, 'কৃত্তিবাসের মেজাজ এখন খিচড়ে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে। তবে স্টেশনে গিয়ে লাভ নেই। আজ আপনাদের যাওয়া হবে না।'

'আচ্ছা, হয় কি না দেখা যাবে,' বলে দেওয়ানীর দিকে একবার ফিরেও না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। হন হন করে একটু চলে আসছিলাম। উঠোন পেরিয়ে দেউড়ি দিয়ে বাইরের রাস্তায় আসার পর পরাশর আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার হঠাৎ কী হল বলো তো? অত মেজাজ হল কেন হঠাৎ?'

'কেন হল জিজ্ঞাসা করছ?' রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই ফেটে পড়লাম, 'কী বুজরুকির ব্যবসা এখানে চলছে তা বুঝতে পেরেছ?'

'বুজরুকি!' পরাশরের গলাটা বেশ ক্ষুব্ধ মনে হল।

'বুজরুকি নয়?' জ্বালাধরা গলাতেই বললাম, 'কী ফন্দিতে সবকিছু সাজানো তা দেখতে পেলে না? শরবতে ওরা অজ্ঞান করার ওষুধ মিশিয়েছিল—'

'কী বলছ, কী!' এবার পরাশরের প্রতিবাদ বেশ জোরালো, 'শরবত তো আমিও খেয়েছি।'

'তুমিও খেয়েছ!' আমায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত হতে হল, 'তা হলে তা হলে—'

'তা হলে শুধু তোমার শরবতেই ওষুধ মিশিয়েছিল বলতে চাও!' পরাশর আমার সন্দেহটাকে ভাষা দিয়েই বললে, 'কিন্তু এ পক্ষপাতিত্ব কেন? আর তা ছাড়া আমাদের পরিচয়গুলো জানা, সেটাও কি বুজরুকি বলবে তুমি!'

'কী বলবে তা হলে?' নিজের খানিক আগের সন্দেহে একটু যেন নাড়া খেয়ে পরাশরের বক্তব্যটাই শুনতে চাইলাম।

'আর যাই বলি, বুজরুকি বলতে একটু বাধে না কি?' পরাশর তার যুক্তিটা জানালে, 'আমরা অনেক দিন ভেবে-চিন্তে নয়, হঠাৎ আসবার খেয়ালে চলে এসেছি। আসবার কথা কাউকে জানিয়েও আসিনি যে আমাদের সম্বন্ধে আগে থাকতে কিছু জানবার সুযোগ হবে। সে অবস্থায় আমাদের অমন নির্ভুল পরিচয় বলা বেশ একটু আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?'

স্থান কাল ভুলে রাস্তায় দাঁড়িয়েই আরও কিছু আলোচনা হয়তো আমাদের হত, কিন্তু হঠাৎ

মোতিকোঠির চাকরের আবির্ভাবে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করতে হল।

প্রথম আমাদের জন্যে পুজোর প্রসাদ আর শরবত যে এনেছিল সেই চাকরই আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছে। তাকে পাঠিয়েছে স্বয়ং দেওয়ানী। সে আমাদের টাঙ্গা ডেকে দেবে।

চাকর এসে সেই কথাই জানালে। 'এখানে এই ধুপের মধ্যে কতক্ষণ খাড়া থাকবেন, হুজুর। ভিতরে বসুন, আপনাদের টাঙ্গা ডেকে দিচ্ছি।'

'না, ভেতরে বসব না। টাঙ্গাও ডেকে দিতে হবে না।' আগের মেজাজটা আবার চাগিয়ে তুলে বললাম, 'আমরাই পারব।'

মোতিকোঠির অনুচর কিন্তু নাছোড়বান্দা। সঙ্গে সঙ্গে তো চললই, তার মধ্যে নিজের নাম ধাম পরিচয় থেকে মোতিকোঠির বিষয়েও অনেক কিছু জানিয়ে দিলে। নাম তার বদ্রীদাস। সেও এদেশের মানুষ নয়। তবে কাশ্মীর নয়, হিমাচল প্রদেশ থেকে এসেছে। এ বাড়িতে কাজ করছে প্রায় সাত বছর, কিন্তু আর এখানে থাকবে না। একটা কোথাও সুবিধে পেলেই চলে যাবে। মোতিকোঠির রাস্তা থেকে আমরা তখন টাঙ্গা ধরতে কিছু দূরের বড় রাস্তার মোড়ের দিকে যাচ্ছি। বদ্রীদাস এবার তার আসল প্রার্থনাই জানিয়ে বসল।

আমরা তো বড়রকমের আদমি, আমরা তাকে একটা চাকরি দিয়ে যদি কলকাতা নিয়ে যাই। কলকাতা খুব বড় শহর সে জানে। সেখানে তার দেশোয়ালি ভাইও অনেক আছে। আমরা যদি শুধু তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই তা হলে চাকরিতে না রাখলেও সে নিজেই কাজকর্ম জোগাড় করে নিতে পারবে। আমাদের দিয়ে যাবার ঋণও শোধ করে দেবে।

'কিন্তু তুমি এ চাকরি ছেড়ে যেতে চাও কেন?' পরাশরই জিজ্ঞাসা করল।

'এমনি চাই, হুজুর।' বদ্রীদাস প্রথমে সাবধানী জবাব দিলে, 'এক জায়গায় বেশি দিন মন টেকে না, তাই।'

'শুধু তাই জন্যে?' এবার আমি একটু সন্দিগ্ধ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'না, এখানে অন্য কিছু অসুবিধা আছে।'

বদ্রীদাস খানিক চুপ করে মুখ নিচু করে রইল। তারপর বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বললে, 'আপনারা গরিবের মা বাপ হুজুর। আপনাদের কাছে ঝুট কী করে বলব। এ বাড়িতে চাকরির বড় ঝামেলা। আমি আর এতে উঠছি না।'

বড় রাস্তায় তখন পৌঁছে গেছি। দূরের টাঙ্গার আস্তানায় একটা-দুটো ঘোড়া-খোলা টাঙ্গাও দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে এদের একটা ভাড়াও করা যায়। কিন্তু তখন বদ্রীদাসকে ছেড়ে যাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে।

বড় রাস্তার মোড়ে একটা বড় ডালপালা ছড়ানো অশথ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তার পেট থেকে কথা বার করবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

বদ্রীদাসকে দিয়ে কথা বলানো খুব শক্ত নয়। সে নিজেই অনেক কিছু বলার জন্য ব্যাকুল। শুধু একটু উসকানি দেওয়াই দরকার।

মোতিকোঠির বাড়ির চাকরির ঝামেলার কথা শুনে সেই উসকানির ভাল সুযোগই মিলল। একটু সহানুভূতি দেখিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঝামেলা কীসের? কাজ বেশি? মাইনে কম? না মনিবরা বড়া বদমেজাজি?'

'ওসব কিছু নয়, হুজুর,' বদ্রীদাস জিভ কামড়ে নিজের কান মলে জানালে, 'মিথ্যে বললে দর্পণা দেবীর শাপে নির্বংশ হতে হবে। আসল ঝামেলা কী, জানেন?'

বদ্রীদাস একটু চুপ করে থেকে যা বললে তা প্রথমটা একটু ধাঁধার মতোই লাগল। সে যা জানালে তাতে মনে হল ঠাকুর-দেবতার কাজ বলেই ও চাকরিতে বিশেষ আপত্তি।

'কেন? ঠাকুর-দেবতার কাজ কি খারাপ?' অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিশেষ করে তুমি যা বলছ ঠাকুর-দেবতা যদি সেইরকম জাগ্রত হয়?'

'আজ্ঞে, সেই জন্যেই খারাপ!' বদ্রীদাস নিজের কথাটা এবার বিশদ করলে, 'এরকম ঠাকুর দেবতা আর দেবীজির মতো মানুষের কাছে বেশি থাকতে নেই।'

'দেবীজি মানে দেওয়ানি দেবীর কথা বলছ?' জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

'জি হাঁ,' মাথা নেড়ে জানালে বদ্রীদাস, 'উনিই তো আমাদের দেবীজি।'

'কিন্তু ঠাকুর-দেবতা আর ওঁর মতো দেবীজির কাছ থাকতে নেই কেন? তুমি তো বললে যে মনিবরা কড়া বদমেজাজি নয়। তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, তবে?'

'বুঝতে পারলেন না, হুজুর?' বদ্রীদাস যেন আমাদের অজ্ঞতায় একটু অবাক হল—'প্রথমত জাগ্রত ঠাকুর-দেবতার কাজ, যেটুকু ভার নিজের ওপর থাকে তাতে সারাক্ষণ কোথায় কী গলতি হয়ে যায় তার ভয়। আর দেবীজির বেলায় খারাপ লাগে দিনের পর দিন ওঁর ওই ক্ষমতার বহর দেখতে।'

'ক্ষমতার বহর দেখতে খারাপ লাগে!' এবার আমি রীতিমতো উৎসুক—'উনি সব ভুলভাল যা খুশি কথা বলে সবাইকে ভাঁওতা দেন বুঝি?'

আবার বদ্রীদাসের জিভ বেরিয়ে এল। তা কামড়ে সেই সঙ্গে আবার কানমলা খেয়ে বেশ একটু গরমই হয়ে উঠল আমার উপর।

'ওসব পাপ কথা বলবেন না, হুজুর! আপনার বিশ্বাস না থাকে এখানে আসবেন না, কিন্তু ওসব কথা যদি বলেন তা হলে আপনার সঙ্গে যেতে ও কথা বলতেই চাই না। ওই ওখানে টাঙ্গা আছে, ভাড়া করে নিন। আমি চললাম। নমস্তে।'

বদ্রীদাস সত্যই ফিরে মোতিকোঠির দিকে হাঁটতে শুরু করলে। নিজের আহাম্মকিতে তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। মোতিকোঠির ভেতরের খবর জানবার এমন সুযোগ, বদ্রীদাসের কথা উলটো বুঝে বুঝি হারালাম।

পরাশর ও আমি দু-জনেই ছুটে গিয়ে বদ্রীকে এবার থামালাম। কিন্তু সে কি সহজে ঠান্ডা হয়। শেষকালে পরাশরের কথার পরেই আর রাগ পড়ল।

'অরে দেবীজির মহিমা কি আমরা জানি না? না হলে সেই কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে এসেছি কেন? আমার দোস্ত শুধু তোমায় একটু পরীক্ষা করে দেখছিলেন।'

'আমায় আর কী পরীক্ষা করলেন হুজুর,' বদ্রীদাস এতক্ষণে নরম হয়ে বললে, 'আমার শিরা কেটে দেখবেন দর্পণা দেবী আর দেবীজির নাম লেখা আছে, তবু এখানে থাকতে দিল নারাজ। শুনুন, নারাজ হররোজ দুনিয়ার এত সাচ্চা খবর জানতে। দেবীজি তো ঝুট কিছু বলেন না। উনি তো শুধু নিজের আগের সব জনমের কথা বলেন না। দর্পণা দেবীর দয়ায় উনি সবকিছুই জানতে পারেন, আর যা জানেন তা কারও পরোয়া না করে সাফ সাফ বলে দেন। যেমন কাল এক বহুত বড়া শেঠজিকে বলে দিলেন, আগের জনমে তুমি অনেক পাপ করেছিলে, তাই এবার টাকার কুমির হয়েছ। শেঠজি তাতে হাত জোড় করে বলেছিল, পাপ করেছি বলে এত টাকার মালিক হয়েছি! এ কেমন কথা দেবীজি! দেবীজি তাতে হেসে বলেছিলে, আরে সেই তো তোমার পরীক্ষা। এবার এই দৌলত দিয়ে যদি প্রায়শ্চিত্ত না করো তা হলে সচমুচ কুমির হবে পরের জন্মে।'

বদ্রী থামতে একটু সাবধান হয়েই এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'শেঠজির এই হাল দেখে তোমার খারাপ লেগেছে?'

'না, হুজুর।' বদ্রী প্রতিবাদ জানালে, 'শেঠজির মতো মানুষকে এইরকম সাফ কথা তো শোনানোই চাই। আমার কিন্তু দুনিয়ার আসলি চেহারা দেখতেই আর ভাল লাগে না। দেবীজির কাছে সবাই কত আশা নিয়ে আসে, কিন্তু এলে উনি রেখে ঢেকে কিছু বলেন না। এই সেদিন একজন এসে দর্পণা দেবীর পুজো দিয়ে গেল। তার দশ বছরের হারানো ছেলে উনি যেমনভাবে যে দিন বলেছিলেন ঠিক তেমনই ভাবে সেইদিন ফিরে এসেছে। এসব যেমন বলেন তেমন

অন্যরকম খাঁটি কথাও জানিয়ে দেন। সেদিন একজনকে বলে দিলেন, এখানে কেন এসেছিস, তুই তো ঠগবাজ, নিজের ভাই-বোন সকলকে ঠকিয়েছিস, তোর তাই এমন রোগ হয়েছে, যা আর সারবে না। আর একজনকে আবার বললেন, তোর বউ তোকে ছেড়ে পালাবে না তো কী করবে। তুই তো ওকে আর ভগ্নে পরের ঘর থেকে জুলুম করে কেড়ে এনেছিলি। মুশকিল কী, জানেন হুজুর? এরা সবা দেবীজির কাছে সাফ বাৎ শুনে আমাকে এসে ধরে পড়ে। আমি যেন দেবীজিকে বলে কয়ে সাধ্য সাধনা করে ওদের নসিব বদলে দিতে পারি। এসব আর সইতে পারি না হুজুর, তাই আপনাদের মতো সকলকে বাইরে কোথাও কাজের জন্য আর্জি জানাই। কিন্তু তা কি আর আমার বরাতে আছে?'

বদ্রীদাস এরপর হঠাৎ যেন কী বুঝে মুখ বন্ধ করে ফেলে।

আমাদের জন্যে টাঙ্গা ডেকে দিতে অবশ্য ত্রুটি করে না। টাঙ্গাওয়ালাকে স্টেশনে যেতে বলছি শুনে শুধু একটু মন্তব্য করে, 'কেন মিছে স্টেশনে যাচ্ছেন, হুজুর? আজ তো আপনাদের যাওয়া হবে না।'

'যাওয়া হবে না কী রকম!' আমার আগেকার জেদ আবার চাড়া দিয়ে ওঠে—'ট্রেন চলা কি সব বন্ধ হয়ে গেছে এ স্টেশনে?'

'ট্রেন বন্ধ হবে কেন, হুজুর!' বদ্রীদাস যেন আমাদের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বলে, 'কিন্তু ট্রেন চললেই তো যাওয়া যায় না। তবু স্টেশনে গিয়েই একবার দেখুন।'

পাঁচ

স্টেশনে গিয়েই দেখলাম। ফিরে যাবার ট্রেন ঠিক মতোই আছে। তা হঠাৎ বন্ধ হবার মতো কোনও খবর রেলের লোকেরা অন্তত পর্যন্ত।

এখন থেকে সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত ফিরার টিকিট করতে হয়। সে টিকিট কেনার কোনও অসুবিধাই হল না। লেফট লাগেজ থেকে মাল উদ্ধার করে ওয়েটিং রুমের অ্যাটেনডান্টকে বখশিশ দিয়ে সেখানে স্নান সেরে নিলাম। স্টেশনে একই ঘরের মধ্যে দু দিকে ভাগ করা আমিষ আর শাকাহারী ভোজনালয়ের চেহারা দেখে ভক্তি হল না। স্টেশনের বাইরেই দক্ষিণ ভারতীয় একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে সেখানে ইড্‌লি দোসা উপ্‌মা নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনটা ভাল ভাবেই সারতে পরাশরের দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী? আটচল্লিশ দুগুণে ছিয়ানব্বই ঘণ্টার হয়রানি সার্থক মনে হচ্ছে? বেশ খুশি মনেই ফিরে যাচ্ছ তো!'

'ফিরে তো এখন যাচ্ছি না!' পরাশর যেন ছোটখাটো বোমার মতো জবাবটা ছাড়ল।

খাওয়া বন্ধ করে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। সেই বদ্রীদাসের পেট থেকে কথা বার করবার চেষ্টার পর টাঙ্গায় ওঠা থেকে পরাশর কেমন যেন ভোম মেরে ছিল বটে। নেহাত আমার ইচ্ছে, তাই করতে হয় বলে টিকিট কেনা থেকে লাগেজ বার করা পর্যন্ত সব কাজ যন্ত্রের মতো করে গেছে।

সেই আচ্ছন্নতার মূল কি তার এই ধারণা যে আজ এখান থেকে যাওয়া হবে না? দেওয়ানীর কথায় এতখানি এখনও তার বিশ্বাস?

স্পষ্ট করে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফিরে যাচ্ছি না মানে? ট্রেন এলেও তুমি কি তাতে উঠবে না? টিকিট কিনেছি তা হলে কী জন্যে?'

'টিকিট কিনি আর যাই কিনি, যাওয়া আজ হবে না!' পরাশর তার বিশ্বাসে অটল।

'কেন হবে না? যাওয়ার বাধা তো দেখতে পাচ্ছি না কিছু!'

'এখন পাচ্ছি না। তবে—'

pathagar.net

'তবে পরে পাব।' পরাশরের জবাবটা পূরণ করে দিয়ে একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললাম, 'তোমার এ দশা কবে থেকে হল? বুদ্ধিসুদ্ধিতে কি ছাতা ধরে গেছে? দু-একটা কথা না হয় ঠিকই আন্দাজ করেছে, তা বলে ওই বদ্রীদাস যা বলে তাও তুমি বিশ্বাস করো? সত্যিই ওকে বাক্‌সিদ্ধ ভাবছ? ও আজ আমাদের যাওয়া হবে না বলেছে—ওর ভবিষ্যদ্বাণী ফলবেই মনে করছ?'

'আর তো কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা। অপেক্ষা করেই দেখো।'

প্রসঙ্গটা এইভাবে থামিয়ে পরাশর তার ধারণাতেই অটল রইল।

কিন্তু সত্যিই দেওয়ানীর কথাই ফলল। সেদিন যাওয়া আমাদের হল না। ট্রেনের গোলমালের জন্যে নয়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এমন একটা ব্যাপারে আমি নিজেও যাওয়া বন্ধ করার পক্ষেই মত দিতে বাধ্য হলাম।

আমাদের ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি।

ওয়েটিং রুমে বসেই লাগেজ ট্যাগেজ বাঁধা শেষ করে ফেলেছি। হঠাৎ ওয়েটিং রুমের দরজায় স্টেশনের এক চাপরাশি এসে হাজির।

ওয়েটিং রুমের অ্যাটেনড্যান্ট তখন বখশিশের আশ্বাসে আমাদের প্রায় পাহারা দিয়ে বসে আছে। ট্রেন এলেই যাতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

চাপরাশি এসে দরজা থেকেই স্থানীয় তেলুগুতে তাকে কী বলল সবটা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার বিকৃত উচ্চারণে বর্মা আর ভদ্র গোছের দুটো শব্দ শুনে একটু অবাক হলাম। চাপরাশি কি আমাদেরই খোঁজ করতে এসেছে নাকি? কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

এই পাণ্ডববর্জিত শহরে সবাই তো আর দেওয়ানীর মতো অন্তর্যামী নয়। এখান থেকে আমাদের নিজেদের নামে বার্থ রিজার্ভেশনের দরকার হয়নি। নেহাত সাধারণভাবে দুটো উচ্চ শ্রেণির টিকিট কিনেছি। সুতরাং আমাদের নাম এখানকার স্টেশনের চাপরাশির মতো মানুষের জানবার উপায়ও নেই।

কিন্তু যা অসম্ভব তাই হয়েছে শুনে ফেলাম। ওয়েটিং রুমের জমাদার হিন্দি জানে। সে চাপরাশির কথা শুনে হিন্দিতেই তা আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

তার বোঝা ও বলার দৌড়ে একটু অস্পষ্টভাবে হলেও ব্যাপারটা যা বুঝলাম তা এই যে স্টেশনমাস্টার হঠাৎ অত্যন্ত জরুরি একটা খবর পেয়েছেন। স্টেশনে ভর্মা ও ভডরো নামের দুজন কেউ যদি থাকেন তা হলে এখুনি স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে যেন দেখা করেন। খবরটা দিয়ে জমাদার আমাদের কারও ওই নাম কি না ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল।

এ খবর পাবার পর নামগুলো অস্বীকার করে চুপ করে বসে থাকা যায় না। চাপরাশির সঙ্গে স্টেশনমাস্টারের অফিসঘরে যেতেই হল।

তাঁর কামরায় ঢুকতে স্টেশনমাস্টার বেশ সসম্মানেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ করলেন, 'আপনারাই কি ভার্মা আর ভডরো?'

কেন পদবিটা কার বুঝতে না পেরে তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমাদের দুজনের ওপর চোখ বোলালেন।

'হাঁ, ইনি বর্মা, পরাশর বর্মা আর আর আমি কৃত্তিবাস ভদ্র।' স্টেশনমাস্টারের উচ্চারণ শুধরে নিজেদের সঠিক পরিচয় তাঁকে দিলাম।

তারপর 'বসুন, বসুন' বলে স্টেশনমাস্টারের সাদর আপ্যায়ন অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু ব্যাপার কী বলুন তো? হঠাৎ আমাদের নামে এরকম তলব কেন? পুলিশটুলিশ থেকে খোঁজ নাকি?'

'না, না। পুলিশ কী!' স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত লজ্জিতভাবে প্রতিবাদ করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা জোয়ালাপ্রসাদ বলে কাউকে চেনেন বোধ হয়?'

'জোয়ালাপ্রসাদ!' আমি তো বটেই, পরাশরও নামটা শুনে তার ভিকারাবাদে আসার পর

থেকে লাগা আচ্ছন্নতার ঘোর যেন এক নিমেষে কাটিয়ে উঠল।

'কলকাতার জোয়ালাপ্রসাদ?'

স্টেশনমাস্টার মাথা নেড়ে সায় দেওয়ায় পরাশর বিস্মিত ও উদ্‌বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'সে আপনার কাছে ভিকারাবাদ স্টেশনে আমাদের জানাবার জন্যে খবর পাঠিয়েছে!'

'আমরা এই স্টেশনে থাকব সে জানল কী করে?' আমি পরাশরের সঙ্গে আমার সবিস্ময় প্রশ্নটাও যোগ করলাম।

'না জানলে খবরটা পাঠালেন কী করে!' স্টেশনমাস্টার আমার প্রশ্নটারই উত্তর দিয়ে আমাদের বিমূঢ়তা আরও বাড়ালেন।

'কী খবর পাঠিয়েছে?' পরাশর এবার জিজ্ঞাসা করলে।

'তাঁর সঙ্গে এখুনি একবার গিয়ে দেখা করতে,' জানালেন স্টেশনমাস্টার।

অনুরোধটা বেশ একটু অদ্ভুত। সেই কথাটাই আমার কথায় বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, 'সে খবর যখন পাঠিয়েছে তখন দেখা নিশ্চয় করব। কিন্তু সেটা এখুনি কী করে সম্ভব? তার জন্যে কলকাতা পর্যন্ত যাবার সময়টা তো লাগবে?'

'না, না, কলকাতায় নয়।' স্টেশনমাস্টার সাহেব এবার আমাদের একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন, 'জোয়ালাপ্রসাদজি এই ভিকারাবাদেই আছেন। তিনি কী নাকি বিপদে পড়েছেন, তাই যেখানে আছেন সেখানেই আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে চিঠিতে খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন।'

'জোয়ালাপ্রসাদ এই ভিকারাবাদে আছে?'

প্রায় স্বগতোক্তির মতো কথাটা আমার মুখ দিয়ে বার হতেই স্টেশন মাস্টার সাহেব একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'হ্যাঁ, এই দেখুন না চিঠিটা।'

দেখলাম চিঠিটা। নিজেও পড়লাম, পড়ালাম পরাশরকেও।

চিঠি যে জোয়ালাপ্রসাদের লেখা তা বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার সেই ধরে ধরে প্রায় কপিবুকের মতো নিখুঁত ছাঁদে লেখা। ভুল ইংরেজি না হলেও ভুল বানানের চিঠি। নীচে সইটাও যে তার, আমার অন্তত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার সই করা অমন অজস্র চিঠি এখনও আমার কলকাতার অফিসের ফাইলে জমা করা আছে।

জোয়ালাপ্রসাদ তার স্বভাব-মাফিক এবার কিন্তু বড় চিঠি লেখেনি। মাত্র কয়েক লাইনে যা লিখেছে তার মর্ম হল এই যে সে এক বিশেষ কাজে ভিকারাবাদে আসতে বাধ্য হয়ে দারুণ বিপদে পড়েছে। আজই খানিক আগে দৈবাৎ আমাদের আসার খবর পেয়ে আর সেই সঙ্গে আজই আমরা চলে যাচ্ছি জেনে হতাশার আশায় ভর করে একজনকে স্টেশনে পাঠাচ্ছে। কোনওরকমে এ চিঠি যদি আমাদের হাতে পড়ে তা হলে তাকে প্রাণে বাঁচাবার জন্য অবিলম্বে যেন তার পাঠানো লোকটির সঙ্গে চলে আসি।

জোয়ালাপ্রসাদ এ চিঠিতে হতাশার ইংরেজি 'ডেসপেয়ার'-এর বানান করেছে ডি ই এস পি এ আর ই দিয়ে। আর 'অবিলম্বে'র ইংরেজি 'ইমিডিয়েটলি' লিখেছে আই এম আই দিয়ে।

তার সইয়ের মতো এই বানানগুলিও তার নিজস্ব ও মার্কামারা। কিন্তু সত্যিই তার হঠাৎ কী বিপদ হল? হঠাৎ ভিকারাবাদেই বা সে কেন?

চোখে এই সব প্রশ্ন নিয়েই পরাশরের দিকে তাকালাম।

চিঠিটা তখন তার হাতে। তা থেকে চোখটা আমার দিকে তুলে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী করবে এখন? আমাদের ট্রেন আসতে তো আর দেরি নেই।'

'করবার আর কী আছে।' এক মুহূর্তে মনস্থির করে নিয়ে বলতে হল, 'সত্যি হোক আর কাল্পনিক হোক, জোয়ালাপ্রসাদ এই বিদেশ বিভুঁইয়ে বিপদে পড়েছে জেনে ট্রেনে চড়ে চলে যেতে পা-ই উঠবে না। সুতরাং চলো কোথায় কাকে জোয়ালা পাঠিয়েছে দেখা যাক।'

স্টেশনমাস্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে টিকিট দুটির রিফান্ড নিয়ে মোটঘাট সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। লাগেজ স্টেশনে রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে লাভ নেই। জোয়ালাপ্রসাদের সমস্যা এক বেলায় মিটিয়ে আসা যাবে এরকম ভরসা নেই।

স্টেশনের বাইরে গিয়েই একটু অবাক। স্টেশনমাস্টারের চাপরাশি বাইরে নিয়ে গিয়ে যা দেখাল তা তো শুধু জোয়ালাপ্রসাদের লোক নয়, সেই সঙ্গে তার গাড়িটাও। জোয়ালাপ্রসাদ তা হলে নিজের গাড়ি নিয়েই এখানে এসেছে। ড্রাইভার শুধু আলাদা।

কিন্তু হঠাৎ তার মতো মানুষের এই ভিকারাবাদের মতো জায়গায় আসবার কারণ কী? এখানে এমন কী বিপদে সে পড়তে পারে যাতে আমাদের পাবার জন্য সে যেন অকূলে কূল পাওয়ার মতো অস্থির হয়ে উঠতে পারে?

সবই কি তার কল্পনা? মালপত্র তুলে জোয়ালাপ্রসাদের গাড়িতে তার এখানকার আস্তানায় যেতে যেতে তার কথাই ভাবছিলাম।

জোয়ালার সঙ্গে আলাপ আমাদের বেশি দিনের নয়। বছর দুয়েকের মধ্যে সে কিন্তু আমাদের এক নাছোড়বান্দা ভক্ত ও বন্ধু হয়ে উঠেছে।

আলাপটা প্রথমে আমার সঙ্গে হলেও ভক্তিটা পরাশরের ওপরেই বেশি।

নাম শুনেই বোঝা যায় জোয়ালাপ্রসাদ বাঙালি নয়। দু-তিন পুরুষ তারা উত্তরপ্রদেশে কাটিয়ে কলকাতায় এক পুরুষ ধরে আছে। উত্তরপ্রদেশের আগে তাদের আদি বাস ছিল নাকি কাশ্মীরে।

আদি বাস যেখানেই থাক, জোয়ালাপ্রসাদ অন্তত বাংলা ভাষা দখল করে বাঙালি হবার জন্য এখন ব্যাকুল। উচ্চারণটা মারাত্মক হলেও মোটামুটি বাংলা সে পড়তে পারে। কিন্তু শুধু একটু পড়েই সে সন্তুষ্ট নয়, তার সর্বনাশা শখ হল বাংলা লেখবার।

এইটুকু বাঁচোয়া যে সে কবিতা লেখে না, লেখে গল্প। সে গল্প আবার সাধারণ সামাজিক ঐতিহাসিক কিছু নয়। গোয়েন্দা গল্প যাকে বলে।

এই গোয়েন্দা গল্প লিখে আমার কাগজে ছাপানো আর তাতে পরাশর বর্মার তারিফ পাওয়াই হল জোয়ালাপ্রসাদের স্বপ্ন।

পরাশর বর্মাকে আমার আগেই সে তার চাচা বিখ্যাত পণ্ডিত ট্রেডার্সের রামস্বরূপ কাউলের কাছে দেখেছে, কিন্তু পরাশরের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার অফিসে লেখা নিয়ে আসা-যাওয়ার পর।

বলা বোধহয় বাহুল্য যে জোয়ালাপ্রসাদের একটা গল্পও এখনও পর্যন্ত ছাপতে পারিনি। পরাশরের কবিতা যদি আবোলতাবোল হয় জোয়ালার ডিটেকটিভ গল্প বিকারের প্রলাপ।

এ হেন গল্প আর ততোধিক সাংঘাতিক বাংলা ভাষার নমুনা নিয়ে বার বার আমার অফিসে ধন্না দিতে আসা সত্ত্বেও কেন যে তাকে সসম্মানে একেবারে বাতিল করে দিইনি তার কারণ জোয়ালার একেবারে সরল, প্রায় ছেলেমানুষের মতো স্বভাব। কিছু হয়নি বলে বার বার বেশ কটু সমালোচনায় তার লেখা নস্যাৎ করে দিলেও তার রাগ অভিমান হতাশা কিছু নেই।

সবকিছু মেনে নিয়ে আধা বাংলা আধা ইংরেজিতে সে এসব প্রত্যাখ্যানের পর প্রায়ই একই কথা বরাবর বলে আসছে—'ও, এটা তা হলে রাইট গুড হয়নি বুঝি? ঠিক আছে। নেক্সট স্টোরিতে কী করি দেখবে! ভর্মাজি পর্যন্ত স্টার্টল হয়ে যাবে।'

পরের বার অবশ্য সেই এক পরিণামই হয়েছে তার গল্পের।

একটু সহানুভূতির সঙ্গেই বলেছি, 'আচ্ছা জোয়ালা, তোমার এ বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া শখ কেন? দোকানের একটা তেমন-তেমন গালিচা বেচলে একদিনে তোমার যা লাভ হবে সারা বছরে আমরা তা রোজগার করতে পারি না।'

'ছেড়ে দাও না, ফ্রেন্ড!' জোয়ালা তাচ্ছিল্যভাবে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, 'গালিচা বেচে আমার লাভ হবে কেন? দোকান কি আমার?'

'আহা, তোমার না হয় তোমার চাচার তো। তুমিই তো তার ওয়ারিশন।'

'না, না, আমি কেন হব!' জোয়ালা প্রতিবাদ করেছে, 'ও রতনচাঁদকে দেখোনি। চাচার ব্রাদার ইন-ল-র লেডকা। চাচার যা কিছু সব ওই পাবে, দেখে নিয়ো।' পরমুহূর্তেই এসব বাজে কথা যেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলে জোয়ালা বলেছে, 'আর ইনহেরিট আমিই যদি করি তাতে কী! একটা গল্পের মতো গল্প লেখার কাছে কিউরিও কি কার্পেট বেচে লাখ লাখ টাকা লাভ করাও কিছু নয়।'

'তা হলে তুমি আর এক কাজ করো না কেন?' এবার সত্যিই অন্য ভাল পরামর্শ দিয়েছি, 'তুমি তোমার নিজের ভাষায়, মানে হিন্দিতে গল্প লেখো না কেন? সেটাতে তোমার হাত অনেক ভাল খুলবে।'

'হিন্দিতে জাসুসি গল্প!' জোয়ালাপ্রসাদ বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে তার কঠিন সংকল্প জানিয়েছে, 'আমি বাংলায় লিখব, তুমি তা ছাপবে, আর দ্য গ্রেট পরাশর বর্মা তার তারিফ করবে—দেখে নিয়ো। এখন চলো একটা ভাল থ্রিলার ছবি এসেছে গ্লোব-এ। টিকিট করে এনেছি।'

ওজর আপত্তি যা-ই করি, জোয়ালাপ্রসাদের কাছ থেকে ছাড়া পাবার উপায় নেই। তার সঙ্গে কখনও ছবি দেখতে কখনও রেস্তোরাঁয় খেতে কখনও শুধু একটু তার মোটরে ঘুরে আসতে যেতেই হয়।

আগের কথাবার্তার নমুনা থেকেই বোঝা যাবে তার লেখা ছাপি বা না ছাপি সে আমার সঙ্গে 'তুমি' বলার মতো ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে ফেলেছে। ঘনিষ্ঠ না হয়ে উপায়ও নেই। আমাদের সংসর্গে থাকবার জন্য সে এত ব্যাকুল, আর কথায়বার্তায় ব্যবহারে তার আন্তরিকতা এত গভীর যে তাকে কষ্ট দিতে মায়াই হয়। তার লেখা ছাপতে পারি না বলেই তার অন্য অনুরোধ-উপরোধ একটু আধটু না শুনে পারি না।

মানুষটা এমনিতে সব সময়েই হাসিখুশি। এক-এক দিন শুধু চাপতে না পেরে মনের দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলে।

তার দুঃখ হওয়াটা অবশ্য খুব অন্যায় নয়। অপুত্রক রামস্বরূপের ভাইপো হিসেবে সে-ই বংশে বাতি দেবার একমাত্র অধিকারী। অথচ দুঃখ এই যে তার চাচা রামস্বরূপ তাকে অকর্মণ্য মনে করেন।

সে নিজেই স্বীকার করে যে পাকা কাজের লোক সে নয়। চাচার এই পৃথিবী-জোড়া খ্যাতির কোম্পানি সে হয়তো তাঁর মতো নিপুণভাবে চালাতে পারবে না। কিন্তু তা বলে রতনচাঁদের মতো ভণ্ড বকধার্মিক চোর তো সে নয়। নিজের ভাইপোর চেয়ে ওই শ্যালক পুত্র রতনচাঁদের ওপর চাচার বিশ্বাস অনেক বেশি। চাচা এমন অন্ধ যে তার বাইরের ভড়ং দেখেই ভুলে যান। এদিকে রতনচাঁদ যে চুরি করে তাঁর অমূল্য সব জিনিস লুকিয়ে পাচার করছে তা তিনি দেখতেই পান না।

চাচা হয়তো জোয়ালাপ্রসাদের ওপর অত উদাসীন হতেন না, কিন্তু ওই রতনচাঁদই কান ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে তাঁর মনটা অমন বিষাক্ত করে তুলেছে।

চাচা একটু চোখ খুলে রাখলে নিজেই অনেক কিছু বুঝতে পারতেন। কিছুদিন আগে পরাশর বর্মাকে যে পরামর্শের জন্য ডেকেছিলেন তার দরকার হত না।

চাচা রামস্বরূপ অত্যন্ত হুঁশিয়ার কারবারি। বয়স তাঁর সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এই বয়সেও ভাঙা শরীর নিয়েও তিনি কারবারের যথাসম্ভব তদারকি করবার চেষ্টা করেন।

কিছুদিন আগে থেকে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে তাঁর অমূল্য কয়েকটা জিনিসের খোঁজ

পাওয়া যাচ্ছে না। তার মধ্যে একটা তুর্কি রেশমি রাগ-এর দামই এখনকার শৌখিন সংগ্রাহকদের বাজারে লাখ টাকার বেশি।

এইসব ব্যাপার রামস্বরূপজি পুলিশে জানাতে চান না। পরামর্শের জন্য তিনি তাই তখন পরাশর বর্মার শরণ নেন। পরাশরকে জোয়ালাপ্রসাদ সেই সময়েই প্রথম দেখে আর তার কীর্তিকলাপের কথা শুনে মুগ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠে। জোয়ালাপ্রসাদের বাংলা শেখবার ঝোঁক হয়তো আগে থাকতেই ছিল, তবে বাংলায় গোয়েন্দা গল্প লেখার নেশা আর সেই সূত্রে আমার সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত তখন থেকেই।

পরাশর রামস্বরূপজিকে কী পরামর্শ দিয়েছিল জানি না। তাতে প্রত্যক্ষ ফল কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। জোয়ালাপ্রসাদের কাছেই কিছুদিন আগে জেনেছি যে ওই ধরনের আরও দামি জিনিস পণ্ডিত ট্রেডার্সের দোকান থেকে এখনও প্রায়ই উধাও হচ্ছে।

পণ্ডিত ট্রেডার্স প্রথমে শুধু গালিচা রাগ ইত্যাদির দোকান ছিল, তারপর রামস্বরূপ নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টায় সে ব্যবসাকে প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিরল কিউরিওর কারবার করে তুলেছেন। কার্পেট রাগ থেকে শুরু করে পাথর, হাতির দাঁতের জিনিস থেকে যে কোনও হাতের কাজের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্প নিদর্শনের জন্য পণ্ডিত ট্রেডার্স বিখ্যাত। সস্তা চটকে ঠকাবার অজ্ঞ বিদেশি টহলদারদের নয়, দেশ-বিদেশের এ সব জিনিসের সত্যিকার জহুরিরা তাই পণ্ডিত ট্রেডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

জোয়ালাপ্রসাদের কাছে তাদের কারবারের এই চুরি আর তার ওপর চাচা রামস্বরূপের বিরাগের কথা শুনে তাকে নিজেদের কারবারে আর-একটু মন দিতে বলেছিলাম। বলেছিলাম, 'তুমি তোমার চাচাজিকে কারবারে সাহায্য করো না বলেই নিশ্চয়ই উনি তোমার উপর বিরূপ। চেষ্টা করলে এই চুরির রহস্য তুমিও তো ফাঁস করে দিতে পারো। তুমি রোজ নিয়মিত দোকানে গিয়ে লক্ষ রাখলে হয়তো অনেক কিছু বের করতে পারো, তোমার চাচাজির পক্ষে যা জানা অসম্ভব। এইসব সূত্র আমাদের কাছে এসে জানালে পরাশরই তো তোমায় সাহায্য করতে পারে।'

'তা তো নিশ্চয় পারে!' জোয়ালা উদ্ভাসিত উৎসাহে বলেছে, 'পরাশর বর্মা ভেদ করতে পারে না এমন রহস্য আছে নাকি কোথাও! কিন্তু—'

'কিন্তু' বলেই আবার থেমে গিয়েছে জোয়ালাপ্রসাদ। বিষণ্ণ মুখে বলেছে, 'কিন্তু কারবারের সঞ্চলকে যে হাত করে রেখেছে ওই রতনচাঁদ। আমি রোজ হাজিরা দিলেও কিছু ধরতে পারব কি।'

পরমুহূর্তেই নিজের স্বভাবমাফিক সব দুঃখ দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাসি মুখে বলেছে, 'যাক গে, আমার আর কী লোকসান ওতে হবে। কারবারটার ভার চাচাজি হয়তো ওকেই দিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে একেবারে বঞ্চিত নিশ্চয়ই করবে না। আমার জন্যে সামান্য যদি কিছু বরাদ্দ করে দেয় তা-ই আমার যথেষ্ট। আমার তো মদ মেয়েমানুষের নেশা নেই। এই একটু খাওয়াদাওয়া বেড়ানো আর গাড়ি চালানো—এই হলেই আমি খুশি। আমার বেশি টাকার দরকার কী?'

'রতনচাঁদের টাকার খাঁকতি বুঝি খুব বেশি!' এবার ব্যাপারটা খানিকটা বুঝে জিজ্ঞাসা করেছি, 'মদটদ তো খায় জানি, অন্য বদখেয়ালও আছে?'

জোয়ালাপ্রসাদ প্রথম কিছু বলতে চায়নি। 'ওসব যার যার নিজের ব্যাপার। ও নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না,' বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়েই যেতে চেয়েছে। আমার পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত না জানিয়ে পারেনি যে রতনচাঁদের স্ত্রীলোক-ঘটিত বেশ গণ্ডগোলের ব্যাপার একটা আছে।

রতনচাঁদকে বারকয়েক পণ্ডিত ট্রেডার্সের শো-রুমেই ইতিমধ্যে দেখেছি।

সেখানে জোয়ালাপ্রসাদের জ্বালায় মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যেতে হয়েছে। সেখানে রতনচাঁদের

সঙ্গে সামান্য যা একটু-আধটু দেখা আর আলাপ হয়েছে তাতে মনটা তার ওপর প্রসন্ন হয়নি।

জোয়ালাপ্রসাদের কাছে তার কথা না শুনলেও তাকে দেখে ও আলাপ করে খুশি হতাম বলে মনে হয় না। একটা অত্যন্ত দাম্ভিক হামবড়া ভাব। জোয়ালাপ্রসাদের বন্ধু বলে আমাদের ওপর অবজ্ঞাটা যে বেশি সেটা সামান্য দুটো কথায় আর মুখের ভাবে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে। রতনচাঁদের বিদ্যাধরীকেও একদিন দেখবার সুযোগ মিলে গেল। বিকেলের একটা সিনেমা শোর পর জোয়ালা আমাদের জোর করে যে রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেছল সেটা বিশুদ্ধ ভোজনালয় নয়। পানাহার দুইয়েরই ব্যবস্থা সেখানে আছে।

জোয়ালার সেখানে আগে থাকতে রিজার্ভ করা টেবিল ছিল না। আমাদের তাই বাইরের দিকের একটা টেবিলেই বসতে হয়েছিল। খাবারের জন্যে অপেক্ষাও করতে হয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার সামনেই হল-এর উলটো দিকে কয়েকটি কাঠের পার্টিশন দেওয়া ডাইনিং কেবিন।

আমরা বাইরের টেবিলে অপেক্ষা করতে করতেই হঠাৎ দরজার দিকে চোখ যাওয়ায় দেখলাম রতনচাঁদ নিভাঁজ ডিনার স্যুটে এক সঙ্গিনীকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকছে। সঙ্গিনীর দিকে চাইলে প্রথম পোশাক প্রসাধনই চোখে পড়ে, কিন্তু সে বাহার ছাড়িয়ে চেহারাটা লক্ষ করলে হতাশ হতে হয়। রংটাই ফরসা এইমাত্র, নইলে রীতিমতো কুৎসিতই বলা উচিত।

রতনচাঁদ এখানে যে বেশ পরিচিত ও সম্মানিত তা ভেরি স্যান-এর কুর্নিশ করা আর হেড বয়-এর সসম্ভ্রমে এগিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝলাম।

আমাদের হয়তো রতনচাঁদ তখনও দেখতে পায়নি।

কিন্তু এর মধ্যে পরাশর অমন এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসবে কে জানত!

রতনচাঁদকে হেড বয় তখন তার কেবিনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে পরাশর সে প্রসেশনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে দু হাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'নমস্তে, রতনচাঁদজি। আপনার সঙ্গে কিছু বাতচিত ছিল। মেহেরবানি করে পাঁচ মিনিট যদি সময় দেন।'

রতনচাঁদ মুখে স্পষ্ট ভ্রূকুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে পরাশরকে শুধু নয়, আমাদের পর্যন্ত যে দেখতে পেয়েছে তা তার মুখের ভাব আরও কঠিন হয়ে ওঠাতেই বোঝা গেল। চোখে মুখে সেই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য বিন্দুমাত্র গোপন না করে আপাদমস্তক পরাশরকে একবার যেন ঘৃণ্য কোনও জীবের মতো দেখে নিয়ে দাঁতে চিবানো বিরক্ত গলায় সে জানালে, 'দুঃখিত, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আমি যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে কথা বলি না।'

কথাটা বলেই সে সঙ্গিনীকে নিয়ে হেড বয়-এর খুলে ধরা ফোল্ডিং ডোর দিয়ে তার কেবিনে গিয়ে ঢুকল। পরাশর যে পেছনে 'ও, আমিও দুঃখিত' বলে ভুল স্বীকার করলে তা কানে বোধহয় শুনল না।

পরাশর টেবিলে ফিরে আসবার পর খুব তিক্তভাবে তাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম মনে আছে। বলেছিলাম, 'তোমার কি সত্যি ভীমরতি ধরেছে? যেচে এ অপমান সইবার কিছু দরকার ছিল?'

'ছিল, ছিল,' বলে হাসতে হাসতেই পরাশর তার সিট-এ বসে বলেছে, 'অপমান যে করবে তা তো জানতামই। কিন্তু এ সুযোগ না নিলে ওঁর মোহিনীটিকে এত ভাল করে দেখতে পেতাম!'

'কী দেখলে, কী?' আমি তখনও ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিলাম, 'দেখবার কিছু আছে! একেবারে তো জলার পেত্নি।'

'আছে, সেইটাই তো দেখবার'—পরাশর তবু তার ভুল স্বীকার করেনি— 'রতনচাঁদজির রতন চেনবার চোখটি কী রকম তা তো জানা দরকার।'

তার আরাধ্য হিরো পরাশর বর্মার এ অপমানে জোয়ালা তখন মরমে মরে গিয়েছে। প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখে সে বলেছিল, 'তবু কেন ওই ছোটলোকটাকে এ সুবিধে দিলেন, বর্মাজি? উর্মিলাকে দেখাই যদি আপনার ইনটেনশন ছিল তা হলে আমায় বললে আমি তো আপনাকে ভাল করে আমাদের শো-রুমেই দেখিয়ে দিতে পারতাম।'

'মেয়েটির নাম বুঝি উর্মিলা।' আমিই অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কিন্তু তোমাদের শো-রুমে? উর্মিলাও সেখানে একটা কিউরিও নাকি? কই, আমাদের তো চোখে পড়েনি এ পর্যন্ত?'

'উর্মিলা অফিসের অ্যাকাউন্টসে কাজ করে,' জোয়ালাপ্রসাদ বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'শো-রুমের পেছনে সে বসে। আমি অবশ্য পারচেজের হিসাব জানবার ভান করে তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম অনায়াসে।'

'নিয়ে যাওনি বলে ধন্যবাদ,' আমি হেসে বলেছিলাম, 'ওরকম কিউরিওতে আমার টান নেই। পরাশরই ওসবের কদর বোঝে।'

পরাশর কিন্তু এসব ঠাট্টার খোঁটা গ্রাহ্য না করে বেশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিল, 'উর্মিলা তোমাদের অ্যাকাউন্টসে কাজ করে?'

'তাইতেই ওর দাম বেড়ে গেছে বোধহয়,' বলে আমি হেসেছিলাম।

জোয়ালাপ্রসাদের কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হওয়ার পর মনে হল গাড়িতে তো বেশ খানিকক্ষণ আগেই চড়েছি, এখনও জোয়ালাপ্রসাদের বাসায় পৌঁছতে পারলাম না। এ গাড়ি কোথায় তা হলে চলেছে? কতদূরে বাসা নিয়েছে জোয়ালাপ্রসাদ!

ড্রাইভারকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, 'তুমি যাচ্ছ কোথায়? সমস্ত ছাড়িয়েই চলে যাচ্ছ যে।'

'আজ্ঞে, তিনি শহরের বাইরেই থাকেন যে' ড্রাইভার জবাব দিলে।

'শহরের বাইরেই থাকেন? দাঁড়াও, দাঁড়াও!' এবার কথাগুলো আমার নয়, পরাশরের।

গাড়ি তখন শহরের অন্য প্রান্তের কাছাকাছি একটা বাজারগোছের জায়গার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

খুব বড়মানুষি এলাকা নয়। পুরনো ধরনের বাড়িঘর দোকান। বাড়িঘর থেকে সব কিছুতে ইসলামি প্রভাবটা খুব স্পষ্ট নয়।

এখানে হঠাৎ গাড়ি থামাতে বলার মানে কী?

মানে যখন বোঝা গেল তখন আমি শুধু নয়, ড্রাইভার পর্যন্ত তাজ্জব।

গাড়ি থামাবার পর ও' থেকে পরাশর একা নেমে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়াতে প্রথমটা তার উদ্দেশ্যটা জানতেই পারিনি।

যেখানে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা একটা ঘুড়ি-লাটাইয়ের দোকান। এ সব দোকান সাধারণত যেমন হয় তেমনই নেহাত ছোট পানের দোকানের মতো একটু উঁচু পাটাতনের ওপর পাতা, দোকানের চারি দিকে রঙিন ঘুড়ি-লাটাই আর ঘুড়ির কাগজে সাজানো।

পাড়াটা এ অঞ্চলের পতঙ্গ-বিলাসী ছেলেদের। এরকম ঘুড়ির দোকান এ রাস্তায় ঢোকবার পর আরও কয়েকটা দেখেছি।

পরাশর সে দোকানে কোনও কিছু খবর জানতে নেমেছে ভেবে তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে তার কথাবার্তা শুনে নিজের কানকেই বিশ্বাস করব কি না ভেবে পেলাম না।

পরাশর সে দোকানে দরাদরি করে ঘুড়ি লাটাই কিনছে।

আর কিনল যা সে কি একটা ঘুড়ি! নানা রঙের ঘুড়ি পুরো এক কুড়ি তো বটেই, তার সঙ্গে দুটো বড় ছোট লাটাই আর যা সুতোর বান্ডিল তাতে মনুমেন্ট থেকে পরেশনাথের

pathagar.net

মাথা পর্যন্ত চার দফা ঘুড়ি ছোঁয়াবার কাজ সেরেও কিছু ফাউ থাকে।

ঘুড়ির দোকানদারের যে খুশি ধরে না তা বলাই বাহুল্য। সে নিজে তার এক অনুচরের সঙ্গে সেই ঘুড়ির সুতোর বাণ আকর্ণ বিস্তৃত হাসির সঙ্গে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

হাসিটা শুধু তার হঠাৎ দাঁও মারার সৌভাগ্যের জন্য বোধহয় নয়। পরাশরের মতো এমন একটা সৃষ্টিছাড়া পাগল স্বচক্ষে দেখার গর্বও তার ভেতর বোধহয় মিশেছিল।

সেই মালের বাণ নিয়ে গাড়ি ছাড়বার পর একটু বিরক্ত মুখেই পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো, হেড অফিসে কি সত্যি সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে! কোন উর্দু কাগজের উড়ো খবর পেয়ে ভিকারাবাদে এসেছিলে। তারপর ফিরে যেতে যেতে বিপন্ন বন্ধুর ডাক শুনে এখন তার কাছে চলেছ। তার মধ্যে এসব ঘুড়ি লাটাই নিয়ে কী করবে?'

'কী করব?' পরাশর যেন বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। 'মানে ওগুলো দেখে হঠাৎ বড় লোভ হল। এত ভাল ঘুড়ি অনেক দিন দেখিনি কিনা!'

'ভাল ঘুড়ি দেখে কিনে ফেললে?' রেগে বললাম, 'ঘুড়ি কি খাবার না দেয়ালে টাঙিয়ে সাজিয়ে রাখবার জিনিস? ঘুড়ি ছোটরা ওড়ায়। তুমি কি ওগুলো ওড়াবার জন্য কিনেছ?'

'তা ওড়ালে ক্ষতি কী?' পরাশর এবার যেন মরিয়া হয়ে স্বীকার করে বললে, 'এ তো বিদেশ বিভুঁই, এখানে কে কী বলবে তার জন্যে পরোয়া না করলেও চলবে। তা ছাড়া জোয়ালাপ্রসাদ যে বাড়ি নিয়েছে সেটা শুনছি শহরের বাইরে। তাই একটু ঘুড়ি যদি ওড়াই তাতে দোষ তো কিছু নেই।'

'না, তা নেই,' পরাশরের যুক্তির বহরে এবার হেসে ফেলেই বলতে হল, 'কিন্তু যাচ্ছ এক বন্ধুর বিপদ সামলাতে, ঘুড়ি ওড়াবার সময় তুমি পাবে?'

সময় যে কী পরিমাণ পাওয়া যাবে তখনই যদি জানতে পারতাম।

এর পরে যা ঘটবে তার কতটুকু বা অনুমান করতে পেরেছি?

পারলে আগে থাকতে কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করা যেত।

না বোধহয়। কারণ এর ঘটনার ধারা পরিণতিটা এমন যে, অবাধে তা বইতে না দিলে নিজের সমস্যা সমাধানের রাস্তা বার করতে পারত না।

বিকেলের দিকে [illegible] থেকে বেরিয়েছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে শহরের বাইরে জোয়ালাপ্রসাদের এক [illegible] আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলাম।

বেশ ফাঁকায় বাগান ঘেরা পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো গোছের বাড়ি। নির্জন শান্তিতে থাকবার পক্ষে বেশ চমৎকার জায়গা।

কিন্তু এই ভিকারাবাদে জোয়ালাপ্রসাদ স্বাস্থ্যোদ্ধার কি নির্জনবাসের জন্য নিশ্চয় আসেনি। শহর থেকে দূরে এ রকম একটা বাড়ি সে থাকবার জন্য ঠিক করলে কেন?

গাড়িটা বাড়ির হাতায় ঢোকবার সময় সবচেয়ে কৌতুক বোধ করলাম পরাশরের কথা ভেবে। তার ঘুড়ি ওড়ানোর শখ মেটাতে হলে এখানে বাগানে দাঁড়িয়েই শখ মেটাতে হবে। ঘুড়ি ওড়াবার ছাদ এ বাড়ির নেই। বাংলো বাড়ির যেমন হয় তেমনই বাহারে টালিতে ছাওয়া দুদিকে গড়ানো ছাদ। হাতা দিয়ে ঢুকে বাংলো বাড়ির গাড়িবারান্দায় মোটরটা আসবার পর তা থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মনোভাবটা ঠিক প্রসন্ন কৌতুকের আর রইল না। তখন থেকেই কেমন একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। যে অস্বস্তির কারণটা জোয়ালাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হবার পর কিছুটা অন্তত স্পষ্ট হল।

গাড়ি এসে থামবার পরেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দুজনকে গাড়িবারান্দার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

তাদের একজন এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছিল। আর-একজন আমরা নেমে আসার পর ইঙ্গিত করে দুজন অনুচরকে ডাকিয়ে পরাশরের কেনা ঘুড়ির কাঁড়ি সমেত আমাদের মালপত্র

নামাবার ব্যবস্থা করে আমাদের বেশ খাতির করে জোয়ালাপ্রসাদের কাছে নিয়ে গেছল।

বাংলোটি খুব ছোটখাটো নয়। মাঝখানের হল আর বেশ কয়েকটা কামরা পেরিয়ে জোয়ালাপ্রসাদের ঘরে পৌঁছেছিলাম।

আমাদের আনতে গাড়ি পাঠিয়েও কেন যে সে নিজে বাইরে আমাদের নামবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেনি তা বোঝা গেছল ঘরে ঢুকেই।

জোয়ালাপ্রসাদ সেখানে একটি বিছানায় তাকিয়া বালিশ হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত। অভ্যর্থনার জন্য যে লোকটি সঙ্গে এসেছিল ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই সে নমস্কার করে চলে গেল।

আমরা তারপরই ব্যস্ত হয়ে জোয়ালাপ্রসাদের বিছানার ধারে আমাদের জন্য দুটি ছোট চৌকি গোছের আসনে গিয়ে বসলাম।

'কী ব্যাপার কী, জোয়ালাপ্রসাদ?' আমার তখন আর ধৈর্য ধরবার অবস্থা নেই, 'তুমি এখানে বিছানায় শুয়ে। আবার বিপদে পড়ে আমাদের ডাকিয়ে এনেছ—এ সবের মানে কী?'

'একটু আস্তে, দোস্ত!' জোয়ালাপ্রসাদের মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি—'এক এক করে সবই বলছি। বলবার জন্যেই ডাকিয়ে এনেছি। তবে তোমাদের যে আসতে দেবে সে আশা করিনি।'

'সে আশা করোনি!' সবিস্ময়ে বললাম, 'এ তো আর-একটা রহস্য আগের তালিকায় যোগ হল। বেশ এক এক করে সব ক টার জবাব দাও।'

'সবার আগে এ বাড়িতে কবে থেকে বন্দি সেই কথাটা জানাও।' পরাশর এ অদ্ভুত প্রশ্নটা করে আমাকেও অবাক করে দিলে।

'এ বাড়িতে বন্দি কী রকম?' আমি সবিস্ময়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

'কী রকম তা জোয়ালাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করো।' জবাব দিলে পরাশর।

বিমূঢ় হয়ে একবার পরাশর আর-একবার জোয়ালার দিকে তাকিয়ে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'আমার বুদ্ধি একটু মোটা, ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে দেবে?'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি।' জোয়ালাপ্রসাদ একটু হেসে এবার বললে, 'তবে বুদ্ধি তোমার মোটা নয়, মনটা একটু বেশি সরল। নইলে ভৈরজি যা লক্ষ করেছেন তুমিও নিশ্চয় তা করেছ।'

হঠাৎ অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়ে এবার জোয়ালাকে বললাম, 'লক্ষ করবার জিনিস মানে তোমার এই অনুচরদের কথা বলছ? আমাদের অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যারা গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল?'

জোয়ালা ও পরাশর দুজনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে সত্যি চিন্তিতভাবে বললাম, 'দুজনকেই, না শুধু ওদের দুজনকেই কেন, আমাদের মালপত্র যারা নামাল সেই চাকরবাকরদের পর্যন্ত কেমন একটু বেশি চোয়াড় গুন্ডা গোছের লেগেছে সত্যিই। সব যেন কোনও জেলখানা থেকে বার করে এনে কাজে লাগানো হয়েছে। কেমন একটা অস্বস্তি প্রথমেই তাই মনে হয়েছিল, তবে সেটার অর্থ এমন সাংঘাতিক তা ভাবতে পারিনি।' একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু এখানে আমাদের যে আসতে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে অবাধে যে কথা কইছি এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে?'

'তোমাদের আসতে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়াও ওদের ষড়যন্ত্রের একটা প্যাঁচ বলেই বোধহয়,' বলল জোয়ালাপ্রসাদ, 'আমাদের বাংলা কথা অবশ্য ওরা কেউ বোঝে না।'

'ওরা-ওরা বলছ? এই ওরা কারা? তোমায় বন্দি করে এখানে রাখা কাদের ষড়যন্ত্র?' বিমূঢ়ভাবে জোয়ালার দিকে তাকালাম।

'কাদের নয়! বলো কার,' জোয়ালাপ্রসাদ ধীরে ধীরে অত্যন্ত হতাশভাবে বললে, 'যার কৌশলে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, এ বাড়ি যার চক্রান্তে অসন্দিগ্ধভাবে ভাড়া নিয়ে কার্যত বন্দি হয়ে আছি, এমনকী আমার এই অসুখটার মধ্যে যার হাত আছে বলে আমার ধারণা সে কে এখনও বুঝতে পারছ না?'

'রতনচাঁদ!' আমি প্রায় ধরা গলায় উচ্চারণ করলাম, 'এখানে পর্যন্ত সে তার জাল ছড়িয়ে রেখেছে! কিন্তু কেন?'

'কেন সেটা বোঝা কিছু শক্ত নয়,' বললে জোয়ালাপ্রসাদ, 'কিন্তু তার জাল যে এতদূর পর্যন্ত এমনভাবে ছড়ানো হতে পারে সেইটেই কোনওমতে কল্পনাও করতে পারিনি। গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বললেই বুঝতে পারবে।'

জোয়ালাপ্রসাদের ধারাবাহিকভাবে তার ভিকারাবাদ অধ্যায়ের বিবরণ বলা কিন্তু পরাশরের পছন্দ হল না।

'তোমার একটানা সবকিছু বলতে হবে না। তার সময় না-ও মিলতে পারে।' পরাশর বললে, 'বরং আমরা যা প্রশ্ন করে যাচ্ছি তুমি তার উত্তর দিয়ে যাও।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে পরাশর।' আমি সমর্থন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি হঠাৎ এ ভিকারাবাদে কেন, সেইটে আগে বলো।'

'ভিকারাবাদে আমায় পাঠানো হয়েছে বলে,' বললে জোয়ালাপ্রসাদ। 'আদেশটা কড়াভাবে চাচাজিই দিয়েছেন, কিন্তু তার পেছনে মন্ত্রণাটা সম্পূর্ণভাবে রতনচাঁদের। চাচাজির এ রকম অসুখের সময় আমায় এখানে পাঠানোর মধ্যে অনেক কিছু মতলব আছে।'

'তোমার চাচাজি, মানে রামস্বরূপজির অসুখ!' পরাশর উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কবে থেকে?'

'তা আমি আসবার অন্তত সাতদিন আগে থেকে,' জোয়ালাপ্রসাদ একটু মনে করে নিয়ে বললে, 'বুড়ো হয়ে ভুগছেন অনেকদিনই, কিন্তু রোগটাতে বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে ওই সময় থেকে।'

'এই অসুখের মধ্যেও তিনি তোমায় এই ভিকারাবাদে আসতে হুকুম করলেন!' অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

'তোমরা যে জন্যে এখানে এসেছ, সেই জন্যে।' এবার জোয়ালার মুখে একটু ম্লান হাসি দেখা গেল, 'দর্পণা দেবীর পুজো [illegible] দেওয়ানী দেবীর কাছ থেকে চাচাজি যা জানতে চান তা জেনে নিয়ে যেতে আমাকে [illegible]। আর চাচাজির কী জিজ্ঞাসা তা ভাবতেও পারবে না বোধহয়।'

'একটু বোধহয় [illegible]' জানালে পরাশর, 'তাঁর নিজের অসুখবিসুখ পরমায়ুর কথা নয়, তোমাদের কারবার সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন মনে হয়।'

'হ্যাঁ,' জোয়ালা পরাশরের সঠিক অনুমানটাই বিস্তারিত করে বোঝালে, 'বর্মাজিকে যে জন্যে চাচাজি একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের কারবারের সে রহস্যজনক চুরি বন্ধ হয়নি। সেই থেকে সমানে চলছে। একটা-দুটোর খবর মাত্র খবরের কাগজে বার হয়েছে। দু-একটার পর চাচাজির হুকুমে এসব খবর বার করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চাচাজি এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশে যেতে নারাজ। রতনচাঁদ নিজের স্বার্থেই নিশ্চয় তাঁকে বুঝিয়েছে যে পুলিশকে এসব ব্যাপারে ডাকলে জানাজানি হয়ে কারবারের ক্ষতি হবে।'

'পুলিশ, গোয়েন্দা এসবের বদলে তোমায় চাচাজি এ রহস্যের মীমাংসার জন্যে এই দেওয়ানীর কাছে পাঠিয়েছেন?' আমার গলার বিদ্রুপটা অস্পষ্ট না রেখেই বললাম, 'তোমাদের চোরাই সব মালের কিনারা হয়ে যাবে এই বুজরুকির ঘাঁটিতে।'

'বুজরুকি বোলো না।' পরাশর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলে, 'তোমার নিজের কী হয়েছিল সেটা মনে করো, মনে করো আমাদের যাওয়াটা ঠিক বন্ধ হবার ব্যাপারটা, তা ছাড়া বদ্রীদাস যা সব বলেছে সেগুলোর কথাও মনে রেখো।'

'তুমি যাই বলো,' আমি জোরের সঙ্গে বললাম, 'আমি তোমাদের দেওয়ানীর সমস্ত কাণ্ডকারখানাই বুজরুকি বলে মনে করি। আমি তার কোনও ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না।'

'আমিও করি না।' জোয়ালাপ্রসাদ আমায় সম্পূর্ণ সমর্থন জানালে, 'মেয়েটা একেবারে পয়লা নম্বরের ঠগী। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, বর্মাজি। সত্যিই আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনার মতো মানুষ নিজের চোখে দেখেও কী করে ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করে। আমি তো এখনও চোখেই দেখিনি, তবু—'

'চোখেও দেখোনি?' কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে পরাশর বললে, 'চোখে দেখলে আমার মতোই বিশ্বাস করতে। কিন্তু চাচাজি পাঠানো সত্ত্বেও তুমি এখনও দেওয়ানী দেবীকে চোখে দেখোনি কেন?'

'সেইটেই অদ্ভুত ব্যাপার, বর্মাজি।' জোয়ালাপ্রসাদ দুঃখের সঙ্গে জানালে, 'এর পেছনেও রতনচাঁদের হাত আছে বলে মনে করি। প্রথম এখানে আসবার পর অনেকবার চেষ্টা করলেও দেওয়ানী দেবী আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায়নি। তারপর আমি তো নিজেই অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে আছি। তোমাদের সাহায্য এই জন্যেই আমাদের দরকার।'

'সাহায্য যা দরকার, করব।' আশ্বাস দিয়ে বললে পরাশর, 'কিন্তু একটা কথা যদি জানো তো আগে বলো। তোমার চাচাজি এইরকম একটা অজানা দূর মফস্‌সলে দেওয়ানীর মতো একজন জাতিস্মর ভূত-ভবিষ্যৎ-জানা মেয়ের কথা কবে কী করে জানলেন?'

'আজ তো নয়,' জোয়ালা আমাদের অবাক করে বললে, 'তিনি তো অনেক কাল আগে থেকেই দেওয়ানীর এই সব অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানেন, আর দেওয়ানীকে তো জানেন তার জন্মের আগে থেকেই।'

'তার মানে?' আবোলতাবোল বকছে ভেবে একটু সন্দিগ্ধভাবেই জোয়ালাপ্রসাদের দিকে তাকালাম।

মানেটা বুঝিয়ে দিলে জোয়ালাপ্রসাদ। বললে, দেওয়ানীরা তো আদিতে কাশ্মীরি পণ্ডিত। আমরাও তাই। দেওয়ানীর গণক পরিবারের সঙ্গে চাচাজির তাই অনেক আগে থেকেই জানাশোনা। ওঁরা অনেককাল থেকেই পরস্পরের খোঁজখবর নিয়ে যোগাযোগ রেখেছেন।'

'হুঁ,' বলে গম্ভীর হয়ে কী যেন ভেবে নিয়ে পরাশর এবার বললে, 'এখন তুমি কী সাহায্য আমাদের কাছে চাও বলো।'

'আমার তো এখনও বিছানা থেকে ওঠা বারণ।' জোয়ালাপ্রসাদ বললে, 'আর সুস্থ থাকলেও দেওয়ানী আমার সঙ্গে দেখা করবে না। আপনারা মানে বিশেষ করে কৃত্তিবাসের কথা বলছি, ও যদি দেওয়ানীর সঙ্গে দেখা করে আমার হয়ে চাচাজির প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে আসে।'

'বিশেষ করে আমার কথা বলছ কেন?' গলাটা খুব প্রসন্ন রাখতে পারলাম না, 'তোমার হয়ে আমি গেলে দেওয়ানী দেবী দেখা করে সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন, এ কথা মনে করছ কেন?'

'করছি মানে', জোয়ালার মুখে একটু হাসির আভাস যেন দেখলাম—'দেবী তোমার ওপর একটু বেশি প্রসন্ন শুনলাম কিনা।'

জোয়ালার কথায় পরাশরের মুখেও সেই হাসির প্রতিফলন দেখে বেশ গরম হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার সঙ্গে দেওয়ানী তো দেখা করতেই চায়নি বলছ। আমার সম্বন্ধে এ খবর তা হলে শুনলে কী করে?'

'আহা, দেখা করতে পারিনি বলেই তো তোমাদের খবর জানতে পারলাম বদ্রীদাসের কাছে।' জোয়ালা জানাল, 'তার কাছে খবর না পেলে এমন শেষ মুহূর্তে তোমাদের স্টেশনে ধরে এখানে আনাতে পারি!'

'আনিয়ে কিছু লাভ হবে কিনা জানি না।' পরাশর বেশ চিন্তিতভাবে বললে, 'তবে একের জায়গায় তিন মাথা একসঙ্গে লাগালে হয়তো উপায় কিছু বার হতে পারে। কাল কৃত্তিবাসকে নিয়ে একবার মোতিকোঠিতে গিয়ে দেখব।'

মোতিকোঠিতে যাওয়া কিন্তু আমাদের হল না। বাংলোবাড়ির বাগানের মধ্যে ঘুরে ফিরে

বেড়াবার বাধা না থাকলেও আমরা যে বন্দি, পরের দিন মোতিকোঠিতে যাবার প্রস্তাবেই বুঝতে পারলাম।

প্রথম এখানে নামবার সময় যাদের অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম তাদের দু-জনের নাম মূলরাজ আর পুর্তু। এ বাংলো বাড়ি আর তার সঙ্গে এখানকার ভাড়াটিয়াদের দেখাশোনা করার ভার তাদের ওপর।

এ বাড়ির আসবাবপত্রের মতো আনুষঙ্গিক অনুচর হিসেবে যাদের থাকবার কথা তারাই জোয়ালাপ্রসাদের বেলা কয়েদখানার জমাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূলরাজই প্রধান। পরের দিন সকালে তার কাছে আমাদের ইচ্ছেটা জানাতে এক কথায় যেরকম সসম্ভ্রমে সে সম্মতি জানালে তাতে তার শয়তানি মতলবটা কল্পনা করতেও পারিনি।

বেলা ন-টার মধ্যে আমাদের রওনা হবার কথা। সাড়ে ন-টা বাজতেও জোয়ালার গাড়ি না আসাতে জোয়ালার চেয়ে আমরাই বেশি অস্থির হয়ে উঠলাম। বাংলোর এক কোণে একটা ছোট অফিসঘরে মূলরাজ বসে। শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে তাগাদা দিতে হল।

'গাড়ি এখনও আসেনি।' মূলরাজ ব্যস্ত হয়ে নিজেই খবর নিতে বেরিয়ে গেল। সেই যে গেল আর তার দেখা নেই। গাড়ি তো এলই না, কারও কাছে কোনও খবরই পাওয়া গেল না।

বেলা এগারোটা নাগাদ রাগ করে নিজেই টাঙ্গা গোছের কিছু ভাড়া করবার জন্য বাইরে যেতে গিয়ে আমাদের সত্যকার অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। বাইরে বেরোবার লোহার প্রকাণ্ড গেটে তালা দেওয়া। সে তালার চাবি কার কাছে কেউ বলে না। মূলরাজ নেই। তার নীচের লোক পুর্তু বোবা হয়ে শুধু অসহায়তার ভঙ্গিই করল।

জোয়ালাপ্রসাদকে গিয়ে সব কথা বলতেও হল না। এর পর। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই সে হতাশ মুখে বললে, 'বেরোতে পারলে না তা হলে? গাড়িও নেই? বাইরের গেটেও তালা বন্ধ! এতটা করবে ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু বোঝা উচিত ছিল।' তিক্ত মুখে বললে পরাশর, 'কাল তোমার ডাক্তারকে দেখেই আসল চেহারা আর লুকোনো যাবার কথা নয়।'

পরাশর ভুল কিছু ঠাওরায়নি। গতকাল জোয়ালাপ্রসাদকে যে দেখতে এসেছিল সেই ডাক্তারই এক হিসাবে তার শত্রুদের মতলবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

লোকটা যে পুরোপুরি জাল তা ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে তার ঢোকার ধরন থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। যেভাবে বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়েছিল আর বিশেষ করে প্রেশার মাপবার জন্য হাতে রাবার টিউব বেঁধেছিল তাতে শুধু আনাড়িই নয়, ডাক্তারি সম্বন্ধে একেবারে গণ্ডমূর্খ বলে বুঝতে দেরি হয়নি।

তার ওই পরীক্ষা শেষ হবার পর পরাশর যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী দেখলেন ডাক্তারসাব? এবার একটু চলাফেরা করতে পারবে?'

'নেহি—নেহি।' ডাক্তার প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'অভি এক মাহিনা অ্যায়সা রহনা পড়েগা। নেহি তো হার্ট ফেল যায়েগা।'

'হার্ট ফেল যায়েগা?' পরাশর কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে কী করে মুখ গম্ভীর রেখেছিল সে-ই জানে। আমারও হাসি চাপা যেমন শক্ত হয়েছিল তেমনই হয়েছিল জাল ডাক্তারের কানটা ধরে একটু নেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে।

আজ কিন্তু হাসির বদলে রীতিমতো রাগেই গা জ্বলে যাচ্ছিল।

'এই ভিকারাবাদে এসে এমন একটা বাড়ি তুমি কী বলে ভাড়া করলে!' জোয়ালার ওপরই রেগে উঠলাম, 'একটু দেখে শুনে নিতে পারোনি?'

'দেখতে শুনতে এ বাড়ি কি অপছন্দ হবার?' জোয়ালা দুঃখের হাসি হাসল, 'তা ছাড়া

বাড়িটার খবর ওই মোতিকোঠি থেকেই পেয়েছিলাম যে। এখানে বাসা খুঁজছি শুনে ওই বদ্রীদাসই খবর দিয়েছিল।'

'বদ্রীদাসই দিয়েছিল! আশ্চর্য তো—'পরাশর একটু চুপ করে থেকে কী যেন একটা ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু এ বাড়ির ব্যাপারটা একটু বোঝবার পর এখান থেকে অন্য কোথাও যাওনি কেন? চাচাজিকে সব কথা জানিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতেও তো পারতে।'

'না, না, তা পারতাম না। চাচাজিকে সব জানিয়ে চিঠি আমি দিয়েছিলাম। সে চিঠি তিনি যে পেয়েছিলেন এই টেলিগ্রাফটাই তার প্রমাণ।' বিছানার ওপাশের একটা ছোট টেবিলের ওপর থেকে একটা টেলিগ্রাফের কপি পরাশরের হাতে দিয়ে জোয়ালা বললে, 'কিন্তু পড়ে দেখুন টেলিটা।'

পরাশর পড়ে আমার হাতে দিল। বেশ কিছুকাল আগের টেলিগ্রাম। পর পর একগাদা পোস্টাফিসের স্ট্যাম্পের ছাপ পড়ে ধ্যাবড়া কালির দাগে তারিখটারিখ সব মুছে গেলেও সংক্ষিপ্ত বার্তাটা ঠিক মতোই পড়া যায়।

'DONT RITURN IF NOT FACTS—CHACHAJI

যেমন ইংরেজি তেমনই বানান। তবে মানেটায় কোনও অস্পষ্টতা নেই।

—যা জানতে পাঠিয়েছি তা না জেনে ফিরো না—এই হল চাচাজির আদেশ।

'যাই থাক এ টেলিগ্রামে', পরাশর একটু ভেবে ভেবে বললে, 'তোমার চাচাজির যে রকম অসুখ বলছ, তাতে জোর করে চলে গিয়ে সেখানেই তোমার এখন থাকা উচিত নয় কি?'

'সেই থাকাটা বন্ধ করবার জন্যেই তো এই বন্দি রাখার ব্যবস্থা।' তিক্তভাবে হাসল জোয়ালাপ্রসাদ।

'এ সময়ে তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া কেউ একজন তা হলে চাইছে না,' বলে গম্ভীর হয়ে একটু ভেবে নিয়ে পরাশর বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'ঠিক আছে, উপায় একটা বার করতে হবে।'

উপায় একটা বার হল ঠিকই। বাংলো বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের ঘোরাফেরার কোনও বাধা নেই। দিনের বেলা নয়, গভীর রাতে সাবধানে চারিদিকে টহল দিতে দিতে পরাশর একদিন দরজাটা আবিষ্কার করল।

বাংলো বাড়ির বাগান সুদ্ধ ঘেরা সাত হাত উঁচু জেলখানার মতো দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় নেহাত ছোট একটা পুরনো দরজা। এককালে এই দিকটায় একটা আস্তাবল গোছের ছিল বোধহয়। সে আস্তাবলের ঘোড়া-সহিসের সহজে বাইরে যাবার জন্য দরজাটা বোধহয় ব্যবহার করা হত।

আপাতত বহুদিন ধরে সে দরজা বন্ধ হয়ে শ্যাওলায় আর বুনো লতাপাতায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে।

ভাগ্যের কথা দরজাটা একটু কষ্ট করার পর খুলতেও পারা গেল। বার হবার রাস্তা একটা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে জোয়ালা এখানকার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে তার গাড়িটা বাইরে এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করল।

বাংলো বাড়ির অন্য লোকজন যা-ই হোক, ড্রাইভার যে তাদের দলে নয়, মোতিকোঠিতে যাওয়া বন্ধ হবার পরদিনই তা জানা যায়। ড্রাইভার রঙ্গুলাল এক সময়ে গোপনে তার নিরুপায় অবস্থাটা জানিয়ে দিয়েছিল।

সেই থেকে তার সঙ্গে গোপন পরামর্শে সব আয়োজন করে একদিন গভীর রাত্রে বাংলো বাড়ি থেকে পালালাম।

ইতিমধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ও প্রায় অবিশ্বাস্য আর-একটা খবর আমরা বাংলো বাড়ি থেকেই পেয়েছি। মোতিকোঠি থেকে ক-দিন আগে স্বয়ং দেবযানীই নাকি নিরুদ্দেশ! সেখানে ভক্তদের আর যেতে দেওয়া হচ্ছে না। মোতিকোঠির দরজাতেই ভারী ভারী তালা পড়েছে।

বাংলো বাড়ি থেকে গভীর রাত্রে যথাসম্ভব সন্তর্পণে বার হবার সময়ে লক্ষণ-টক্ষণ দেখে ভাগ্যটা আমাদের ভাল বলেই মনে হল। জোয়ালাকে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের লাগেজগুলো যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য বয়ে নিয়ে বাগানের ভেতর থেকে দরজা দিয়ে বেশ নির্বিঘ্নেই বার হতে পারলাম।

বার হবার ব্যাপারে পরাশরই যা একটু ঝামেলা বাধিয়েছিল। নিজেদের মোটঘাট নিয়েই আমরা নাকাল, তার ওপর পরাশর আবার তার ঘুড়ি-লাটাইয়ের বোঝা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তার ভাবখানা এই যে সুটকেসটা ফেলে যেতে হলেও ঘুড়ি-লাটাই ছেড়ে যেতে সে রাজি নয়।

মোটঘাটের সঙ্গে সেই ঘুড়ি-লাটাইয়ের বোঝা সামলাতে গিয়েই নিচু দরজা দিয়ে বার হবার সময়ে হোঁচট খেয়ে দরজার একটা পাল্লায় সে এমন ধাক্কা দিলে যে সেটা সশব্দে বন্ধ হয়ে সারা এলাকাটাই যেন কাঁপিয়ে দিলে।

আমাদের বুকগুলো তখন একেবারে হিম হয়ে গেছে।

দরজার পাল্লায় শব্দ হওয়ার পর বাংলো বাড়ির ভেতরে মূলরাজের থাকবার ঘরের আলোটা তখন জ্বলে উঠেছে।

কাঠ হয়ে কয়েক ঘণ্টার মতো লম্বা ক-টা সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। মূলরাজের ঘরের আলোটা আবার নিভে গেল।

কিছুক্ষণ আরও অপেক্ষা করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দেই আমরা নির্জন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা জোয়ালার গাড়িটায় গিয়ে উঠতে পারলাম।

কোথায় যাওয়া হবে এইবার এই প্রশ্ন।

একটু আলোচনায় ঠিক হল যে রেল স্টেশনে যেতে হলেও ভিকারাবাদে কিছুতেই যাওয়া চলবে না। তার বদলে আরও দূরের ছোট কোনও স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করা হবে বলেই স্থির হল।

ভিকারাবাদের আগে যে স্টেশন সেখানে যেতে হলে শহরের ভেতর দিয়ে খানিকটা যেতে হয় বটে, কিন্তু এখন মাঝরাতে এ দূর মফস্‌সলি শহর শ্মশানের মতোই নির্জন। জোয়ালার গাড়ি নিস্তব্ধ নির্জন রাস্তায় সামনা একটু শব্দের ঢেউ তুলে এগিয়ে চলল।

রাতটা অন্ধকার। শহরের দু-একটা রাস্তায় ছাড়া ভালভাবে আলোর ব্যবস্থা নেই। বহু দূরে দূরে বসানো লাইটপোস্টগুলোর নিষ্প্রভ আলোয় অন্ধকার যেন আরও থমথমে করে তোলে।

শহরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঠিক যেন একটা ভুলে-যাওয়া পরিত্যক্ত প্রাচীন পুরীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি মনে হল।

যাবার পথে মোতিকোঠির রাস্তা দিয়েও গেল গাড়িটা।

সে রাস্তাও সমান নির্জন। ড্রাইভারকে একটু আস্তে চালাতে বলে গাড়ি থেকে টর্চের আলো ফেলে জোয়ালাপ্রসাদ বাড়ির বাইরের দরজাটাও দেখালে। সাবেকি ধরনের পেতলের ডুমো বসানো দরজা দুটো বন্ধ। তার প্রকাণ্ড কড়ায় বড় বড় দুটো তালা ঝুলছে।

এরপর শহর পার হয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগল না। এ প্রান্ত থেকে শহরের অপর প্রান্তে তখন প্রায় এসে পড়েছি। আর একটু এগোলেই এক রাজ্য থেকে আর-এক রাজ্যে যাবার আন্তর্প্রাদেশিক বড় সড়ক।

হঠাৎ সেখানেই হুমড়ি খেয়ে সামনে প্রায় উলটে পড়তে হল।

বিশ্রী কর্কশ শব্দ করে প্রাণপণে ব্রেক কষে রঙ্গুলাল গাড়িটা থামিয়েছে। গাড়ির ওপর এসে পড়া তীব্র চোখ-ধাঁধানো আলোয় তখন আমরা প্রায় অন্ধ।

এরপর ঠিক যেন বিলিতি ছায়াছবির ব্যাপার ঘটল। নেহাত নিজেদের প্রাণ নিয়ে তখন টানাটানি, নইলে আমাদের জোয়ালাপ্রসাদের বাতিল-করা গোয়েন্দা গল্পের একটা দৃশ্য বলতে পারতাম।

চোখটা একটু সয়ে যাবার পর দেখলাম দু-দুটো গাড়ি আমাদের সামনে কিছুদূরে দাঁড় করানো। তাদেরই অতি প্রখর হেডলাইট আমাদের ওপর ফেলা হয়েছে। দেখতে দেখতে দুটি গাড়ি থেকেই কালো টি শার্ট ও প্যান্ট পরা আর কালো মুখোশ ঢাকা দু-জন করে লোক বেরিয়ে আমাদের গাড়ির দু-পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর তাদের একজনের কড়া গলার হুকুম শুনলাম, 'গাড়ি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো।'

আমি তখন সত্যি হতভম্ব। পরাশরের মুখেও কোনও কথা নেই। প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝেই বোধহয় ড্রাইভার রঙ্গুলালও চুপ।

রুখে দাঁড়াল শুধু জোয়ালাপ্রসাদই নিজে।

'কেন! তোমাদের সঙ্গে যাব কেন? কে তোমরা?'

জবাবে মুখোশধারীদের সর্দার শুধু তার পিস্তলটা জোয়ালার মাথার কাছে একটু চেপে ধরল। আমিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললাম, 'চুপ করো জোয়ালা। মিছে আপত্তি করে লাভ নেই।'

'কিন্তু—' বলে জোয়ালা কী বলতে গেল। তাকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে বললাম, 'চুপ করো। গুলি ভরা পিস্তলের সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের তর্ক চলে না।'

জোয়ালাপ্রসাদ আমার দিকেই একবার নিষ্ফল প্রতিবাদের জ্বলন্ত দৃষ্টিটা হেনে চুপ করে গেল।

সামনে ও পেছনে মুখোশধারীদের দু-গাড়ির পাহারায় আমাদের গাড়িকে রওনা হতে হল। গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ফিরে যেতে হল কিন্তু শহরের দিকেই।

যেখানে গিয়ে আমাদের থামাল অন্ধকারেও সেটা অন্য একটা পাড়া বলে বুঝলাম। চওড়া রাস্তা, কিন্তু কাছাকাছি অনেকগুলো উঁচু উঁচু ইমারত রাস্তার এদিকে ওদিকে দেখে জায়গাটা খুব নির্জন বলেও মনে হল না।

গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তা থেকেই খাড়া হয়ে ওঠা প্রকাণ্ড যে তিনতলা বাড়ির মজবুত বিশাল দরজা খুলে আমাদের ভেতরে ঢোকানো হল সেটি কিন্তু প্রায় একটা দুর্গের শামিল।

দরজা দিয়ে ঢোকবার পর একটা লম্বা করিডর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে সামনে একটা চওড়া সিঁড়ির নীচের ক-টা ধাপ দেখতে পেলাম, করিডরের পর সামান্য একটু আলোতেই জায়গাটা বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে।

করিডর পার হয়ে আরও কাছে যেতে সিঁড়িটা পুরোপুরিই স্পষ্ট হল। দুধারে পাথরের কারুকাজ করা রেলিং দেওয়া ছোট-ছোট ধাপের চওড়া সিঁড়িটা কিছুদূর উঠে একটা ল্যান্ডিংয়ে দু-ভাগ হয়ে দু-মহলে যেন চলে গেছে।

এই সিঁড়ি দিয়েই আমাদের ওপরে যেতে হবে। কিন্তু সিঁড়ির নীচেই আমি তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গে জোয়ালাপ্রসাদ আর পরাশরও।

সামনের মুখোশধারী পাহারাদারদের একজন পিস্তল দিয়েই একটা খোঁচা দিয়ে কর্কশ গলায় বললে, 'দাঁড়ালে কেন? ওঠো জলদি।'

তাই উঠলাম। কিন্তু যেজন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম সিঁড়ির ওপরের ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে সেইজন্যেই আবার থামতে হল।

সেখানে দেওয়ানীই স্বয়ং অদ্ভুত একটা রাগের জ্বালা আর কৌতুক মেশানো মুখের ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে পণ্ডিতজি। তাঁর মুখ কিন্তু হিংস্র কঠিন।

নিজে থেকে না চাইলেও এখানে আমায় থামতে হত। কারণ দেওয়ানীই নিজে ডেকে আমায় থামালে, বিশেষ করে আমাকেই।

'আবার তা হলে আমার কাছে আসতে হল! আমি জানতাম তা হবেই!'

'জানতে!' বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতাটা এতটুকু মোলায়েম করবার চেষ্টা না করে বললাম, 'এমন করে জুলুম করে যদি ধরে আনবে তাও জানতে তা হলে?'

'যদি বলি তা-ও জানতামই,' দেওয়ানী আমার দিকে চেয়ে মুচকে হাসল।

আরও কিছু যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল প্রথম পণ্ডিতজির কাছ থেকেই। দেওয়ানীর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি প্রায় বজ্রস্বরে গর্জন করে উঠলেন, 'না, কিছুই জানতাম না আমরা।' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পণ্ডিতজি আমাদের শুধু নয়, মুখোশধারী প্রহরীদের দিকেও তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের আজই রাত্রে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। এইরকম সব মুখোশ ঢাকা গুন্ডারাই আমাদের এনেছে, দরকারি একটা জিনিসও সঙ্গে আনতে দেয়নি।'

'তাতে আপনাদের খুব অসুবিধা হয়েছে কি?' আমাকে হতভম্ব করে পরাশরই জবাব দিলে, 'নিজেদের বাড়ির চেয়ে কিছু কম আরামে এখানে আপনাদের রাখার ব্যবস্থা বোধহয় হয়নি। আর—' একটু থেমে দেওয়ানীর দিকে চেয়ে তাকেই সমর্থন জানিয়ে পরাশর প্রায় যেন ভক্তিভরে আবার বললে, 'আপনি জানতেন না বলে আমাদের দেবীজির কাছেও এ ব্যাপারটা অজানা ছিল ভাবছেন কেন? উনি আগে থেকে সবই নিশ্চয় জানতেন।'

পরাশরের এ আবার কী ভণ্ডামি? নাকি সত্যি তার অকালে ভীমরতি ধরেছে? পরাশরের কথায় দেওয়ানীর মুখের চাপা হাসিটুকু দেখে আরও যেন গা-টা জ্বলে গেল।

প্রায় পণ্ডিতজির মতো গলাতেই বললাম, 'সব বুজরুকি। ডাহা বুজরুকি। আগে থাকতে উনি কিছুই জানতে পারেননি। আর তা যদি পেরে থাকেন তা হলে ক্লাব জোয়ালাপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের যে আজ বলি করিয়েছে সেই কাপুরের সঙ্গে এই ত্রিলজ্জ সাজা দেবীর গোপন সড় আছে—'

'খামোশ!'

যেটুকু বলেছি তার বেশি আর কিছু বলা গেল না। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ যারা করছিল তারা এক মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠল। 'খামোশ', বলে চোখ রাঙিয়ে আমায় থামিয়ে তারা কিছুই তুলেই অন্যদিকের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলে।

অর্থাৎ নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা সেই সিঁড়ি দিয়েই এখন উঠে যেতে হবে। প্রতিবাদ নিষ্ফল, তাই সেই হুকুম অমান্য করলাম না। মনের ভেতর গর্জালেও মুখোশধারীদের পাহারায় নীরবেই নিজেদের জন্য বরাদ্দ সেই মহলে গিয়ে উঠলাম।

পরাশর পণ্ডিতজিকে খানিক আগে যা বলেছিল সে কথাটা অবশ্য আমাদের মহল সম্বন্ধেও সত্য। এ মহলের ঘরদোর সাজ সরঞ্জাম সম্বন্ধে খুঁত ধরবার কিছু নেই। প্রায় বাদশাহী আয়েশে রাখবার ব্যবস্থা। বন্দিত্বের খাঁচাটা সোনার বানিয়ে যেন আমাদের আরও নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বিঁধে মারা।

আমাদের ওপরের মহলে ঢুকিয়ে দিয়ে, মুখোশধারীরা দুটো হুমকি দিয়ে গেল—এ বাড়িতে আমরা যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারি, কিন্তু এ বাড়ি থেকে কখনও যেন পালাবার চেষ্টা না করি, আর এখানকার কোনও জিনিস যেন না নাড়ি।

'না নাড়ি, মানে?' প্রথম নিষেধটার অর্থ বুঝলেও দ্বিতীয়টা একেবারেই না বুঝে আমায় জিজ্ঞাসা করতেই হল, 'এখানে থাকব অথচ জিনিসপত্র নাড়ব না? কোনও কিছু না ছুঁয়ে থাকতে হবে নাকি?'

'না, না, তা হবে কেন?' পরাশর মুখোশধারীদের হয়েই আমায় বোঝাতে ব্যস্ত হল। 'চেয়ার টেবিল দেরাজ আলমারি কি সাধারণ দরকারি জিনিস নয়, দামি কিছু নাড়তেচাড়তে বারণ করছে ওরা।'

'ঠিক। ঠিক!' পরাশরের ওপর খুশি হয়েই সায় দিল মুখোশধারীদের একজন।

pathagar.net

আমি কিন্তু সুবোধ ছেলের মতো কথাটা ওই ভাবেই মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতে পারলাম না। পরাশরের মুখোশধারীদের হয়ে ওকালতিতেই মেজাজটা বেশি গরম হয়ে গেছল।

সেই মেজাজেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'দামি জিনিস তো নাড়ব না, কিন্তু এইসব শোবার বসবার আর সাধারণ জিনিস ছাড়া এ মহলে আর আছে কী? হিরে জহরত লুকোনো আছে নাকি?'

'আহা, থাকতেও তো পারে,' পরাশর আবার শত্রুপক্ষের হয়েই আমায় বোঝালে, 'সে সব কিছু চোখে পড়লেও ছোঁবে না। মোদ্দা কথা হল এই।'

মুখোশধারীদের হয়ে পরাশরের এত ওকালতির কারণ বোঝা গেল এর পরেই।

আমাকে যেমন করে হোক থামিয়ে সে আবার মুখোশধারীদের দিকেই ফিরে গলায় যেন মধু ঢেলে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, পালাবার চেষ্টা যদি না করি, তা হলে একটু খেলাধুলোয় তো মানা নেই?'

মুখ দেখা যায় না, তবু মুখোশের মধ্যে চোখের ফাঁকগুলোতেই যেন একটা সন্দেহের ঝিলিক ফুটে উঠতে দেখলাম।

জোয়ালাপ্রসাদের চোখ দুটো পর্যন্ত কুঁচকে গেছে। পরাশরের এ অদ্ভুত আবদারের মানে না বুঝতে পেরেই বোধহয়। মানেটা আমিও অবশ্য তখন আঁচ করতে পারিনি। তাই এরপর পরাশরের ব্যাখ্যায় আর সকলের মতোই যেমন হতভম্ব হলাম, কৌতুকবোধও করলাম তেমনই।

জোয়ালা তো এত বিপদের মাঝেও হেসে ফেলে বললে, 'আপনি এখন ঘুড়ি ওড়াবার কথা ভাবতে পারলেন, ভর্মাজি?'

'না, মানে—' পরাশরকে একটু লজ্জিত হয়ে বলতে হল এবার—'ঘুড়িগুলো সঙ্গে রয়েছে, এখানে আর কিছু করবারও নেই, তাই ভাবছিলাম তেতলার ছাদে যদি একটু আধটু ওড়াই—'

পরাশরকে অবশ্য খুব বেশি সাধাসাধি আর করতে হল না। মুখোশের আড়ালে মুখোশধারীরাও মুচকে হেসেছিল কিনা জানি না, কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াবার মতো ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াবার অনুমতি তারা দিয়ে গেল।

আমাদের অদ্ভুত বন্দিজীবন শুরু হল এর পর থেকে। একদিক দিয়ে কোনও অভাবই নেই। একেবারে রাজার হালে রাখা যাকে বলে। যেমন ঘরদোর-বিছানা তেমনই চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দু বেলা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা।

কিন্তু দু দিন বাদে এ খাওয়া আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। মখমলের বিছানা তখন কণ্টকশয্যা আর যা মুখে দিই তা-ই বিষ।

কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই পরাশরের। তেতলার ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে পেয়েই সে খুশি। আর কিছু করবার নেই বলে একদিন জোয়ালার সঙ্গে পরাশরের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ছাদেও গেছলাম। গিয়েই বুঝেছিলাম মুখোশধারীরা ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে দিতে কেন আপত্তি করেনি।

ছাদের চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সাধারণ দেওয়াল নয়, অন্তত দু মানুষ সমান উঁচু আর ভেতরের দিক থেকে একেবারে মসৃণ।

এমনিতে তো ওপরের চৌকো আকাশটুকু ছাড়া বাইরের কিছু দেখা যায় না। দেওয়াল বেয়ে উঠে উঁকি দেবারও উপায় নেই।

তবু এই একফালি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়েই পরাশর সন্তুষ্ট। এমনভাবে বন্দি হয়ে থাকা নিয়ে তার যেন কোনও অভিযোগই নেই।

আমাদের কিন্তু ক-দিনেই একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল।

বন্দি করে রাখবার দিন চারেক বাদে নামমাত্র খাওয়াদাওয়ার পর পরাশরকে নির্বিকারভাবে তার ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাদে যাবার উদ্যোগ করতে দেখে রাগটা গিয়ে পড়ল তারই ওপরে।

'তোমার এখনও ঘুড়ি ওড়াতে ইচ্ছে করে?' বেশ ঝাঁঝালো গলাতেই বললাম, 'কোথায় কী ভাবে আছি তা নিয়ে একটু ভাবনাও হয় না?'

পরাশর একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'ভাবনা হয় কি না জিজ্ঞাসা করছ! কিন্তু ভাবনার সত্যি কিছু আছে কি!'

'ভাবনার নেই!' আমার গলাটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রাগে ও বিস্ময়ে। এই অবস্থায় নির্বিকার সেজে আমাদের সঙ্গে রসিকতা করতে চায় পরাশর?

আমি এরপর কী বলতাম জানি না। কিন্তু জোয়ালাপ্রসাদ আমার আগেই হতাশ করুণ মুখ করে বললে, 'বলছেন কী, বর্মাজি! আর ভাববারও কিছু নেই। তার মানে আমাদের এখানে এমনই কয়েদ হয়েই থাকতে হবে?'

'আহা, তা থাকবেন কেন?' পরাশর জোয়ালার করুণ অবস্থা দেখে যেন স্তোক দেবার জন্যই একটি ধাঁধা ছাড়ল বলে মনে হল, বললে, 'বিলেত থেকে খবর এলে তুমি তো আগেই ছাড়া পাবে।'

'আমি আগে ছাড়া পাব? আর বিলেত থেকে খবর এলে?' জোয়ালাপ্রসাদের মুখটা ঠাট্টা সন্দেহ করেই তখন লাল হয়ে উঠেছে। নিজেকে তবু সামলে বললে, 'এ সময়ে হাসি তামাশা করবেন না, বর্মাজি!'

'হাসি-তামাশা করছি না, জোয়ালা।' পরাশর নিজের অন্যায়টা ঢাকবার জন্যই গম্ভীর হয়ে উঠল সম্ভবত, 'শৌখিন সবরকম শিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার এখনও লন্ডন তা জানো তো। সবচেয়ে নামী খানদানি সাচ্চা ব্যাপারি সেখানে যেমন আছে তেমনই আছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর উঁচা চোরাবাজার। চোরাই জিনিসের সবচেয়ে চড়া দাম পেতে গেলে সেখানেই যেতে হয়।'

'তার মানে', পরাশরের কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা এতক্ষণে ধরতে পেরে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রামস্বরূপজির কারবারের সব চুরি করা মাল ওই লন্ডনেই পাচার হয়ে গেছে ভাবছ? রতনচাঁদ সেখানে মাল পৌঁছবার খবরের জন্যেই অপেক্ষা করে আছে? পাকা খবর পেয়ে গেলে আমাদের আর ধরে রাখবে না বলছ?'

'হ্যাঁ, আমরা ছাড়াই পেয়ে যাব বোধহয়, আমাদের ধরে রাখবার আর দরকার নেই বলে।' পরাশর আমার ধারণা একটু সংশোধন করলে, 'তবে পাকা খবরটা মাল পৌঁছবার নয়। মালের পরিচয় দিয়ে দরাদরি করে বেচা-কেনার বায়নার। বিলেতের চোরাবাজারের সঙ্গে এ কারবার তো এই প্রথম হচ্ছে না, বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। চোরা ব্যাপারিদের সঙ্গে তাই জান-পয়ছান হয়ে গেছে। তাদের মুখের কথা পেলেই মাল পাঠাবার ব্যবস্থা হবে।'

'কিন্তু,' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিলেতের চোরাই লেনদেনের খবরের জন্যে আমাদের ধরে রাখা কেন? জোয়ালার সঙ্গে আমরা তো এই অজ মফসসল শহরে পড়ে আছি। কোথায় মাল কোথায় বিলেতের চোরকারবারি কিছুই না জেনে আমরা কি এ লেনদেনে বাগড়া দিতে পারি?'

'পারি না পারি সাবধানের বিনাশ নেই।' পরাশর জোয়ালার কাছেই সমর্থন চাইলে, 'কী বলো, জোয়ালা?'

জোয়ালা কিন্তু তখন বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। পরাশরের দিকে ফিরে বেশ একটু উদ্‌বেগের সঙ্গেই বললে, 'আমি কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, বর্মাজি। আপনি তো এ ব্যাপারের অনেক কথা জানেন দেখছি। যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তা হলে তো ব্যাপারটা বেশ গুরুতর।'

'গুরুতর নয় তো কি আমাদের এভাবে বন্দি করে রাখাটা হালকা ঠাট্টা ভাবছিলে তুমি!' পরাশর জোয়ালাকেই একটু খোঁচা দিয়ে বললে, 'আমাদের শেষ পর্যন্ত ছাড়া পাওয়া নিয়ে তাই আমার মনে একটু সন্দেহ আছে।'

'কী উলটোপালটা বকছ!' পরাশরকে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, 'এই তো খানিক আগে বললে যে বিলেত থেকে পাকা খবর এলেই জোয়ালাকে আগে ছেড়ে দেবে। জোয়ালা ছাড়া পেলে আমরা পাব না?'

'পেলেই ভাল।' বলে পরাশর প্রসঙ্গটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না। বললাম, 'সে বিষয়ে মনে কোনওরকম সন্দেহ যদি থাকে তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু ঘুড়ি ওড়ালে তো চলবে না। এ কয়েদখানা থেকে বার হবার প্রাণপণ চেষ্টা তো করতে হবে।'

'প্রাণ তো অনায়াসেই পণ করা যায়।' পরাশর যেন আমায় একটু বিদ্রুপ করে বললে, 'কিন্তু তাতে পালাবার উপায় বার হয় কি? কী করতে চাও, কী?'

'কী করতে চাই?' পরাশরের দিকে চেয়ে ক-দিন ধরে যে কথাটা ভেবেছি তাই জানালাম। বললাম, 'আমাদের এ কয়েদখানাটার পাহারা যত কড়াই হোক, বাড়িটা যে শহরের মাঝখানে এটা অন্তত সেদিন রাত্রেই জেনেছি। আমাদের বাইরের কারও সঙ্গে যেভাবে হোক যোগাযোগ করা তাই অসম্ভব নয়।'

'সম্ভবটা কী করে তাই জিজ্ঞাসা করছি।' পরাশর এবার একটু আগ্রহই দেখাল আলোচনাটায়—'আমাদের মহলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই আছে, কিন্তু সব ক-টা জানলাই যে জম্পেশ করে আঁটা তা লক্ষ করেছ নিশ্চয়। ভেতর থেকে একটা মাছিরও গলে বার হবার রাস্তা নেই।'

'মাছির চেয়ে মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা অনেক বেশি।' আমি হার মানলাম না, 'কবরের মতো পাতাল কুঠরির কয়েদখানা থেকেও কত বন্দি মাসের পর মাস ধরে গোপনে সুড়ঙ্গ কেটে পালাবার উপায় করেছে। আমরা এই কাঠের পাল্লা আর তারের জালে আঁটা জানলাগুলো কয়টা ফুটো করতে পারব না?'

'শুধু তারের জাল নয়, ওদিকে লোহার পাতও আঁটা আছে,' বললে জোয়ালা।

'তা থাক।' আমি দমলাম না, 'লোহার পাতও ফুটো করা যায়। আর সামান্য ক-টা ফুটো করতে পারলেই কী ভাবে কাজ হাসিল করব তাও ঠিক করা আছে।'

'কী ভাবে?' জোয়ালা উৎসুক হয়ে উঠল এবার।

'এখানে বন্দি করবার সময় আমাদের সঙ্গের জিনিসপত্রে ওরা হাত দেয়নি।' আমি আমার ফন্দিটা বুঝিয়ে দিলাম, জোয়ালার টর্চটা ওর টেবিলেই আছে দেখেছি। সেই টর্চের আলো জানলার ফুটোগুলো দিয়ে রাত্রিবেলা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফেললে কারও-না-কারও তা চোখে পড়তে পারে। বিশেষ করে অন্ধকারে একটা বন্ধ বাড়ির দেখলে কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক। টর্চের জ্বলা-নেভাটা টেলিগ্রাফের মতো মর্স কোড-এও করে দেখা যায়।'

'কিন্তু,' জোয়ালা রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'মর্স কোড তো তার জন্যে জানা চাই।'

'আমি জানি।' গর্বভরেই এবার জানালাম, 'অন্তত টরে টরে টরে—টরে টক্কা—টরে টরে টরে টক্কা—টরে দিয়ে সেভ মানে বাঁচাও কথাটা জানাবার সংকেতগুলো মুখস্থ আছে। ছেলেবেলা মজা করবার জন্যে শিখেছিলাম।'

'তা হলে তো আর ভাবনাই নেই।' পরাশরও সমর্থন জানাল, 'এখন শুধু জানলায় আমাদের পাহারাদারদের অজান্তে ক-টা ফুটো করা নিয়ে কথা।'

কিন্তু সেই ফুটো করাই দেখা গেল আমাদের সাধ্যের বাইরে। জানলার ওধারের লোহার পাত ফুটো করা দূরে থাক, এদিকের তারের জাল কেটে কাঠের পাল্লা ছাঁদা করার মতো কোনও কিছুই জোগাড় করতে পারলাম না। সম্বলের মধ্যে আমারই পকেটের একটা প্রায় ভোঁতা পেনসিল কাটা ছুরি। অফিসের টেবিল থেকে আসবার সময় তাড়াহুড়ায় সঙ্গে চলে এসেছে।

কোনও সুবিধামতো যন্ত্র পেয়ে জানলায় ফুটো করতে পারলেও লাভ যে কিছু হত না তা

জানতে পারলাম সন্ধের দিকে। ভোঁতা ছুরি দিয়ে তার কাটবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে জোয়ালাকে তার টর্চটা একটু আনতে বলেছিলাম। সে এসে যা খবর দিলে তাতে একেবারে বসে পড়লাম। জোয়ালা টর্চ আনবার সময় একটু জ্বালতে গিয়ে দেখে টর্চ একেবারে অচল। তার মধ্যে কোনও ব্যাটারিই নেই। টর্চটা তার টেবিলে সাজিয়ে রেখে কখন যে তার ব্যাটারিগুলো খুলে বার করে নেওয়া হয়েছে তা বুঝতেই পারা যায়নি।

আমাদের পরিচর্যার জন্য অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ চেহারার যে বয়স্কা বাইটি এসে রোজ দু-বেলা ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে যায় এ কাজ তার ছাড়া আর কারও হতে পারে না। ব্যাপারটা সেই জন্যই অত সাংঘাতিক মনে হল।

আমাদের সম্বন্ধে মুখোশধারীদের মনোভাব যে বদলাচ্ছে তার আরও একটা বড় প্রমাণ সেইদিন সন্ধের পরই পাওয়া গেল। টর্চের ব্যাটারি সরিয়ে নেওয়ায় মনের অবস্থাটা অমন বিশ্রী না হলে ব্যাপারটায় মজাই পেতাম হয়তো।

আমাদের জানলা ফুটোয় সাহায্য করবার জন্যে পরাশর সেদিন ওপরের ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে যেতে পারেনি। লাটাই-ঘুড়ির সরঞ্জামগুলো যথাস্থানেই রাখা ছিল। জোয়ালাপ্রসাদের পর চোটটা হঠাৎ তার ওপরেই আসবে কে জানত!

বন্দি করে রাখলেও এ কয়দিনের মধ্যে মুখোশধারী পাহারাদারেরা আমাদের বিরক্ত করেনি বললেই হয়। কালেভদ্রে এক-আধবার দেখা দিয়েছে মাত্র।

সেদিন হঠাৎ অসময়ে সন্ধের পর সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনেই প্রথমটা চমকে গেছলাম। খানিক বাদে মুখোশধারীদের একজনকে ঢুকতে দেখে বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করতে হল। অস্বস্তি শুধু অসময়ে আসার জন্য নয়, লোকটার চলাফেরার ধরনেও। একটা কিছু মতলব নিয়েই সে যে এসেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমটা আমাদের বসবার ঘরটায় এসে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তার মুখ ঘুরিয়ে দেখাটা কেমন যেন অনিশ্চিত।

জোয়ালাপ্রসাদই প্রথম সাহস করে একটু জোর গলায় তাকে বললে, 'ওদিকে অমন করে দেখছ কী? ওসব তো বন্দিদের ঘুড়ি-লাটাই।'

জোয়ালাপ্রসাদের মুখে লাটাইয়ের নামটা উচ্চারণ করাই যেন কাল হল।

আমাদের দিক থেকে এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লোকটা সোজা ঘুড়ি- লাটাইগুলো বগলদাবা করে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গেল।

তার কাণ্ড দেখে আমরা তো থ। জোয়ালাপ্রসাদ হাঁ হাঁ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু লোকটা তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি

'এবার তো অন্যায় জুলুম শুরু হয়ে গেল দেখছি।' লোকটা চলে যাবার পর জোয়ালা বললে, 'আপনার ঘুড়ি ওড়ানোর সুখটুকুও ওদের সহ্য হল না।'

'এ সুখ অবশ্য বেশি দিন আর ভোগ করা হত না।' পরাশর দুর্ভাগ্যটা দার্শনিক বৈরাগ্যেই যেন মেনে নিয়ে বললে, 'ওড়াবার ঘুড়ি আর বেশি ছিল না।'

'সে কী!' আমিই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কম করে এককুড়ি ঘুড়ি তো সঙ্গে এনেছিলে মনে হয়।'

'তা এনেছিলাম।' পরাশরের হাসিটা করুণই মনে হল, 'কিন্তু ঘুড়ি তো আর অজর অমর জিনিস নয়। ওড়াতে গেলেই কাটে, ছেঁড়ে, হারায়।'

'আচ্ছা', জোয়ালা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'হঠাৎ আপনার ঘুড়িগুলোর ওপর খাপ্পা হবার কারণ কিছু বুঝতে পারছেন?'

'কারণ, আমাদের ওপর সন্দেহ ওদের ক্রমশ বাড়ছে,' বললে পরাশর। 'বিলেত থেকে খারাপ খবর এলে আরও খাপ্পা হবে।'

'বিলেত থেকে খারাপ খবরও তা হলে আসতে পারে!' আমি একটু অবিশ্বাসের সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম।

'তা পারে বই কী!' বলে পরাশর আবার একটি ধাঁধা ছাড়ল, 'বিশেষ করে দুশো পঁয়ষট্টি নম্বর যদি বাদ সাধে।'

'দুশো পঁয়শট্টি নম্বর!' একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি আর জোয়ালা।

'ওটা একটা ঘরের নম্বর,' পরাশরের মুখের হাসিটা খুব সরল মনে হল না, 'চোরা কারবারের সব চাল ওই দুশো পঁয়ষট্টিই ভেস্তে দিতে পারে।'

'দুশো পঁয়ষট্টি কি লন্ডন পুলিশের কোনও অফিসঘরের নম্বর?' জোয়ালা প্রায় যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'হ্যাঁ,' জানালে পরাশর, 'নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নতুন বাড়ির ওটি একটি বিখ্যাত ঘর। সারা দুনিয়ায় ইন্টারপোলের একশো সতেরোটি সদস্য দেশ দামি শিল্পসামগ্রী সংক্রান্ত সমস্যার কিনারা করতে ওই নম্বরের ঘরটিরই শরণ নেয়।'

'তুমি এ ব্যাপারে এত সব জানলে কী করে?' জোয়ালার মুখের ভাব দেখে মনে হল তার প্রশ্নটাই যেন আমার মুখ দিয়ে বার হল।

'শখ করে কি আর জেনেছি,' পরাশর আমার প্রশ্নে আবার একটু ঠোঁট টিপে হাসল, 'রামস্বরূপজি আর জোয়ালার কাছে বার বার দামি দামি সব জিনিস চুরির কথা শুনে একটু কষ্ট করে খোঁজখবর নিয়ে সব জানতে হয়েছে।'

'কিন্তু এত জানাশোনা সবই বোধহয় বৃথা হল,' গম্ভীর হয়ে জোয়ালা ভারী গলায় বললে, 'ওই দুশো পঁয়ষট্টি নম্বর বাদ সাধার দরুন বিলেত থেকে খারাপ খবর যদি কিছু আসে তা হলে কী হবে তা বুঝতে পারছেন?'

'তা পারছি বই কী,' পরাশর যেন চিন্তিত মুখেই বললে, 'এ কয়েদখানা থেকে ছাড়া পাবার আশা আর আমাদের থাকবে বলে মনে হয় না।'

কিন্তু সে রাত্রেই সে আশা এমন অবিশ্বাসভাবে দেখা দেবে কল্পনাও করিনি। ওপরের মহলে আমরা তিনজনে পর পর তিনটি আলাদা ঘরে শুই। নীচের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার পর প্রথম ঘরটা আমার, তার পরেরটায় থাকে জোয়ালা আর একেবারে শেষটায় পরাশর।

এক ঘর থেকে আর এক ঘরে করিডর দিয়েই যাতায়াত করার ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের তার দরকার হয় না। নিজেরাই বন্দি, আমাদের আর সাবধান হবার কী আছে! ঘরের সব দরজা তাই খোলাই থাকে সারাক্ষণ।

বেশ অনেক রাত পর্যন্ত দুর্ভাবনায় জেগে থাকবার পর সবে তখন বোধহয় ঘুমটা এসেছে। হঠাৎ কী রকম একটা অদ্ভুত আবেশের আচ্ছন্নতা সমস্ত শরীর মনে যেন অনুভব করলাম। সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে নরম পালকের মতো কীসের যেন একটা মধুর হালকা স্পর্শ কে বুলিয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন দেখছি কি? কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে কি গন্ধের কোনও অনুভূতি থাকে?

আমি কিন্তু তখন একটা অজানা অপরূপ সুরভির মাদকতা বেশ ভাল ভাবেই টের পেতে শুরু করেছি। ঘুমটা আর-একটু পাতলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে একটা কী রকম মৃদু অস্পষ্ট শব্দও পেয়ে প্রথমটা জোয়ালাই কোনও কিছু দরকারে এ ঘরে এসেছে ভাবলাম।

জোয়ালা সব সময়েই সুগন্ধ কিছু ব্যবহার করে শোবার বিছানাতেও। কিন্তু এ তো তার ব্যবহার করা সেন্টের গন্ধ নয়। তা হলে?

ধড়মড় করে এবার বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পারলাম না। সুগন্ধটা আরও ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্গে মুখের ওপর একটা হাত চাপা পড়ল, অতি কোমল মসৃণ একটা হাত। সেই সঙ্গে প্রায় নিঃশব্দে উচ্চারিত ক-টি কথা—'কথা বোলো না। চুপি চুপি এসো।'

কিছুই বুঝতে পারিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু যা বুঝলাম তা-ই অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কী করব এখন? আলো জ্বেলে ফেলে জোয়ালা আর পরাশরকে ডেকে তুলব?

এই দ্বিধা সংশয়ের মধ্যেই কানের কাছে স্বপ্নমদির একটা স্পর্শ অনুভব করলাম আর সেই সঙ্গে সেই অস্ফুট অথচ তীব্র মিনতি—'দেরি কোরো না। এসো।'

একটা স্পষ্ট সুগন্ধ। অস্ফুট গলার আর অস্ফুট পদশব্দের পিছু পিছু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমেই গেলাম এবার। রহস্যটা কী তা দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত।

দোতলায় ল্যান্ডিংয়ে গিয়ে একটু দাঁড়াতে হল। অস্পষ্ট ছায়া সেখানকার গাঢ় অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য, কিন্তু শারীরিক উপস্থিতিটা আমার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগে থাকা উষ্ণ কোমল স্পর্শে অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট।

ফিসফিস করে হলেও কানের কাছে মুখ তুলে বলা কথাটাও তাই—'কী জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি, জানো?'

গলাটা না তুললেও বেশ একটু কঠিন রেখেই বললাম, 'না।'

'চলো, নীচে গিয়ে বলব। সাবধানে এসো।'

তা-ও গেলাম। কৌতূহল তখন বিচার-বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। কী জন্য আমায় মাঝরাত্রে এমন করে ডেকে এনেছে এই রহস্যময়ী? নীচে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কী বলতে চায় সেখানে? কী বলতে চায় তা জানবার আগে নীচে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে একেবারে অবাক।

নিজের মহল ছাড়া দোতলা বা নীচের তলার কিছু দেখবার সুযোগ এ পর্যন্ত হয়নি। সন্তর্পণে নীচে নেমে যাওয়ার পর আমার ছায়াময়ী সঙ্গিনী যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে একটি দরজার তালা খুলে আমাদের ওপর মহলেরই ছকে ফেলা একটি করিডর দিয়ে একটি বিরাট ঘরের মধ্যে এনে দাঁড় করাবার পর চোখ দুটো হঠাৎ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল।

এতক্ষণের অন্ধকারের পর শুধু আকস্মিক আলোর উজ্জ্বলতায় নয়, চোখে একটু সয়ে যাওয়ার পর ঘরে যা দেখলাম তাতেও।

সাধারণ ঘর নয়, যেন নাম করা কোনও জাদুঘরের বিরল সংগ্রহশালা। গালচে-পরদা-কার্পেট, দামি কাঠের ও ব্রোঞ্জ পাথরের মূর্তি, পুরনো ছবি ইত্যাদি মিলে যে কটা বাছাই করা জিনিস এখানে আছে আমার আনাড়ি চোখেও তাদের মহামূল্য ধরা পড়তে দেরি হল না।

এই তা হলে বটেন্দ্রাদের চোরাই কারবারের ঘাঁটি? কলকাতা থেকে এই সুদূর অজ মফস্‌সল শহরে এসব জিনিস লুকিয়ে রেখে সে সুবিধামতো বিদেশে পাচারের ব্যবস্থা করে?

উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠে মুখে একটু হাসি নিয়ে আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে জাতিস্মরা বলে দাবি করা সেই দেওয়ানীই কি তাহলে তার সহায় সঙ্গিনী? তা হলে আমায় এমন করে ডেকে এনে এসব দেখানো কেন? সেই কথাই জানতে চাইলাম এবার।

'কেন এখানে এনেছি তা এখনও বুঝতে পারছ না?' দেওয়ানী আমার দিকে চেয়ে যেন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'এনেছি আমরা কেন এখানে বন্দি চাক্ষুষ তা দেখাবার জন্যে। এসব জিনিস এখানে থাকতে তো নয়ই, এখান থেকে পাচার হবার পরও আমরা কোনওদিন ছাড়া পাব কি না সন্দেহ। তাই বলতে চাই—'

ওই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের সুইচটা টিপে দেওয়ানী ঘরটা অন্ধকার করে দিলে। তারপর একেবারে কাছে ঘেঁসে এসে চাপা স্বরে বললে, 'সাহস থাকে তো চলো পালাই।'

'পালাব।' দেওয়ানীর কথায় রীতিমতো চমকে উঠলেও গলার স্বরটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে বললাম, 'পালাতে চাইলেই পালানো যায় নাকি। মুখোশধারীরা কি মিছিমিছি পাহারা দিচ্ছে?'

'যতই পাহারা দিক,' দেওয়ানী চাপা গলাতেও বেশ জোরের সঙ্গে জানালে, 'আমাদের

ধরতে পারবে না। পালাবার এমন পথ আমি জানি যা ওদের কল্পনার বাইরে। বলো, সাহস আছে আমায় নিয়ে পালাবার?'

'তোমায় নিয়ে?' মুখে ওইটুকু বলে মনের মধ্যে অনেক কিছু তাড়াতাড়ি ভেবে নিলাম। সাময়িক মোহে বা যে কারণেই হোক যে সুযোগ দেওয়ানী আমায় দিচ্ছে তা কি ছাড়া উচিত? সত্যিই এ রকম কোনও পালাবার উপায় যদি তার জানা থাকে তা হলে সেটা আমাদের সকলের জন্যই তো কাজে লাগাতে পারি। শুধু একা আমি নয়, পরাশর আর জোয়ালাও তো আমার সঙ্গে পালাতে পারে।

আমার একটু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকায় দেওয়ানী একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী, চুপ করে আছ কেন? আমায় নিয়ে পালাতে তোমার আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি থাকবে কেন?' এবার তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করলাম, 'কিন্তু সত্যি এমন পালাবার পথ কি আছে? দেখাতে পারো?'

দেওয়ানী মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যিই এমন গুপ্ত পথ সে দেখালে যার হদিস না জানা থাকলে সাধারণভাবে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাদের এখনকার বাসায় গিয়ে উঠবার আগে ছেলেবেলায় এই বাড়িতেই থাকত বলেই এ গোপন পথের খবর নাকি সে জানতে পেরেছিল।

গুপ্ত পথটা খুব একটা অদ্ভুত কিছু প্যাঁচের না হলেও মুখোশধারী পাহারাদারদের চোখে ধুলো দেবার পক্ষে যথেষ্ট। চোরাই মাল জমা-করা ঘরটার বাহারি কাজ-করা একটা ট্যাপেস্ট্রির পেছনে একটা দেয়াল আলমারি। সে দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে পেছনের তাকগুলো একটু এদিক ওদিক ঠেললেই সেগুলো ডাইনে বাঁয়ের খাঁজে ঢুকে গিয়ে একটা বেশ চওড়া সুড়ঙ্গ পথেই বার হয়ে আসে। সে সুড়ঙ্গ পথ বাড়ির তলা দিয়ে গিয়ে অন্যদিকের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি গলিতে নাকি বেরিয়েছে।

গুপ্ত পথের হদিস জানবার পর এক মুহূর্তও আর নষ্ট করলাম না, তা বলাই বাহুল্য। ঘুমন্ত জোয়ালা আর পরাশরকে জোর করে জাগিয়ে তাদের একরকম জবরদস্তিতে নীচে ঠেলে নিয়ে এসে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ ঢাকা দেওয়াল আলমারির সেই পাল্লা দুটো ম্যাজিক দেখাবার মতো করে গর্বভরে খুলে ধরলাম।

কিন্তু ম্যাজিক যা হল তা একটু ভিন্ন রকমের। পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তারপর এক এক করে চারজন মুখোশধারী পাহারাদার সেখান থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল।

'এটা! এটা কী ব্যাপার?' জোয়ালাপ্রসাদ অসহায়ভাবে একবার আমার আর একবার পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ তো ওই মেয়েটার আমাদেরকে জব্দ করবার ফাঁদ মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, ফাঁদ তো নিশ্চয়ই!' পরাশর একটু হেসে বললে, 'তবে একটু কাঁচা হাতের।'

'কাঁচা হাতের!' জোয়ালার মতো সবিস্ময়ে আমিও পরাশরের দিকে তাকালাম। কিন্তু আলোচনাটা আর চালানো গেল না।

মুখোশধারীদের সর্দার ধমক দিয়ে আমাদের থামিয়ে জোয়ালাকেই সবার প্রথম বাইরে নিয়ে চলে গেল। আমাদের পালাবার ষড়যন্ত্রের জন্যই যে সকলকে একসঙ্গে থাকতে না দেওয়ার এই শাস্তি সে কথাও জানিয়ে গেল।

'আমায়, আমাকেই একলা নিয়ে যাচ্ছে যে?' বলে জোয়ালা তাকে ধরে নিয়ে যাবার সময় আমাদের কাছেই করুণ আবেদন জানাল।

তাতে পরাশর অমন একটা জবাব দেবে ভাবতে পারিনি। কেমন একটু হেসে সে বলল, 'নিয়ে যাচ্ছে, যাক। কিন্তু আমাদের হিসেবে যদি ভুল না হয়ে থাকে তা হলে বেশি দূর তোমায় যেতে হবে না।'

pathagar.net

'তার মানে।' জোয়ালার চোখ দেখেই বোঝা গেছল যে যত ভক্তিই থাক এ সময়ে পরাশরের হেঁয়ালি তার ভাল লাগেনি।

পরাশর কিন্তু নির্বিকারভাবেই বলল, 'মানে এই যে এখান থেকে দু পা বেরিয়েই আবার তোমাদের ফিরতে হবে।'

যা বলেছিল তা-ই অমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে কে জানত! পাঁচ মিনিট না যেতে যেতে সত্যিই জোয়ালাপ্রসাদ আবার ফিরে এল। কিন্তু সঙ্গে শুধু তো মুখোশধারীরা নয়, ক-জন অস্ত্র পুলিশ আর তাদের অফিসারও যে এসেছেন। কেন?

আমরা তখনও অন্য মুখোশধারীদের পাহারায় নীচের মহলেই আছি। প্রায় নিশেহারা চেহারায় ভেতরে ঢুকে পরাশরের কাছে সেই কথাই জানতে চাইলে জোয়ালাপ্রসাদ।

'আচ্ছা, এঁরা এইসব মুখোশধারী দুশমনদের সঙ্গে আমাকেও ধরেছেন কেন, ভর্মাজি? আপনি তো আমায় চেনেন। আমার হয়ে একটু বলবেন এদের—'

'নিশ্চয়। নিশ্চয় বলব,' পরাশর উদারভাবে আশ্বাস দিলে। তারপর পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করে কাছে বসিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনারা যাঁকে ধরেছেন তাঁর সঠিক পরিচয় জানেন কি?—ভুল কিছু করেননি তো?'

'ভুল কি ঠিক জানি না।' স্বীকার করলেন অফিসার, 'তবে ওপর মহলের হুকুমে ক-দিন ধরে এ মোকানের ওপর নজর রেখে আজ এঁকে ধরতে হয়েছে।'

'ধরেই যখন ফেলেছেন তখন ওঁর পুরো পরিচয়টা শুনে নিন—' পরাশর এবার যা বলতে শুরু করলে তাতে সবার আগে চোখ কপালে উঠল আমারই—'ওঁর নাম জোয়ালাপ্রসাদ পণ্ডিত। কলকাতা এবং সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিভিন্ন সব শিল্পসামগ্রীর কারবারি রামস্বরূপ পণ্ডিতের উনি আপন ভাইপো ও একমাত্র উত্তরাধিকারী। রামস্বরূপজির শ্যালকের এক ছেলে আছে, রতনচাঁদ তার নাম। সেই রতনচাঁদই জোয়ালাপ্রসাদের জীবনের শনি। ইতিমধ্যে কাজকর্মের বাহাদুরি দেখিয়ে রামস্বরূপজিকে সে বশ করেছে, শেষ পর্যন্ত কারবারের মালিকানাতেও সে ভাগ বসাতে পারে, জোয়ালাপ্রসাদের এই বোধহয় ভয়। জোয়ালাপ্রসাদ মুখ বুজে কিছু সইবার পাত্র নয়, চাচাজি আর রতনচাঁদের ওপর শোধ নেবার জন্যেই বোধহয় জোয়ালাপ্রসাদ বহুদিন ধরে কারবারের মালপত্র বিদেশে পাচার করতে শুরু করেছে, আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে আমার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে—'

'কী বলছ কী তুমি, পরাশর!' এবার আর বাধা দিয়ে প্রতিবাদ না করে পারলাম না, 'জোয়ালার ডিটেকটিভ গল্প লেখার নেশা, সে তাই ছাপাবার লোভে আমার অফিসে এসে আমার সঙ্গে ভাব করেছে। সেখান থেকে আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে। ও তোমায় ভক্তি করে।'

'হ্যাঁ, ভয়ে ভক্তি!' হাসল পরাশর। 'রামস্বরূপজি তাঁর দোকানের দামি সব জিনিস লোপাট হতে থাকার পর আমার পরামর্শ চান। আমায় সেখানে দেখবার পর থেকেই ডিটেকটিভ গল্প লেখার নামে আমাদের সঙ্গে ভাব জমাবার বুদ্ধি জোয়ালার হয়েছে। ভাষায় না লিখতে পারুক, বাস্তবে জবর এক গোয়েন্দা কাহিনীকে রূপ দেবার চেষ্টাই করেছে জোয়ালা। কলকাতা থেকে ধাপধাড়া দূরের শহরে তার চোরাকারবারের ঘাঁটি করেছে, দেওয়ানী আর তার বাবাকে টাকা খাইয়ে হাত করে দর্পণা দেবীর পুজো আর জাতিস্মর সর্বজ্ঞ হবার বুজরুকি দিয়ে আসল ব্যাপার ঢাকা দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। এখানকার এক উর্দু কাগজে মিথ্যে একটা খবর ছাপিয়ে তারই কাটিং আমার কাছে পাঠিয়ে আমি এ ব্যাপারে সত্যি কতটা ওয়াকিবহাল তা পরীক্ষা করতে চেয়েছে, তারপর আমি সত্যিই এখানে এসে হাজির হওয়ার পর ব্যাপারটা গোলমেলে বুঝে আমাদের কিছুকালের মতো মুখ বন্ধ করবার জন্যে নিজে নজরবন্দি সেজে আমাদেরই

ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। আমি অবশ্য ইচ্ছে করেই তার এসব ফন্দি না বোঝবার ভান করেছি। সস্তা গোয়েন্দা গল্পের মতো মুখোশধারীদের দিয়ে শহরের রাস্তা থেকে আমাদের ধরে আনবার সময় হাসি চেপে এ নাটকে অভিনয় করেছি ঠিক মতোই। তবে কাজের কাজ কিছু ভুলিনি। ইন্টারপোলের বড় ঘাঁটি লণ্ডনের দুশো পঁয়ষট্টি নম্বরে আগেই সব চোরাই মালের বিবরণ পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। এখানে এসেও কাল পর্যন্ত ঠিক জায়গায় নিয়মিত খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। ক-দিন থেকেই অবশ্য বুঝতে পারছিলাম যে জোয়ালা চারিদিকের ব্যাপারস্যাপার দেখে বেশ ভড়কে গিয়ে দেওয়ানীকে নিয়ে তার মালপত্র আর আমাদের ফেলেই পালাবার মতলব করছে। আজ ভোররাত্রেই এই চালাকির পর তারই মাইনে-করা মুখোশধারীদের হাতে বন্দি হয়ে যাবার ছলে সে যে সরে পড়ছে তা বুঝে তার ফিরে আসতে বাধা হওয়ার ওই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম। আমার খবরগুলো ক-দিন ধরে যথাস্থানেই পৌঁছেছে এ বিশ্বাস আমার ছিল।'

আমি যখন এই ব্যাখ্যা শুনে হতভম্ব, জোয়ালাপ্রসাদ কি তখন পরাশরের ওপর খাপ্পা? মোটেই না। সব শুনে সত্যিকার ভক্তি-গদগদ গলায় সে বললে, 'হ্যাঁ, আমি সত্যিই হাঁদারাম। আপনার ঘুড়ি ওড়ানোর মর্ম আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আচ্ছা, আর আমার বড় ভুল কী বলুন তো?'

'ভুল একটা "আই",' বললে পরাশর, 'রামস্বরূপজির হয়ে পাঠানো টেলিগ্রাফেও তুমি রিটার্ন বানান করেছ 'আই' দিয়ে। ও ভুলটা তোমার মার্কা-মারা নিজস্ব। আর কিছু না থাকলে ওই "আই"ই তোমায় ধরিয়ে দিত।'

pathagar.net

ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা

কী কুক্ষণে যে রাজি হয়েছিলাম। নাকের জলে চোখের জলে হতে হতে পরাশরকে যেমন মনে মনে শাপ দিয়েছি নিজেকেও ধিক্কার দিয়েছি তেমনই।

এতদিন ধরে পোড় খেয়েও এখনও আমার আক্কেল হল না। পরাশরের কথায় ভুলে তার মন্ত্রণায় সায় দিয়েছি?

মন্ত্রণাটা কীসের? ভাবতে পারেন অনেকেই।

না, নিলেম ঘরে যাওয়া নয়, চেঞ্জে কোথাও তার খেপে ওঠা ক্যামেরার শিকার হবার কি ভাঙা রেডিয়ো শুনতে বোম্বাই যাবারও নয়।

এই দু-পা মাত্র গিয়ে একেবারে হাতে স্বর্গ পাবার মন্ত্রণা। কী লোভই না দেখিয়েছিল পরাশর!

হাঁফ ধরে গেছে এই দেওয়াল-ঘেরা ছাদে-ঢাকা জীবনের জেলখানায়? অরুচি ধরেছে এই লাইন-পাতা ছক-বাঁধা রাস্তায় হেঁটে ছুটে ঝুলে? চলে এসো উদোম মাঠে আকাশের তলায় ঘণ্টা

কয়েকের একেবারে অবাধ ছুটিতে। আরব বেদুইনের উধাও দিগন্তের হাতছানির সঙ্গে আলাদিনের পিদিম-ঘসা জীবনের অফুরন্ত মেহেরবানির পাক্ক। যেমন রূপের হাট তেমনই স্ফূর্তির গড়ের মাঠ।

হ্যাঁ। গড়ের মাঠই সত্যি, ঘোড়া ছোটার রেসকোর্স। পরাশর পক্ষমুখে সেখানকার পাঁচালি গেয়ে একরকম সম্মোহিত করেই নিয়ে গেছল সেখানে।

যাবার আগে তবু একবার মনের দ্বিধাটা জানিয়েছি। একবার ওখানে গেলে আর নাকি ছাড়ান-ছিড়েন নেই। এমন নেশায় পেয়ে যায় যে ওই ঘোড়ার পেছনেই ছুটতে হয় তারপর?

'পাগল হয়েছ?' পরাশর আশ্চর্য করে দিল। 'আমরা কি ছোটাছুটি করতে যাচ্ছি? আমরা শুধু যাচ্ছি দর্শক হয়ে একটি জায়গায় বসে বসে ঘোড়ার ছুট আর টাকার হরির লুঠ দেখব, সেই সঙ্গে সুন্দর চেহারাও—যা ফ্রাউ মেলে।'

'তুমি আবার ওই যাকে বলে বাজিটাজি ধরে জুয়াটুয়া খেলবে না তো?' আরও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছি।

'বাজি ধরব আমি!' পরাশর যেন অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে ব্যাগ খুলে দেখিয়েছে। 'মিস্টার চৌহানের গাড়িতে যাচ্ছি বলে ট্যাক্সিভাড়াটা পর্যন্ত নিইনি।'

এর পর আর আপত্তি করা যায়? সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে মিস্টার চৌহানের পাঠানো গাড়িতে গিয়ে উঠেছি। গাড়িতে উঠেই মিস্টার চৌহান কী দরের মানুষ তা বুঝতে দেরি হয়নি। বিদেশি কোনও কনসুলেট-এর নামে-মাত্র হাতফেরতা ভিনাবিন গাড়িতে চড়বার সৌভাগ্য আগেও হয়নি এমন নয়, কিন্তু এ গাড়ি সেসবের ওপর-আধিক্যে কাঠি। এমনিতে ছোটখাটো একটি স্টিমার বললেই হয়। পেছনের সিটেও আমার সঙ্গে ওসারে প্রসারে বেশ ভারিক্কি মানুষ অনায়াসে হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারে, তার ওপর আবার শীততাপনিয়ন্ত্রিত।

সত্যি কথা বলতে গেলে রেসের মাঠে যাবার প্রথম অভিজ্ঞতাটা খুব খারাপ লাগেনি। মিস্টার চৌহানের বোর্ড লাগানো গাড়ি ভেতরের গেট দিয়ে একেবারে ভেতরে গিয়েই থেমেছে। ইউনিফর্ম পরা [illegible] এসে দরজা খুলে ধরার পর বাইরে পা দিয়ে যেন অন্য রাজ্যেই এসে পৌঁছেছি [illegible] হয়েছে।

গায়ে গায়ে লেপ্টে [illegible] করা ঘেঁসাঘেঁসির জগৎ থেকে এ যেন সত্যিকারের মুক্তি। পরাশর যখন কড়কড়ে [illegible]-খানা নোট গুনে দিয়ে ষাট টাকায় দুটো মেম্বারের ব্যাজ নিয়ে বোতামে লাগিয়ে দিয়েছে তখন একটু অস্বস্তি লাগলেও সেটা বেশিক্ষণ থাকেনি।

গেট পেরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে শুধু পরাশরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছি, 'এখানে ঢোকবার মাশুল এক-একজনের ত্রিশ টাকা?'

'খুব বেশি মনে হচ্ছে?' পরাশর হেসে বলেছে, 'তাও এখানকার মেম্বারের বন্ধু বলে ওই টাকায় ঢুকতে পাচ্ছ, নইলে ত্রিশ দশকে তিনশো হলেও মেম্বারদের খাস এ-এনক্লোজারে উটকো কোনও লোকের ঢোকবার উপায় নেই।'

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় একটু সন্দিগ্ধভাবে এবার জিজ্ঞাসা করেছি, 'তুমি যে তখন ব্যাগ খুলে কিছু নেই দেখালে, এ টাকা তা হলে পেলে কোথায়!'

'পেলাম পকেটে।' পরাশরের মুখের হাসি দেখে ভবিষ্যৎ তখনই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। 'তোমায় ব্যাগটাই খুলে দেখিয়েছি, পকেট তো নয়।'

ব্যাপারটা তখন হাসিঠাট্টার মেজাজেই নিয়েছি। রেসের মাঠের কাণ্ডকারখানা দেখেই তখন আমি তাজ্জব।

পরাশর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দিয়েছে। কোথায় ঘোড়ার নম্বর আর জকির নাম উঠছে, ঘোড়া কোন খোপে দাঁড়াবে তার নম্বর সুদ্ধ কোথায় প্রকাণ্ড কালো বোর্ড রয়েছে কোন ঘোড়ার কত বিক্রি তা জানবার জন্যে, কোথায় টিকিট কেনবার জানলা আর কোথায় জিতলে টাকা

নেবার, ঘোড়া কোথায় প্যাডক-এ ঘুরিয়ে দেখানো হয়, আর মেম্বারদের মহল থেকে বেরিয়ে কোথায় বুকিরা আলাদা যেন ফাঁদ পেতে বসে তাদের নিজের নিজের বোর্ডে ঘোড়া পিছু তার দর লিখে জানিয়ে মক্কেল তাতাচ্ছে—এত সব দেখতে দেখতে মাথাটা একটু ঘুরেই গেছে সত্যি, পরাশরকে সে কথা জানিয়ে বলেছি, 'একসঙ্গে যতটা সয় তার বেশি চাপিয়ো না। আপাতত আসল ঘোড়দৌড় যেখান থেকে দেখা যায় সেইখানে একটু নিয়ে গিয়ে বসাবার ব্যবস্থা করো।'

'আরে, সে তো আমাদের জন্যে মি. চৌহানের বক্সই আছে।' আশ্বাস দিয়েছে পরাশর, 'কিন্তু এখন থেকে সেখানে গিয়ে বসে থাকবে কেন? মি. চৌহান এলে তাঁর সঙ্গেই যাব।'

'চৌহান এখনও আসেননি!' আমি একটু অবাক হয়েছি।

'না, ওঁর একটা জরুরি কাজ সেরে আসছেন,' বলেছে পরাশর, 'রেস আরম্ভ হতে এখনও অনেক দেরি, টিকিটের উইনডো খোলেনি। রেস্তোরাঁয় গিয়ে একটু বসা যাক চলো। ঘোড়ার ফর্ম টর্ম একটু কষা যাবে।'

রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা টেবিলে গিয়ে বসবার পর পরাশরের শেষ কথাটার মানে বুঝেছি। পরাশর তখন দুটো কোল্ড ড্রিঙ্ক অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে রেসের একটা বই বার করেছে। এ বই কখন সে কিনেছে জানতেও পারিনি।

পরাশর যতক্ষণ রেসের বই নিয়ে তন্ময় থেকেছে ততক্ষণ আমি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি।

আমরা একটু আগেই এসে পড়েছিলাম। তখনও এ-এনক্লোজার অনেক ফাঁকা ছিল। আসল মক্কেলরা এইবার আসতে শুরু করেছে। টিকিট বিক্রির জানালার সামনে যেখানে বসে আছি সেই রেস্তোরাঁয় দলে দলে এ রাজ্যের কারবারিরা ঘুরছেন ফিরছেন, জটলা পাকাচ্ছেন বা বসে আড্ডা দিচ্ছেন।

চাঁদের হাট সত্যিই। কী সব চেহারা আর তার চেয়ে বেশি—কী পোশাক। ফ্যাশন প্যারেড যদি দেখতে হয় তা হলে মাঠে মেম্বারদের এই খাসমহলে। শহরের হুরি পরিরা কেউ যেন বাদ নেই। আর পোশাক প্রসাধনের ঘটায় সুরলোকও লজ্জা পাবে। লজ্জা অবশ্য সব দিক দিয়েই। পোশাকটা যে আবরণের চেয়ে উন্মোচনের ইশারার জন্যে, সুরসুন্দরীরাও তা বোধহয় জানেন না। পুরুষ যাঁরা সঙ্গে আছেন তাঁদেরও সাজের ত্রুটি নেই, কিন্তু সে তো শুধু সানাইয়ের বাঁশির বিচিত্র বিস্তারের পেছনে পোঁ ধরার মতো।

রেস্তোরাঁর বয় এসে দু জনের সামনে পানীয়ের গ্লাস ধরে দেবার পর পরাশর ও আমার দু-জনেরই যেন ঘোর কেটেছে। পরাশরকে বই থেকে মুখ তুলে গেলাসটা দেখে পকেট থেকে একটা রসিদ বইয়ের মতো বই বের করতে দেখে আমি তখন অবাক। সে বই থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ে বয়কে দেওয়াতে আরও।

'ওটা আবার কী ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করেছি।

'দাম দিলাম আমাদের কোল্ড ড্রিঙ্কের,' পরাশর বুঝিয়েছে, 'আজকাল আর নগদ দাম দেওয়া নেই। সই করেও কিছু নেওয়া যায় না। আগে থাকতে এই ধরনের কুপন বই কিনে রাখতে হয়।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ কুপন বই তুমি পেলে কোথায়? এখানে এসে তো কেনোনি?' প্রশ্নটা ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু তখনও যদি পরাশরের আগে থাকতে সাজানো প্ল্যানটা আঁচ করতে পারতাম!

'না, কিনতে যাব কেন?' পরাশরই যেন অবাক হয়ে বলেছে, 'মিস্টার চৌহান তো কালই সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন।' আমায় বুঝিয়ে পরাশর তার হাতের রেসের বইটা এবার আমার সামনে খুলে ধরেছে। 'দেখতে পাচ্ছ?'

'দেখব আর কী, ও তো রেসে যারা দৌড়োবে, সেই ঘোড়া আর জকিদের নাম।'

'শুধু তাই দেখছ? আমার পেনসিলের দাগ দুটো দেখতে পাচ্ছ না?'

'পেনসিলের দাগ মানে?' এবার হেসে ফেলে বলেছি, 'ওই ঘোড়াগুলো' জিতবে বলে তোমার ধারণা?'

'ধারণা নয়, হিসেব।' গম্ভীর হয়ে বলেছে পরাশর, 'অব্যর্থ অঙ্কের হিসেব।'

'অঙ্কটা কী?' আমার গলায় বিদ্রূপটা অস্পষ্ট রাখিনি।

'শুনবে তা হলে?' পরাশর অঙ্ক বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছে, 'আজ কত তারিখ?'

'বারো।' একটু অবাক হয়ে বলেছি, 'তারিখ দিয়ে কী হবে?'

'দেখো না। কিন্তু শুধু বারো বললেই হবে না। বলো, *বারোই ডিসেম্বর, উনিশশো সত্তর।*'

'বললাম। কিন্তু তাতে হল কী?'

'হল এই যে পয়লা বাজিতে কোন ঘোড়া জিতবে তা জেনে ফেললাম।'

'ওই তারিখ থেকে?' আমার হাসিটা আর চাপতে পারিনি।

'শুধু তারিখ থেকে নয়,' পরাশর নির্বিকার, 'হিসেবটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে বারোই ডিসেম্বর উনিশশো সত্তর যোগ করো।'

'তারিখ আবার যোগ করব কী করে?' এবার আমি হতভম্ব।

'আহা, তারিখ নয়। তারিখের নম্বরগুলো।' পরাশর বুঝিয়েছে, 'বারোই হল তারিখ, ডিসেম্বর হল বারো, বারো বারোতে চব্বিশ আর উনিশশো সত্তরের নম্বরগুলো যোগ করলে হয় সতেরো। সতেরো আর চব্বিশ—'

এবার অধৈর্যের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছি, 'কী আবোল তাবোল বকছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রেসের মাঠে এসে?'

'খারাপ হবে কেন? এই নম্বরগুলো যোগ করছি বলে? বেশ, প্রমাণ যখন করে দেব তখন তো বুঝবে?'

'কী প্রমাণ? ওই যোগ করে তুমি জিতবে ঘোড়া ধরে ফেলবে?'

'ফেলব কেন, ফেলেছি।' পরাশর গর্বভরে বলেছে, 'আমাদের সতেরো আর চব্বিশে হল একচল্লিশ, তার সঙ্গে পয়লা নম্বর রেসের এক যোগ করো। তা হলে দাঁড়াল বিয়াল্লিশ। বিয়াল্লিশের চার আর দুই যোগ করলে হয় ছয়। পয়লা রেসে ছয় নম্বর ঘোড়া মেডোসুইট নির্ঘাত জিতছে। এই নাও টাকা।'

পকেট থেকে সত্যিই একটা দশটাকার নোট বার করে দিয়ে পরাশর বলেছে, 'টিকিটের জায়গা দেখিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে প্রথমেই গিয়ে একটা ছ-নম্বরের জিতের টিকিট কাটবে।'

টাকাটা হাতে নিয়ে সত্যিই আমি তখন হাঁ হয়ে গেছি। সেই হাঁ হয়েই থাকতে হয়েছে তার পরও।

'আরে!' আমার হাতে নোট আর রেসের বইটা গুঁজে দিয়ে পরাশর হঠাৎ যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মহিলাটিকে দেখতে পেয়েছি এবার। দেখবার মতোই চেহারা, সাজটা তার চেয়েও।

তন্বী দেহ। টকটকে ফরসা নয় বলেই যেন গায়ের রংয়ের উজ্জ্বলতা আরও মনোহর। সে মাধুরী উপভোগ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ তাঁর সাজের কেরামতিতে দেওয়া হয়েছে। ক্ষীণ কটি নিয়ে দেহের মধ্যভাগ পুরোপুরিই নিরাবরণ। পরিধেয়টি যে ভাবে পরা তাতে ভয় হয় নিতম্ব থেকে খসে পড়তে বুঝি আর দেরি নেই। চোখ মুখ নাক দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গেই ছন্দে মেলানো। আর তারই ওপর মাথায় একটি ঘড়ার মতো খোঁপার বাহার।

শুধু পরাশর বা আমার নয়, রেস্তোরাঁ আর তার বাইরের লনের সব টেবিলের দৃষ্টিই তখন সুন্দরীর দিকে।

হেঁটে নয়, রাজহংসীর মতো তিনি যেন লন পার হয়ে রেস্তোরাঁর হল-এর ভেতর ভেসে এসেছেন। তারপর আমাকে তো বটেই, আশেপাশের অনেককেই বোধহয় তাজ্জব করে বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে, 'হ্যালো পরাশর!' বলে আমাদের টেবিলের দিকেই এগিয়ে এসেছেন।

পরাশর আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবার আমাকেও উঠতে হয়েছে। এ হেন মহিলার সঙ্গে পরিচয় হতে যাওয়ার ঔৎসুক্য আশঙ্কার সঙ্গে একটা ভাবনাই তখন মনের মধ্যে প্রধান। ভদ্রমহিলার পরাশরকে সম্বোধনটায় সত্যিই চমকাতে হয়েছে। পরাশরের চেনা-জানা মহল খুব ছোট নয় তা জানি। এমন একজন সুন্দরী মহিলা তার মধ্যে থাকা একেবারে আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও মহলের কাউকে পরাশরকে নাম ধরে ডাকতে তো শুনিনি। বর্মী শব্দটাই বিকৃত উচ্চারণে ভার্মা ভের্মার মতো অনেক কিছু হয়েছে অনেকের মুখে। কিন্তু এ মহিলা যে একেবারে নাম ধরে ডাকে! এর সঙ্গে এত পরিচয়ই বা পরাশরের হল কখন? আর কিছু ভাববার সময় মেলেনি। মাঝপথে পরিচিত আর একটি টেবিলের ক-জনের সঙ্গে কুশল সম্ভাষণ সেরে সুন্দরী তখন আমাদের কাছেই পৌঁছে গেছেন। এসেই পরাশরের হাত ধরে সানন্দে নাড়া দিয়ে নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে বলেছেন, 'তোমায় দেখে খুব খুশি হলাম পরাশর, কিন্তু সেই সঙ্গে না বলে পারছি না যে এখানে তোমায় দেখব আশা করিনি।'

'আমিও আশা করিনি তোমায় এখানে একলা দেখব।' পরাশর হেসে বলেছে, 'দাঁড়াও, আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই আগে। মিস রঞ্জা কৌশল, বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার, আর আমার বন্ধু মিস্টার কৃত্তিবাস ভদ্র।'

এবার আর হাত ধরে ঝাঁকানি নয়, শ্রীমতী রঞ্জা হাত তুলে শুধু নমস্কার জানিয়েছে আর তার পরের মুহূর্তেই আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ যেন ভুলে গিয়ে পরাশরকে বলেছে, 'সত্যি, তোমার এসব বদখেয়াল তো কখনও দেখিনি, পরাশর। তুমি হঠাৎ রেসের মাঠে কেন?'

'তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে!' প্রথম ঠাট্টা করলেও তারপর সুরটা বদলে পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে, 'কিন্তু তুমি কি সত্যি একা এসেছ? চৌহানকে দেখছি না কেন?'

কপট রাগের ভান করেছে এবার রঞ্জা, 'চৌহান কি আমার হ্যান্ডব্যাগ যে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে! আমি চৌহানের সঙ্গে আসিইনি।'

'আচ্ছা! আচ্ছা! রাগ করছ কেন?' পরাশর হেসে শান্ত করেছে, 'বসো একটু। বসে মাথা ঠাণ্ডা করো। কী অর্ডার দেব, বলো।'

'না না, কিছু অর্ডার দিতে হবে না।' এবার হেসেই বলেছে রঞ্জা, 'আমি রাগ করিনি। কিন্তু এখন বসতে পারব না। বুকিদের মহলে একবার আমায় যেতেই হবে। আমাকে একজন খুব ভাল টিপস দেবে বলেছে।'

'ভাল টিপস তো আমিও দিতে পারি।' ঠাট্টার সুরে বলেছে পরাশর, 'তবু হতাশ হবার সুযোগ থেকে তোমায় বঞ্চিত হতে দিতে চাই না। আমি সঙ্গে গেলে তোমার আপত্তি নেই আশা করি।'

'না না, আপত্তি কীসের!' লীলায়িত ভঙ্গি করে বলেছে রঞ্জা, 'তোমায় সঙ্গী পাওয়া তো একটা সৌভাগ্য। এসো তা হলে, আচ্ছা নমস্তে, মিস্টার ভদ্দর।'

মধুর সুবাসের সঙ্গে হিল্লোলিত দেহের যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে রঞ্জা পরাশরের সঙ্গে চলে গেছে। যেতে যেতে একবার পিছু ফিরে পরাশর চোখের ইশারায় বই দেখে টিকিটটা কেনবার কথাই যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি।

আমার শাস্তি তখন থেকেই শুরু।

রঞ্জা ও পরাশর চলে যাবার পর সত্যি বলতে গেলে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। এই প্রথম আমি এখানে এসেছি। আমাকে সঙ্গে করে এনে এমনভাবে হঠাৎ ফেলে যাওয়া কি পরাশরের উচিত হল!

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা নিয়ে তো সুবিধে পেলেই খোঁচা দেয়। কিন্তু নিজের বেলা? দেহের বাঁধুনি আর চেহারা দেখে এক মুহূর্তে সব ভুলে গেল।

ফ্যাশন ডিজাইনার? ফ্যাশন ডিজাইনার মানে তো শাড়ি ব্লাউজের দোকানের হয় মালিক, নয় দর্জি। তাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা কীসের!

কিন্তু মনে মনে গজরালেও পরাশরের কথাটা না রেখে তো পারা যাবে না। প্রথম রেসের ছ-নম্বর ঘোড়ার টিকিট কিনতেই গেলাম।

টিকিট কেনাটায় খুব হাঙ্গামা হল না। টিকিটের জানলায় তেমন ভিড় নেই। বেশ একটি সুন্দরী মেয়ে ওধারে বসে। নম্বরটা বলতে টাকাটা নিয়ে একটা চাকি-গোছের ঘুরিয়ে বোতাম টিপতেই টিকিট কেটে বেরিয়ে এল।

নম্বরটা একবার দেখে সেটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু পরাশরকে এখন তো পাওয়া দরকার। আমায় শুধু টিকিটটা কেনবার ইশারাই করে গেছে শেষ মুহূর্তে। কিন্তু নিজে কোথায় থাকবে তা তো কিছুই বলে যায়নি। তা না যাক। এমন কিছু ফুটবল মাঠের ভিড় নয়। খুঁজে তাকে পাব নিশ্চয়ই।

প্রথমটা সত্যিই তেমন ভাবনা হয়নি। এদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটু শুধু নজর রেখেছি মাত্র, সে তো একলা নয়, সঙ্গে শ্রীমতী রঞ্জাও আছে, হাজার জনের ভিড়েও সে রূপ আর সাজসজ্জা চোখ এড়াবার নয়।

কিছুক্ষণ বাদে বাদে দু-দুবার বেল বেজে গেছে। কিছু না জানলেও ঘণ্টাধ্বনি যে জুয়াড়িদের তাড়া দেবার সেটুকু বুঝেছি। গোলাকার প্যাডকের রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। রং বেরঙের রঙিন শার্ট ও ক্যাপ পরা বেঁটে বেঁটে জকিরা তখন ঘোড়াগুলোতে উঠতে শুরু করেছে। কাছে প্যাডকের ভেতর আরও সব ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ভিড় করে আছে। পরাশর গোড়াতেই একবার বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ও জায়গায় ঢুকতে পারে শুধু ঘোড়ার ট্রেনার, মালিকপক্ষ, জকি আর সহিসেরা। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা মালিকপক্ষ বলেই বুঝলাম।

সহিসের লাগাম-ধরা ঘোড়ায় চড়ে প্যাডকটায় চক্কর দিয়ে জকিরা প্যাডক থেকে কোর্সের দিকে বেরিয়ে গেল। প্যাডক থেকে কিছুদূর পর্যন্ত রেলিংয়ের দু-ধার থেকে সাদা রঙের রশি টেনে ধরা হয়েছে। ঘোড়াগুলো তারই ভেতর দিয়ে গিয়ে ছোটার কোর্সের রেলিঙের ভেতর ঢুকল। মাইকে তখন ঘোড়ার নাম নম্বর আর জকিদের পরিচয় ঘোষণা হচ্ছে।

ঘোড়াগুলো বেরিয়ে চলে যাবার পর প্রথম একটু যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। সত্যি, এতক্ষণেও পরাশরের দেখা নেই কেন? আমার সম্পর্কে তার একটা দায়িত্ব তো আছে! আমায় টিকিট কিনতে বলে সে যে সুন্দরী রঞ্জার সঙ্গে চলে গেল তারপর আমার কথা ভুলেই গেল নাকি! আমি যে এ রাজ্যে একেবারে নতুন আর আনাড়ি সে কথা তার মনে রাখা উচিত ছিল।

একেবারে জলে পড়েছি তা আমি অবশ্য বলব না। তেমন দরকার হলে কোর্স থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাবার কোনও বাধা আমার নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে এসে তার পর এমন উধাও হয়ে থাকা কি তার উচিত?

কিন্তু সত্যি কোথায় বা সে থাকতে পারে? হঠাৎ মনে পড়ল যে চলে যাবার সময় বুকিরা যেখানে থাকে সেইখানে কোথায় যেন যাবার কথা বলেছিল। সেই দিকেই এবার গেলাম।

কিন্তু সে তো একেবারে মেছোহাটা!

মাইকে তখন ঘোড়াগুলোর স্টার্টিং নেটে পৌঁছে যাবার খবর জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে বুকিদের কাছে বাজি ধরবার জন্যে। মাচার মতো এক-একটা বড় কাঠের চৌকির ওপরে পাতা চেয়ার টেবিল, আর তারই মাথায় লম্বাটে বোর্ডে ঘোড়ার নাম, নম্বর, জকির নাম আর পর পর কে কোন নম্বরে দাঁড়াচ্ছে তার তালিকার পাশে প্রতি ঘোড়ায় বাজির দর কত তা লেখা। চৌকির ওপর জন তিন-চার বসে ও দাঁড়িয়ে জুয়াড়িদের ঢেউ সামলাচ্ছে। একজন ঘড়ি

হাতে ঘোড়ার দরের ওঠানামা লিখছে আর মুছছে। একজন বাজি যে ধরছে তাকে জিতলে কত পাবে হিসেব দেওয়া কার্ড লিখে দিচ্ছে। আর-একজন হয়েছে টাকার ভাঁড়ারি। সবসুদ্ধ জড়িয়ে যেন একটা পাগলা গারদের কাণ্ডকারখানা। এক-একটা বুকির চৌকির সামনে যেন ঊর্ধ্বাহু প্রার্থীর জম্পেশ ভিড়। তবে এত ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি নেবার নয়, দেবার জন্য।

এই ভিড় কোনওরকমে ঠেলে উত্তর দক্ষিণের দু সারির বুকিদের বুক ই ঘুরে দেখলাম। না, পরাশর কি তার সুন্দরী সঙ্গিনী রঞ্জার কোনও পাত্তাই নেই।

ওদিকে তখন মাইকে ঘোড়াগুলোর এক এক করে স্টার্টিং স্টল মানে দৌড় শুরু করবার আলাদা খুপরিতে ঢোকার খবর দিচ্ছে।

এই ঢুকল ডেজার্ট ব্লেজ, এবার ত্রিমূর্তি ঢুকেছে। তারপর ভলন্টারি, বারো নম্বর হাফ-এ-কয়েন গোলমাল করছে, ঢুকেছে স্টেটল, তারপর মেডোসুইট, এবার হাফ-এ-কয়েন ঢুকেছে—

আর তো বুকিদের কাছে অপেক্ষা করা যায় না। এবার তো ঘোড়দৌড় শুরু। মাঝখানের গেট দিয়ে ব্যাজ দেখিয়ে ছুটলাম মেম্বার্স এনক্লোজারের গ্যালারির দিকে। এ সময়ে পরাশর আর তার সঙ্গিনীকে সেখানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়। নিজেরও দৌড়টা চাক্ষুষ দেখবার লোভও আছে।

ধাপ দেওয়া বসবার গ্যালারি। ওপরের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে ধারের দিকে বসলাম। বসার আয়েশ পাঁচ সেকেন্ডও করা গেল না।

মাইকে তখন ঘোষণা করছে, সব ঘোড়া স্টলে ঢুকেছে। স্টার্টার উঠেছেন দৌড় শুরু করাতে...

মাঠের দক্ষিণ দিকে চেয়ে দৌড়ের শুরুতে ঘোড়া ধরে রাখবার খাঁচাগুলো তখন দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি ন-টা তার আর লোহার রডের খুপরি। তার ওপরে স্টার্টারের লাল নিশান দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ সেই লাল নিশান নেমে গেল। তার সঙ্গে বিদ্যুৎতরঙ্গে একসঙ্গে ন-টি খাঁচার দরজা গেল খুলে। সব ক-টি ঘোড়াই বেরিয়ে দৌড় শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে মাইকের ঘোষণা শোনা গেল, স্টার্ট হয়েছে। দৌড় শুরু হবার ঘণ্টাও একটা বাজল। তবে অতটা দূর থেকে আসবার জন্য শব্দটা সেকেন্ড খানেক পরে পেলাম।

মাইকে তখন দৌড়ের বিবরণ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। যন্ত্রটায় গলদ আছে, আওয়াজটা খুব স্পষ্ট নয়, কেমন জড়ানো। তবু তার মধ্যে এইটুকু শুনতে পেলাম যে ভলন্টারি নামে কোনও ঘোড়া এগিয়ে আসছে, তার পেছনে আসছে হাফ-এ কয়েন।

পরাশর যে ঘোড়ার টিকিট কিনতে বলেছে ছ-নম্বরের সেই মেডোসুইট কই। একটি নামই আমার শুধু জানা।

হ্যাঁ, মেডোসুইটের নামও শুনলাম। স্টল থেকে বেরোতেই ঘোড়াটা দেরি করেছে, আছেও পেছনে। থাকবেও নিশ্চয় তাই। পরাশরের অব্যর্থ গণনার পরিণাম ভেবে তখন একটু হাসিই পাচ্ছে।

শুধু তাতেই নয়, হাসি পাচ্ছে মাঠসুদ্ধ লোকের হঠাৎ একেবারে পাগলামির ঢেউয়ে আথালপাথাল হতে দেখে। ঘোড়াগুলো দক্ষিণের বাঁকটা পার হয়ে ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার আর হাত-পা ছোড়ার ধুম। ঘোড়াগুলো যত এগিয়ে আসে প্রায় সব ক-টা ঘোড়ার নামের উচ্চারণ মেলানো চেঁচানি আর আস্ফালনও সেই সঙ্গে। সেকেন্ড থেকে শুরু হয়ে থ্রাও আর তারপর মেম্বার্স এনক্লোজার পর্যন্ত।

কিন্তু ওটা কী শোনা যাচ্ছে মাইকে। ছোঁয়াচে উত্তেজনায় আমারও তখন দাঁড়িয়ে উঠে প্রায় হাত-পা ছোড়ার অবস্থা।

পেছন থেকে সকলকে ছাড়িয়ে কে যাচ্ছে অনায়াসে এগিয়ে!

মাইকে তো শুনছি, মেডোসুইট!

মেডোসুইট! মানে, পরাশরের গুনে বার করা সেই ছ-নম্বর ঘোড়া? হ্যাঁ, মেডোসুইটই জিতল। রেলিঙের ওপারে পোস্টে নম্বর টাঙিয়ে তুলল, ছয়। মেডোসুইট! মেডোসুইট! চেঁচাচ্ছে এখানে সেখানে এক-একটা দল। আমি তখন ভোম মেরে গেছি। ছ-নম্বরের জেতাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। একটু সামলাবার পরই পরাশরের জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম।

তার ঘোড়া জিতেছে, গণনা সার্থক, এমন সময় সে গেল কোথায়? সেই সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে এমন উত্তেজনাময় মুহূর্তে কোথায় চুপ করে আছে?

আর চৌহান? চৌহানের কথাটা এবার মনে পড়ল। তাঁর দৌলতে তাঁর গাড়িতেই তো এখানে এসেছি। কিন্তু তাঁরও তো এসে অবধি দেখা পাইনি। সত্যিই বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

পরাশর এখানে আসবার পরে চৌহানের নিজস্ব একটা বক্সের কথা বলেছিল। কত যেন নম্বর? হ্যাঁ, মনে পড়ল, উনচল্লিশ। উনপঞ্চাশ হলেই ভাল হত বলে ঠাট্টা করেছিলাম বলেই সংখ্যাটা মনে আছে।

বক্সটা একবার দেখলে তো হয়। সেখানে পরাশরকে পেলে আনন্দের সঙ্গে একটু রাগও অবশ্য হবে।

আমাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত আরামে তার বক্সে বসে থাকাটা ক্ষমা করতে পারব না। তবু যে-কোনওভাবে এখন পরাশরকে পেলেই যে বেঁচে যাই।

সামনের সিঁড়ি দিয়েই ওপরে উঠে গেলাম। এ জায়গাটা সম্পূর্ণ অচেনা। পরাশর এই ওপরতলাতেই নিয়ে আসেনি। ওপরের বক্সগুলোর পেছন থেকে সংকীর্ণ করিডর। সে করিডর থেকে পেছন দিকের সিঁড়িতে প্যাডক এর দিকে নেমে যাওয়া যায়। বক্সগুলো ছাড়িয়ে প্যাডক যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে—সামনে আর বাঁ পাশে ওপর থেকে টিকিট কেনবার সব জানলা।

বার ও করিডরে বেশ ভিড়। এখানকার জনতা আরও যেন বাছাই। এঁরা ওপরের বারান্দা থেকেই নীচের প্যাডক-এর ঘোড়া দেখতে পারেন, পারেন সবরকম টিকিটও ওপর থেকে কিনতে। শুধু বুকিদের কাছে বাজি ধরতে গেলে এঁদের কষ্ট করে নামতে হয়।

এখানকার জনতার মধ্যে পরাশর বা রঞ্জা সুন্দরীর দেখা পেলাম না। উনচল্লিশ নম্বর বক্সেও নয়। বক্সটা খুঁজে বার করতে খুব দেরি হয়নি, কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখে প্রথম কিছু জিজ্ঞাসা করতে একটু দ্বিধাবোধ করছিলাম। সে দ্বিধা জয় করবার দরকার হল না। অপরিচিতাদেরই একজন নিজে থেকে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি মিস্টার চৌহানকে খুঁজছেন? তিনি এখনও আসেননি। আমরাও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ও! এখনও আসেননি বুঝি!' মুখে বিস্ময় প্রকাশ করে সেখান থেকে চলে এলাম। মনের বিমূঢ়তা তখন তার চেয়ে অনেক বেশি। সত্যি! ব্যাপারটা কী?

মিস্টার চৌহানের নিমন্ত্রণে তাঁরই গাড়িতে তাঁরই অতিথি হিসেবে এখানে এসেছি। অথচ সেই মিস্টার চৌহানেরই এ পর্যন্ত দেখা নেই! তার চেয়েও আশ্চর্য পরাশরের অন্তর্ধান। শ্রীমতী রঞ্জার সঙ্গে বুকিদের মহলে যাবার নাম করে সে গেল কোথায়? রেসকোর্স থেকেই উধাও হয়ে গেল নাকি?

পরাশরের জেতা ঘোড়ার টিকিটটার কথা অবশ্য ভুলিনি। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্যাডক ঘুরে এবার সেই টিকিটটা ভাঙাবার জায়গাতে গেলাম। জায়গাটা পরাশর দেখিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু পদ্ধতিটা তখনও অজানা। সেজন্যে অবশ্য বেশি কিছু অসুবিধা হল না। টাকা দেবার জানলা কটায় তখন লাইন পড়ে গেছে, লাইনের পেছনে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমার সামনে একটি মাঝবয়সি অবাঙালি মহিলা। পোশাকআশাকে আধুনিক, কিন্তু মুখের

ছাঁদে আর নাকের নাকছাবিতে রাজস্থানি বলেই মনে হল। পঞ্চনদবাসিনীদের সংখ্যাই এ পর্যন্ত বেশি দেখেছি। রাজস্থানিরা তাদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম, বেশভূষাতেও তাদের উত্তরের প্রতিবেশিনীদের দুঃসাহসের নাগাল ধরতে পারেননি।

পোশাকে প্রসাধনে যেমনই হোন, আমার সামনের মহিলা অন্যদিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রগতিশীলা। পরিচয় নেই বলে বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে অনায়াসে বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দিয়েছে শুনেছেন?'

সে আবার কী কথা? প্রশ্নটা যে জিতের টাকা সম্পর্কে তা অনুমান করলেও লভ্যের পরিমাণটা আগেই কোথা থেকে শোনা যেতে পারে তা বুঝতেই পারলাম না।

অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিতে যখন আমতা আমতা করছি, সংশয় মোচনটা হয়ে গেল তখনই।

লাউডস্পিকারে ঘোষণা শোনা গেল। জানা গেল যে ছ-নম্বর ঘোড়ার জিতের টাকা হল সাঁইত্রিশ আর প্লেসের পনেরো। তার পরের দুনম্বর আর একনম্বরের প্লেসের টাকা দিয়েছে সাঁইত্রিশ আর দশ।

সামনের জানলা তখন খুলেছে। অগ্রবর্তিনী পাঁচ পাঁচখানা টিকিট হাতে বার করে ধরে তখন আহ্লাদে আটখানা। উত্তেজিত উল্লাসে আমাকেই শোনাচ্ছেন, 'খুব ভালই দিয়েছে, কী বলেন? বুক এ ছিল তিনের দর, তাও ট্যাকস দিতে হত চল্লিশে সাত টাকা। তার চেয়ে ভালই পেয়েছি।'

কী বা সাতটাকা ট্যাকস, তিনের দর মানেই বা কী ঠিক না বুঝেও বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে তাঁর পেছনে যেতে যেতে এ সবের মর্ম আর পরাশরের গণনার ভেলকির কথা ভাবতে ভাবতে আমি তখনও পরাশর আর শ্রীমতী রঞ্জার সন্ধানেই চারিদিকে চোখ ঘোরাচ্ছি।

'হ্যালো, রঞ্জা!'

চমকে উঠলাম আমার পূর্বগামিনীরই উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সম্বোধিতাকেই এবার দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, শ্রীমতী রঞ্জাই বটে। একেবারে আমার ডানপাশের সারিতে, সারি বলতে মাত্র তিনজন। অর্থ কারণটাও জানলার বোর্ড দেখে বুঝলাম। আমাদের মতো দশ টাকার নয়, তার অন্তত পাঁচগুণ দামের টিকিটের জানলা। প্রার্থী তাই অত কম। আমার পূর্বগামিনী তখন সোৎসাহে বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছেন হিন্দিতে। বক্তব্যটা হল, 'খুব মোটা দাঁও মেরেছ দেখছি। কত খেলেছ? এই দুটো টিকিটে মোটে একশো।' মিস রঞ্জা একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে জানালে।

'একশোতে আশ মেটেনি?' আমার পূর্বগামিনীর গলায় ভর্ৎসনা আর অনুশোচনা মেশানো, 'আমার তো মোটে দশ টাকার একটা টিকিট।'

'আমি যে আবার বুক এ এক নম্বর খেলে মরেছি একজনের ভুল টিপসে!' রঞ্জা দেবী সখেদে ব্যাখ্যা করলে, 'সেখানে একশো সাড়ে সতেরো গেছে না!'

আর কিছু বলবার সময় পেলে না শ্রীমতী রঞ্জা, তার সামনের প্রার্থীর টাকা নেওয়া তখন হয়ে গেছে। এবার তার পালা। কিন্তু আমি এখন করি কী? আমার পুরোবর্তিনীকে নিয়ে এখনও আমার সামনে তো চারজন। আমি জানলায় পৌঁছে টাকা নেবার অনেক আগেই তো মিস রঞ্জা তাঁর প্রাপ্য নিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন, তারপর আবার তাঁর পাত্তা কি সহজে পাব? তাঁর সন্ধান পেলেই যে পরাশরকে ধরতে পারব এ বিষয়ে তখন আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। রঞ্জা দেবী তো পরাশরকে নিয়ে কোন বুকির স্টলে কী অব্যর্থ টিপস নিতে গেছল। সে টিপস তো বোঝা গেল এই টাকার টাকা দরের ফেভারিট এক নম্বর, যা কেঁদে ককিয়ে কোনওরকমে প্রথম দু জনের পেছনে এসেছে। ছ নম্বর মেডোসুইটের টিকিট মিস রঞ্জা তা হলে পরে পরাশরের কথাতেই কিনেছে নিশ্চয়ই। সেই পরাশরের কাছে একবার কৃতজ্ঞতা জানাতেও কি সে এখন যাবে না!

কিন্তু তাকে অনুসরণ করতে গেলে পরাশরের এ টিকিট ভাঙানো যে আর হয় না। এ রাজ্য

সম্বন্ধে তখনও একেবারেই আমি আনাড়ি। লেট পেমেন্টের আলাদা জানলা যে আছে এ কথা নেই, তখন লক্ষ করে দেখবার কথাও মনে হয়নি। জিতের টাকা না নিয়ে পরাশরের খোঁজে অস্থির হওয়াটা উচিত মনে হয়নি তাই। তা ছাড়া একবার যখন পেয়েছি তখন রঞ্জা দেবীকে এর পর খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হবে না মনে হয়েছে। রঞ্জা কৌশল চলে যাবার পর অস্থির হয়ে উঠলাম তাড়াতাড়ি টিকিটটা ভাঙাবার জন্য। কিন্তু যত বাগড়া জুটল কি ঠিক সেই সময়!

পেছন থেকে এসে এক আহ্লাদী চেহারার মহিলা আমাদের সারির সকলের সামনের প্রার্থীর হাতে বেশ এক গোছা টিকিট গুঁজে দিয়ে এঁকেবেঁকে যেন লতিয়ে পড়ে আবদার জানালেন, 'আমার এই পাঁচটা টিকিট, প্লিজ—'

আমার পুরোগামিনীই প্রতিবাদ জানালেন, 'এ তোমার খুব অন্যায়, লীনা। আমরা কখন থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, জানো!'

লীনা নাম্নী আহ্লাদী একটু হেসে ঠাট্টার সুরে জবাব দিল, 'পাঁচটা তো মোটে টিকিট। তাতে তোমার পাওনা কমে যাবে না, চন্দ্রিকা।'

তারপর নিজের টিকিট ভাঙিয়ে লাইন থেকে বেরিয়েই প্যাডক-এর দিকে ছুটলাম। প্যাডক-এর চারিধারে তো বটেই, সমস্ত টিকিটের জানলা, বুকিদের মহল থেকে সামনের পেছনের মেঝে স্টান্ড কিছুই বাদ দিলাম না। কিন্তু রঞ্জা কৌশল আবার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

রঞ্জা বা পরাশরকে আর পাওয়া সম্বন্ধে সত্যিই তখন হতাশ হয়ে পড়েছি। ঠিক সেই মুহূর্তেই ডানদিকে চেয়ে বাড়িটার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নীচের তলার ভিড়টা চোখে পড়ল। ওদিকে দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি শুধু নয়, একটা লিফটও আছে। ওদিকটা দেখা হয়নি। দ্বিধা না করে সেখানে গিয়েই দাঁড়ালাম।

লিফট প্রায় খালিই নামল। প্রচুর জায়গা এর মধ্যে। লাইনের বেশ একটু পেছনে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত জায়গা পেলাম। লিফট প্রথম নীচে থামল দোতলায়, কয়েকজন নেমে যাবার পর লিফটম্যান আবার দরজা বন্ধ করে লিফট ছাড়ল। একেবারে ওপরতলা।

লিফট থেকে নেমে সরু করিডর দিয়ে সামনে গেলাম। এখানে বসবার বেঞ্চির নীচের মতো বাহার নেই। অনেকে ওপরের নীচের চেয়ে নিরিবিলিতে এখানে এসে বেশ বেখাই পছন্দ করে। পরাশর যে তাদেরই একজন হতে পারে সে কথা বোধহয় আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ডানদিকে বাঁদিকে দু দিকে চেয়ারের গ্যালারি। ডানদিকের ঠিক ওপরের সারির নীচে পরাশর একটি কোণে একটা নোটবই নিয়ে বসে আছে। তার পাশেই বসে আছে রঞ্জা কৌশল। পরাশর নিজের নোটবইতেই কী লিখতে তন্ময়। রঞ্জা দূরবিন নিয়ে যে ঘোড়াগুলি স্টার্টিং গেটের দিকে যাচ্ছে তাই লক্ষ করছে।

ওদের অজ্ঞাতসারেই একেবারে ওপরের সারিতে কোণে গিয়ে বসলাম। নোটবইয়ে কী লিখছে পরাশর এমন সময়—এ কী! এখানে বসে কবিতা লিখছে। কবিতার প্রথম ক-টা লাইন:

উচ্চৈঃশ্রবা যে চায় সে চাক
আমার তা নয় শখ আমি চাই চৈতক!

তারপর ক টা লাইন পড়তে পারলাম না। কিন্তু তার নীচে বড় বড় করে ওটা কী লেখা?

আমি পালাচ্ছি। রঞ্জাকে এখন থেকে চোখের আড়াল কোরো না।

পরাশর আমার লুকিয়ে এসে বসা তা হলে টের পেয়েছে! কিন্তু নির্দেশ যা দিয়েছে তার মানে কী? সেই বা পালাচ্ছে কেন? কোথায়?

আমার তখনকার অবস্থাটা বোঝা নিশ্চয় শক্ত নয়। পরাশরের সঙ্গে এখন কথাবার্তা বলা চলবে না। আড়াল আড়াল সেজে পেছনে বসে থেকে শ্রীমতী রঞ্জা কৌশলের ওপর চোখ রাখতে হবে। অনুসরণও করতে হবে আঠার মতো লেগে থেকে।

কতক্ষণ? কী ভাবে?

'আমি পালাচ্ছি। রঞ্জাকে চোখের আড়াল কোরো না।' পরাশর তো হুকুম করেই খালাস। কিন্তু কাজটা কি কোনও ভদ্রলোকের উপযুক্ত? এরকম একটা বিশ্রী নোংরা দায় অম্লান বদনে আমার ওপর সে চাপাল কী বলে?

রঞ্জা কৌশলকে চোখে চোখে যে রাখব, তা তাকে জানিয়ে শুনিয়ে নিশ্চয় নয়। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

পরাশর না হয় দেখেও না দেখার ভান করে তার রেসের বইয়ে মুখ গুঁজে আছে। কিন্তু রঞ্জা এখন দূরবিন চোখে দিয়ে থাকলেও সেটা নামিয়ে হঠাৎ কি দেখে ফেলতে পারে না?

বসে আছি তো ঠিক তার পেছনেই। একেবারে আমায় লক্ষ না করেই এখন থেকে উঠে যাবে এরকম আশা করাই অন্যায়। আর একবার চোখ পড়লে চিনবে না এমন কি হতে পারে! প্রথমটায় তার যদি চিনতে দেরিও হয়, তা হলেও আমার পক্ষে তাকে না চেনার ভান করে বসে থাকা কি ঠিক হবে! সমস্যার কূলকিনারা পাবার আগেই পরাশর হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে কী একটা ভুলে যাওয়া জরুরি কাজ সেরে আসবার জন্য উঠে পড়ল।

'আরে ছি ছি, কী ভুল হয়ে গেছে!' বলে সে উঠে দাঁড়াতেই চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে রঞ্জা জিজ্ঞেস করলে, 'কী হল কী, পরাশর!'

'আরে দেখো না, দুপুরেই একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। রেসের নেশায় বেমালুম ভুলে গেছি। যাই, একবার ফোন করেই আসি।'

পরাশর কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে চলে গেল। আমার পক্ষে কয়েকটা অত্যন্ত উদ্বেগের মুহূর্ত। রঞ্জা কৌশল চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে এদিকে ওদিকে একটু চাইছে। এখনও পেছনে তাকায়নি এই রক্ষা। কিন্তু সে নিষ্কৃতি আর [illegible]।

এমনিতে যদি বা না তাকায়, খেয়ালবশে এখান থেকে যাবার জন্য একবার উঠে দাঁড়ালেই তো না দেখে পারবে না। কী বলবে তখন? ওই ধীশানিন্দিত কণ্ঠে—এই যে মিস্টার ভদ্দর! আপনি এতক্ষণ চুপটি করে বসে আছেন। সাড়ে দেননি তো!

এরকম কিছু বলাই স্বাভাবিক। আর তাহলেই তো আমার অবস্থা কাহিল। এমন জায়গায় বসেছি যে চুপি চুপি সরে পড়বার জো ও নেই। দাঁড়িয়ে উঠে চলে যেতে গেলে চোখে পড়বেই।

কোনও উপায় না পেয়ে পরাশরের রেস বইটাই কোলের ওপর ধরে মাথা নিচু করে সেইটে পড়াতেই যেন তন্ময় হবার ভান করলাম। নিচু হয়ে কোলের ওপর প্রায় মুখ গুঁজে থাকার দরুন হয়তো চোখে না-ও পড়তে পারে। এখন শুধু প্রার্থনা রঞ্জা তাড়াতাড়ি এখান থেকে যেন উঠে যায়।

অনির্দিষ্টকাল এমনই মাথা নিচু করে তো থাকতে পারব না। রঞ্জা তাড়াতাড়ি উঠে গেলে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে নিঃশব্দে তার পিছু নিতে পারি।

আমার প্রার্থনা পূরণ হল ঠিকই। কিন্তু মোট পরিণাম যা হল, কল্পনাও করতে পারিনি।

একটু উসখুস করে রঞ্জা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে তার ফ্যান্সি বাসনাকুলাবটা ভরে রেখে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে ঝপ করে কী একটা পড়ে গেল বেঞ্চির নীচে মেঝেয়।

কী পড়েছে তখুনি দেখতে পেলাম। আমার হাতে যেমন আছে তেমনই একটি রেসের বই। মলাটের রংটা শুধু আলাদা। আমারটা হলদে আর রঞ্জারটা নীল।

চোখে তখন আমি হলদে নীলের সঙ্গে অন্য রংও দেখছি। রেস বুকটা যেন শয়তানি করেই ঠিক আমার আর রঞ্জার বেঞ্চির মাঝখানের ফাঁকটায় পড়েছে। বুঝলাম বইটা রঞ্জার কোলের ওপরই ছিল। খেয়াল না করে ওঠবার সময় সেখান থেকে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পড়লেও সামনের দিকে কি পড়তে পারত না!

রঞ্জা আমার দিকে ফিরে আবার বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে বইটা তুলতে গেল। রঞ্জার মতো

মেয়েকে বেঞ্চির পিঠের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে আমারই পায়ের কাছ থেকে তার বইটা তুলতে যেতে দেখে কি কাঠ হয়ে বসে থাকা যায়। পৌরুষ আর ভদ্রতার খাতিরে তা অন্তত পারলাম না। নিজেকেই নিচু হয়ে মেঝে থেকে বইটা তুলে রঞ্জার হাতে দিতে হল।

মধুর একটি হাসি বিতরণ করে রঞ্জা বললে, 'বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া—'

আমিই তখন এমন ভোম মেরে গেছি যে রঞ্জাকে একটা ভদ্রতার জবাবও দিতে পারলাম না।

ভোম মারবার কারণও কারণ আশাতীত কল্পনাতীতভাবে একেবারে কেলেঙ্কারির কিনারা থেকে বেঁচে যাওয়া।

নিজের চোখকেই তখন বিশ্বাস করতে পারছি না। আমায় সহাস্য ধন্যবাদটুকু জানিয়ে রঞ্জা কৌশল নির্বিকারভাবে চলে যাচ্ছে।

তার মানে আমাকে সে চিনতে পারেনি। এ রকমভাবে বেঁচে যাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচার সঙ্গে যতখানি খুশি হওয়া উচিত ছিল তা ঠিক হতে পারলাম কি।

রঞ্জা কৌশলের আমাকে চিনতে না পারাটা সৌভাগ্য হিসেবেও পৌরুষ অভিমানে কোথায় যেন একটু বিঁধে রইল। এতই আমি রঞ্জার কাছে তুচ্ছ যে আধঘণ্টা আগের পরিচয়ের কোনও ছাপই তার মনে নেই।

মনে নাই থাক, তাই নিয়ে বসে থাকবার তখন আর সময় নেই। রঞ্জাকে চোখে চোখে রাখতে হবে, পরাশরের এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি উঠে ল্যান্ডিংয়ের দিকে গেলাম। এখন নামবার আর কেউ নেই। রঞ্জা একলাই লিফটের বাইরের কোলাপসিবল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে পারি। ওপরের ল্যান্ডিং ওয়েটটা নামার সঙ্গে নীচ থেকে লিফটটা উঠে আসার ইঙ্গিতও পেলাম। কিন্তু এখন রঞ্জার পাশে গিয়ে তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে লিফটে নামাটা ভাগ্যকে বড় বেশি চ্যালেঞ্জ করা হবে। পৌরুষ অভিমানে যতই লেগে থাক, আমায় চিনতে না-পারার সৌভাগ্যটা এখন বরবাদ হতে দিতে চলবে না। দ্বিধা না করে লিফটের দিকে না তাকিয়েই সেটাকে বেড় দেওয়া ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি নীচে নামতে শুরু করলাম। নামতে নামতেই লিফটটা আমার সামনে দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরের ল্যান্ডিংয়ে সেটা থামা, আর দরজা খুলে বন্ধ হয়ে সেটা আবার নামার আওয়াজও পেলাম। আমি তখন দোতলার কাছে পৌঁছে গেছি। লিফট পৌঁছবার আগেই নীচে পৌঁছে যাব নিশ্চয়ই। সেখানে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লিফট থেকে বার হবার পর রঞ্জাকে অনুসরণ করবার কোনও অসুবিধা হবে না।

লিফটের আগে নীচে পৌঁছলাম ঠিকই। নেমে একটু দূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নজর রাখলাম লিফটের নামবার দরজার মুখে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লিফটও নামল। কিন্তু এ কী ভোজবাজি!

লিফটম্যান দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একজন নয়, বেরিয়ে এল দু জন। তাদের কেউ রঞ্জা কৌশল নয়। দু-জনেই আধবয়সি পুরুষ!

কোথায় গেল রঞ্জা কৌশল এর মধ্যে! কোনও ভানুমতীর জাদুর কাঠিতে এক থেকে সে দুই হয়ে গেল নাকি? সুন্দরী যুবতী মেয়ে থেকে দু-জন প্রৌঢ় পুরুষ? ব্যাখ্যাটা মাথায় আসতে দেরি হল না। সেই সঙ্গে আহাম্মকি হিসেবে নিজের ওপর ধিক্কার। দোতলায় ল্যান্ডিংয়ের কথাটা ভুলে গেছলাম কী বলে! সেখানে একটু অপেক্ষা করলেই তো এমন আহাম্মক হতে হত না।

রঞ্জা কৌশল দোতলাতেই লিফট থেকে নেমে গেছে নিশ্চয়ই। প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু-জন সেখান থেকেই উঠেছেন।

নিজের হাত কামড়াতে তখন শুধু বাকি। সেবারের মতো আবার রঞ্জাকে হারাব! আর এত কাণ্ড করে সন্ধান পাওয়ার পর শুধু নিজের বোকামিতে! বারান্দা দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের

পশ্চিমের বড় সিঁড়ি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠলাম। সেখানেও দ্বিধা। বড় সিঁড়ি ডাইনে বাঁয়ে দুভাগ হয়ে গেছে ওপরের দিকে। কোন দিকে যাব আগে? ডাইনে, না বাঁয়ে?

যা থাকে কপালে বলে বাঁয়ের শাখাই বেছে নিলাম। এই দিকেই ওপর থেকে টিকিট কেনবার জানলা আর বার।

নেহাত রোগা পাতলা মানুষ তো নই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওজনটা একটু ভারীরই দিকে। ওপরে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ একটু হাঁফাচ্ছি।

সেই অবস্থায় হঠাৎ চমকে থমকে হাত-পাগুলো যেন প্রায় অবশ হয়ে এল। চমকাবার কারণ মধুর একটি কণ্ঠস্বর।

'এই যে, মিস্টার ভদ্দর! কাকে খুঁজছেন? আপনার বন্ধু পরাশরকে?'

কয়েক সেকেন্ড প্রায় তোতলাই হয়ে গেলাম। হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। সামনেই দাঁড়িয়ে রঞ্জা কৌশল, আমায় সম্ভাষণ করছেন। তাঁর মুখে মধুর হাসি, কিন্তু গলার স্বরে কি একটু বিদ্রূপ?

তখন তো সামনাসামনি দেখেও চিনতে পারেনি। এখন হঠাৎ চিনল কী করে? শুধু যে চিনেছে তা নয়, মনে হল আমার অপেক্ষাতেই যেন সে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। যা অপ্রস্তুত হয়েছিলাম! নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিতে বেশ কয়েক সেকেন্ড লাগল। রঞ্জা নিজে থেকে যে খেইটা ধরিয়ে দিয়েছে সেইটেই ডুবন্ত মানুষের কুটোর মতো শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরলাম।

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু, মানে পরাশর কোথায় গেল দেখতেই পাচ্ছি না। আমি আবার একেবারে এখানে নতুন কি না।' কথাটা বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম যে আমার হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অজুহাত যা দিচ্ছি তা নেহাত খোঁড়া। শুধু খোঁড়াই নয়, একেবারে যে জলজ্যান্ত মিথ্যে তা-ও রঞ্জা দেবীর অনায়াসে বোঝবার কথা, কারণ আগেই পরাশরের পেছনেই যে বসেছিলাম সে কথাটা রঞ্জা দেবী এতক্ষণে কি আর স্মরণ করতে পারেননি! আমাকে যখন চিনতে পেরেছে তখন সে কথাও মনে পড়েছে নিশ্চয়। রঞ্জার কিন্তু আমার কথার খুঁত ধরার কোনও আভাসই দেখা গেল না। অনায়াসে আমার কৈফিয়তটা মেনে নিয়ে সহানুভূতির স্বরেই বললে, 'আপনার বন্ধু নেই বলে জেনে তো আর পড়েননি। পরাশর ঠিক সময়েই হাজির হবে। ওকে এখন খুঁজে লাভ নেই। আপনার পুরনো বন্ধু মনে হচ্ছে, সুতরাং ওর স্বভাব আপনার অজানা নয় নিশ্চয়। এ রকম ডুব মেরে বন্ধুবান্ধবকে জব্দ করে ও মজা পায়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

বলে কি রঞ্জা কৌশল! নিরুপায় হয়ে রঞ্জার পেছনে যেতে যেতেই তখন ভাবছি ব্যাপারটা যে সব উলটো হয়ে গেল! যার পেছনে লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরি করব সে-ই তো আমায় ধরে নিয়ে চলেছে। চলেছেই বা কোথায়!

বেশি দূর নয়, সামনের থামটা ঘুরেই ওপরের একটা বক্সের কাছে গিয়ে রঞ্জা থামল। বেশ বড় ছ সিটের বক্স। কিন্তু খালি তো নয়। চেহারায় পোশাকে ক্ষমতা প্রতিপত্তি পয়সার গরম ফোটে বেরোচ্ছে এমন একটি শেঠমার্কা চেহারা নিজের দেহের মাপসই একটা প্রকাণ্ড দামি বায়নাকুলার নিয়ে সেখানে সামনের একটি চেয়ারে বসে আছে।

রঞ্জাকে আসতে দেখেই সে মূর্তি টাইট পাম্প করা ফুটবল ব্লাডারের মতো মুখ ফিরে তাকিয়েছিল। মুখে চোখে তার চটচটে হাসিমাখানো লুব্ধ প্রত্যাশা। 'আরে রঞ্জা যে! কী কপাল আমার! মনে হচ্ছে জ্যাকপটিই পেয়ে যাব।'

'পেলে ভাগ দিতে ভুলবেন না যেন!' হেসে বললে রঞ্জা, 'আপাতত আপনার বক্সে একটু ভাগ চাই, বৃজলালজি। আমার আর আমার সঙ্গের এই বন্ধুটির জন্যে।'

বৃজলালজির এতক্ষণে আমার দিকে চোখ পড়ল। মুখের ওপর যে ভ্রূকুটিটা সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেটা লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে সরস গলাটা এক মুহূর্তে শুকনো করে ফেলে বললেন, 'বেশ তো, বসো না।' অভ্যর্থনার ধরন দেখে আমার নিজেরই তখন জুতসই কিছু বলে

অবাঞ্ছিত অতিথির ভূমিকা থেকে সরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মধ্যেও মাঝে মাঝে কেমন একটা বেয়াড়া জেদও চাপে। বৃজলালজির দারুণ অপছন্দ বুঝেই, আরও গোঁ ধরে যেন না বোঝার ভান করে হেলে বাধিত করার ভঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

রঞ্জাও সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসে তখন আমার পরিচয় দিচ্ছেন। 'ইনি হলেন মিস্টার ভদ্দর, আমাদের পরাশর ভর্মার বন্ধু। কলকাতায় ওঁর পেপারের কারবার, আজ প্রথম আমাদের গেস্ট হয়ে রেসকোর্স দেখতে এসেছেন।'

পরাশর বর্মার বন্ধু শুনে এক মুহূর্তের জন্যে বৃজলালজির মুখে যদি বা একটু কৌতূহলের আভাস দেখা দিয়ে থাকে, পরমুহূর্তেই সেটা সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে স্পষ্টই একটা অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। আমার পরিচয়টা শোনবার ভদ্রতাটুকুও না দেখিয়ে রঞ্জার কথার মাঝখানেই তিনি চোখে দূরবিন দিয়ে মাঠের দিকেই ফিরে রইলেন।

এ বাজির ঘোড়াগুলো তখন স্টার্টিং গেটে গিয়ে পর পর খুপরি খাঁচায় ঢুকছে। মাইকে সেই ঘোষণাই তখন শুরু হয়েছে। রঞ্জাকে এ বাজিতে কোনও ঘোড়া ধরে কিছু খেলতে দেখিনি। আমি যখন পেমেন্ট উইন্ডোতে আটকে আছি সে সময়ে আগে বেরিয়ে এসে তেতলায় পরাশরের কাছে যাবার মুখে যদি কিছু কিনে এনে থাকে তা হলে আলাদা কথা।

টিকিট কিনুক না কিনুক বাজির সব ঘোড়া নিজের নিজের খাঁচায় ঢোকবার পর রঞ্জার আর কোনও কিছুতে হুঁশ রইল না। নিজের দূরবিন বার করে সেও তখন দৌড়ের ব্যাপারেই তন্ময় হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু এবার সামনের রেস সম্বন্ধে উৎসাহিত হতে পারলাম না। জেদ করে বসে থাকলেও বক্সের আসল মালিকের সুস্পষ্ট অবজ্ঞার গ্লানি তো মনে আছেই, তার ওপর আমার পরিচয় দিতে রঞ্জা যা বলেছে তাও তখন বেশ একটু ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রঞ্জা কাগজের কারবারি বলে আমার ভুল পরিচয় দিয়েছে ঠিকই। কাগজের সম্পাদক তার কাছে কারবারি হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ ভুল পরিচয়ের মূলটুকু সে পেল কোথায়? তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ব্যাপারটা তো স্পষ্ট মনে আছে। পরাশর কাগজের সম্পাদক টম্পাদক গোছের কোনও কথা তো বলেনি, সে বন্ধু কৃত্তিবাস ভদ্র—শুধু ওইটুকুই জানিয়েছিল। কাগজ, তা যে রকমেরই হোক, এবং পত্র আমার সংস্রবের কথা রঞ্জা জানল কী করে? পরাশর কি তাহলে তাকে সে পরিচয় দিয়ে রেখেছে?

দেওয়াটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গে তখন রঞ্জার নেহাত পোশাকি ভাসা ভাসা আলাপই হয়েছিল। সে আলাপের জের টেনে পরস্পর খামোখা আমার পরিচয় দিতে যাবে কেন?

তেতলার গ্যালারিতে গেলে বইটা কুড়িয়ে দেবার সময় প্রায় মুখোমুখি দেখেও না চেনবার পর রঞ্জার এখন হঠাৎ আমায় চিনে ফেলার রহস্যটাই বা কী?

সে রহস্যটার একটা ব্যাখ্যা খানিকবাদেই রঞ্জার কাছেই অবশ্য পাওয়া গেল। বৃজলালজি আমার উপস্থিতিটা যথাসম্ভব অবজ্ঞার সঙ্গে অগ্রাহ্য করেও শেষ পর্যন্ত বোধহয় আর সহ্য করতে পারলেন না। এ দৌড়টা তখন শেষ হয়েছে।

ট্র্যাকের ওপারের বোর্ডে জেতা ঘোড়াদের নাম টাঙাচ্ছে।

'আমাকে একটু উঠতে হচ্ছে, রঞ্জা, কিছু মনে কোরো না,' বলে আমার দিকে পিছু ফিরেই রঞ্জার কাছে বিদায় নিয়ে মেদিনী কাঁপানো পদভারে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বক্স থেকে করিডরে নেমে অবশ্য তাঁকে থামতে হল। রঞ্জা তখন তাঁর দিকে ফিরে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করছে, 'কী, পেমেন্ট নিতে যাচ্ছেন বুঝি?'

'না, একটু ফাঁকায় থাকতে।'

যে গলায় মুখ চোখের যে বিতৃষ্ণার ভঙ্গির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বৃজলালজি চলে গেলেন

তাতে তাঁর হঠাৎ ফাঁকায় যেতে চাওয়ার কারণটা বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট রইল না। ব্যাপারটা আমি বেয়াড়া জেদেই অগ্রাহ্য করলেও রঞ্জার পক্ষে তা বুঝতে না পারা একটু আশ্চর্য।

বৃজলাল চলে যাবার পর রঞ্জা কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই হেসে অনুরোধ জানালে, 'পেছনে কেন! সামনে এসে বসুন না!'

সামনে যাওয়া মানে বৃজলালজির চেয়ারটাই গিয়ে দখল করা। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বৃজলালজির চেয়ারটাই দখল করব? উনি আসবেন না?'

'এলে পেছনে বসবেন,' অম্লান বদনে জানালে রঞ্জা, 'তাছাড়া উনি আর ফিরে বোধহয় আসবেন না।'

'তার মানে?' সামনের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে বসতে বললাম, 'মালিককেই তাঁর বক্স থেকে তাড়ালাম।'

'মালিক!' রঞ্জা কৌশলের মুখে বিস্ময় মেশানো কৌতুকের হাসি। 'বৃজলালজি আবার কীসের মালিক? এই বক্সের? না না, নিজের খরচে বক্স নিয়ে পাঁচজনের সুবিধে করবার মতো বুদ্ধু বৃজলালজি নয়। বক্সের লটারিতে ও নামই পাঠায় না। এ বক্স আমাদের এক পরিচিত বন্ধুর। বৃজলালজি তারই দৌলতে এখানে বসেন।'

'কিন্তু আপনি প্রথমে ওঁর কাছেই যেন অনুমতি চাইলেন এখানে বসবার জন্যে,' নিজের সংশয়টুকু প্রকাশ না করে পারলাম না।

'সে শুধু বৃজলালজিকে একটু খোঁচা দেবার জন্যে। লোকটার টাকার পাহাড় যত উঁচু, মনটা তত নিচু আর ছোট। কিন্তু ওর কথা যাক।' ঘৃণাতেই একটু মুখ বেঁকিয়ে রঞ্জা তারপর হঠাৎ বললে, 'আপনি একটা ব্যাপারে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছেন।'

'কী ব্যাপারে বলুন তো?' সত্যিই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনাকে তখন চিনতে পারিনি বলে।'

কোথায় কখন বলে না বোঝার ভান করে অকারণে কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। সোজাসুজিই ভদ্রতা করে বললাম, 'সেটা অবাক হবার মতো কিছু তো নয়। আপনি আর কতটুকুই বা আমায় দেখেছেন।'

'না, না, যা দেখেছি তাতেই মনে থাকা উচিত ছিল,' রঞ্জা কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হল, 'শুধু তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম বোধহয়। তারপর আপনাকে লিফট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখেই হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। তখন আর আপনাকে কোথায় পাই। তবু দেখা হয়ে গেলে মাফ চাইব ভেবে রাখলাম। খানিকবাদেই যে এমনভাবে দেখা হয়ে যাবে তা ভেবে তখন ভাবিনি।'

এতখানি দীর্ঘ কৈফিয়ত দেওয়াটা বেশ একটু অস্বাভাবিক লাগল। তার কথা শুনতে শুনতে একটু আড়চোখে তাকে লক্ষ করছিলাম। পোশাকে চালচলনে অতি-আধুনিক হলেও যে রকম সহজ সরল মনে হচ্ছে তাকে— সেটা কি তার যথার্থ পরিচয়! পরশরের বেছে বেছে এই মেয়েটির ওপরই নজর রাখতে বলার কারণটা আসলে কী?

এতক্ষণ পর্যন্ত তাকে যেটুকু দেখেছি তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ করবার মতো কিছুই তো পাইনি। ঘোড় দৌড় সম্বন্ধেও যে খুব উৎসাহী তাও মনে হচ্ছে না। নেহাত আলাপটা চালু রাখবার জন্য সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কই, আপনি কিছু খেলছেন না এ বাজিতে। আমার জন্যেই আটকে আছেন নাকি।'

'না, না,' রঞ্জা হেসে প্রতিবাদ জানালে, 'আপনার জন্যে আটকে থাকব কেন! ওই তো উইন্ডো। উঠে গিয়ে টিকিট কিনলেই হয়। কিন্তু এ সব বাজে বাজিতে আমি পারতপক্ষে কিছু খেলি না। সব একেবারে বি-টু ঘোড়া কিনা।'

'বি-টু ঘোড়া মানে?' আমার অজ্ঞতাটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

'বি-টু মানে বি-ক্লাসেরও তলার।' রঞ্জা বুঝিয়ে দিলে, 'এখানে যে সব ঘোড়া দৌড়চ্ছে তার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা বুদ্ধি-মার্কা ঘোড়া। এ সব ঘোড়ার দৌড়ের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। ওই দেখুন না, কোথা থেকে কোন একটা ভীমরাজ ঘোড়া একেবারে হট ফেভারিট হয়ে উঠেছে। একেবারে ফোর ফিফথ-এর দর।'

'কত দর, আর কোন ঘোড়া ফেভারিট, তা এখানে বসে কী করে জানলেন?' আবার আমার অজ্ঞতাটা লজ্জার মাথা খেয়ে জানাতে হল।

সহানুভূতির সঙ্গে হেসে রঞ্জা কৌশল নীচের ট্রাক-এর ওপারের একটা চৌকো বোর্ড দেখিয়ে বললে, 'ওই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা হল বুক-এ নানা ঘোড়ার যখন যে দর উঠছে নামছে, হদিস দেবার জন্য রাখা। বাঁয়ে পর পর সব ঘোড়ার নম্বর দেওয়া আছে, আর ডাইনে তাদের দর। দেখুন সবার ওপরে চার নম্বর আর তার ডান পাশে রয়েছে ফাইভ টু ফোর অন। মানে হল চার নম্বর ঘোড়া ভীমরাজ জিতবে বলে বাজি ধরলে এখন দর পাবেন পাঁচ টাকার চার টাকা মাত্র। তার ওপর আছে শতকরা সাড়ে সতেরো টাকা ট্যাক্স।'

ব্যাপারটা বুঝে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভীমরাজ তা হলে জিতবেই বলে সবাই ধরে নিয়েছে বুঝি? খুব ভাল ঘোড়া?'

'ভাল!' রঞ্জা তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠল, 'একে বি-টু তার ওপর বাপ-মা র পরিচয়হীন নেহাত হাঘরে ঘোড়া। ঘোড়াটা আমার তো অজানা নয়। আমাদের চৌহানই বছরখানেক হল কিনেছে।

'কিন্তু হঠাৎ ও ঘোড়ার ওপর লোকের এত টান হল কেন?'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না।' রঞ্জা মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'আপনার রেসের বইয়ের পেছনে ইনডেক্স দেখুন না, ঘোড়াটার বাপ-মা-র পরিচয় লেখা আছে, আননোন—আননোন! তার মানে না বাপ না মা কারও পরিচয় জানা নেই। সেই ঘোড়া হঠাৎ অডস অন ফেভারিট হয়ে উঠেছে নেহাত বি-টু ক্লাসের দৌড় বলেই।'

এরপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জা বললে, 'এ রেস যখন খেলছিই না তখন আসুন, একটু গলা ভিজিয়ে আসি।'

গলা ভিজিয়ে আসার কথাটা ঠিক না বুঝলেও সত্যিই সংকুচিত হয়ে একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওর কাছে তা টিকল না।

'আসুন, আসুন। ঠিক না করেন, একটা কোলা তো খেতে পারেন। আপনি পরাশরের বন্ধু, আপনাকে এটুকু খাতির অন্তত করতে দিন।' বলে রঞ্জা ডানদিকের বার-এ নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল।

নিজে সে তখন বার-এর কাউন্টারে হেলান দিয়ে হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পাউডার প্যাড বার করে নাকে মুখে অলসভাবে চাপড়াতে চাপড়াতে তারই মতো জন দুই রেস বিলাসিনীর সঙ্গে আলাপ করছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে এই রেসে আসার ব্যাপারটা এবার রীতিমতো খারাপ লাগছিল। রঞ্জা কৌশল নিজে থেকে গ্যাংরেস্ট করায় তাকে নজরে রাখার একদিক দিয়ে সুবিধে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু নজর রেখে লাভটা কী সেইটেই তখন বুঝতে পারছি না। মনে মনে এই নীরস একঘেয়েমি আমার ওপর চাপাবার জন্যে পরাশরের যখন মুণ্ডপাত করছি ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটল। একটা ব্যাপার নয়, পর পর যেন ঘটনার ঝড়।

এতক্ষণ ধরে যেমন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম সবকিছুর একঘেয়েমিতে, হঠাৎ তেমনই একেবারে হাঁফিয়ে দিশাহারা হয়ে যেতে হল পর পর অপ্রত্যাশিত সব উত্তেজনার ঢেউয়ে।

একটা কোক নিয়ে সবে তখন স্ট্রটা মুখে দিয়ে টান দিতে যাচ্ছি—হঠাৎ প্রথম মাইকের ঘোষণাটা শুনতে পেলাম। সে ঘোষণায় আমি অন্তত প্রথমে বিচলিত হবার কিছু পাইনি।

মাইকে তখন ঘোষণা করছে যে, মালিকের বিশেষ অনুরোধে এবং কোর্সের ডাক্তারের

পরামর্শমতো স্টুয়ার্ডদের অনুমতিতে ভীমরাজ ঘোড়াটি এ বাজি থেকে কাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ব্যাপারটা যে বেশ অস্বাভাবিক কিছু, বার-এর কাছে যে ক-জন ছিল, তাদের হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার ধরন থেকেই একটু আঁচ করতে পারলাম। রঞ্জা কৌশলের প্রতিক্রিয়াতে আরও। রঞ্জা নিজে কিছু খেলেনি। কিন্তু ভীমরাজ ঘোড়া শেষ মুহূর্তে মালিকের বিশেষ অনুরোধে কাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে শুনে বিস্ময়ে সন্দেহে রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠল। 'ভীমরাজ উইথড্র করে নেওয়া হচ্ছে কি! ভীমরাজের মালিক তো চৌহান, সে কোথায়?' রঞ্জা বেশ অস্থির হয়ে তখন চারিদিকে তাকাচ্ছে।

হ্যাঁ, কোথায় ভীমরাজের মালিক!

ভারী গলায় প্রায় হিংস্র হুংকার শুনে ফিরে চেয়ে দেখি আমার সঙ্গটাও খানিক আগে যাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল সেই বৃজলালজিই বুনো মোষের মতো রাগে উত্তেজনায় প্রায় ফেটে যাবার মতো চেহারায় এগিয়ে আসছেন।

আমাকে এবার তিনি দেখতেই পেলেন না। রঞ্জার সামনে এসে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকেই যেন অভিযুক্ত করে চড়া গলায় জানতে চাইলেন, 'কই, কোথায় ভীমরাজের মালিক! সে তো আজ কোর্সেই আসেনি। ঘোড়া উইথড্র করছে তা হলে কে?'

'আজ্ঞে, আমি।'

আর একবার চমকাবার পালা। গলাটা শুনে যা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, পেছনে ফিরে তাকিয়ে তাই সত্য বলে জানলাম।

গলাটা পরাশরের। কখন যে সে নিঃশব্দে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি।

আমি শুধু বিস্মিতই হয়েছিলাম, আর বৃজলালজি প্রায় খেপে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত গলায় বললেন, 'আপনি? আপনার ঘোড়া কাটানোর কী এক্তিয়ার? ঘোড়ার মালিক চৌহান, আর সে আজ মাঠেই আসেনি এ পর্যন্ত।'

'তিনি না আসতে পারেন,' পরাশরের গলা যেন মাখন মাখানো, 'কিন্তু আমি তো এসেছি।'

'আপনি এসেছেন তো কী হয়েছে?' বৃজলালজি এবারে প্রায় মারমুখো। বার-এর কাছে যে ভিড় তখন জমে গেছে তার মধ্যে অনেককেই দেখলাম বৃজলালজিরই সমর্থক।

পরাশর তবু নির্বিকার। বার থেকে আমারই মতো একটি কোকাকোলা নিয়ে ছুঁচে টান দিতে দিতে বললে, 'যা হয়েছে তা তো জানতেই পেরেছেন। ভীমরাজকে এ রেস থেকে কাটিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্টার্টার-এর অর্ডারের আসবার আগেই যখন কাটানো হয়েছে তখন বাজি যা ধরেছেন তার কিছু অবশ্য ফেরত পাবেন। তবে অডস অন ফেভারিট ছিল বুঝে যদি ধরে থাকেন তাহলে টাকায় পঞ্চাশ পয়সাই কাটা যাবে। খুব বেশি লোভ করেছিলেন নাকি?'

'শাট আপ।' একেবারে সত্যিই যেন ফেটে পড়লেন বৃজলালজি, 'যা-ই ধরে থাকি, দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। আমি যাচ্ছি, স্টুয়ার্ডদের কাছে। মালিক উপস্থিত নেই, তবু তার অনুরোধে কী করে ঘোড়া শেষ মুহূর্তে উইথড্রন হল জানতে চাই।'

বৃজলালজির সঙ্গে আরও অনেককেই এ অভিযানে যেতে প্রস্তুত দেখা গেল।

কিন্তু যাওয়া তাঁদের হল না। তাঁরা যাবার উপক্রম করতেই আগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বেশে একটু কঠিন গলায় পরাশর তাঁদের সাবধান করলে, 'মিছিমিছি কেলেঙ্কারি করতে চান তো করুন। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা একটু বিশ্বাস করলে ভাল করতেন।'

'কীসে বিশ্বাস করব আপনাকে।' বৃজলালজি নয়, তাঁরই সমর্থকদের একজন জ্বলন্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

'বিশ্বাস করবেন আমি ভীমরাজের মালিক বলে।' পরাশর ধীরে ধীরে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'কাল রাত্রেই চৌহানের এ ঘোড়া আমি কিনেছি।'

'কাল কিনেছেন? আপনি? চৌহান এ ঘোড়া আপনাকে বিক্রি করল? আর মালিক হয়েই আপনি জিতের মুখে ঘোড়াটা কাটিয়ে নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করলেন।' একা বৃজলালজি নয়, সমবেতদের ভিন্ন ভিন্ন ক্রুদ্ধ ও কাতর মন্তব্য।

পরাশর শুধু শেষ মন্তব্যটারই জবাব দিলে একটু হেসে, 'সর্বনাশ করেছি অর্ধেক অন্তত বাঁচিয়ে দিয়েছি, আশা করি পরে বুঝবেন। আচ্ছা নমস্তে।'

আমায় চোখের ইঙ্গিতে ডেকে পরাশর সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ পেছনে অস্ফুট আর্তনাদে তাকে থামতে হল।

'আমার ব্যাগ।' আর্তনাদটা আর কারও নয়, রঞ্জা কৌশলের। ফিরে দাঁড়িয়ে প্রায় এক লাফে রঞ্জার কাছে এসে পরাশর বেশ একটু তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে তোমার ব্যাগের? ব্যাগ তো তোমার হাতে।'

সত্যিই রঞ্জা হাতে একটা ব্যাগ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। ব্যাগটা ঠিক সাধারণ নয়, আর এ পর্যন্ত তার হাতে এই ব্যাগই দেখেছি বলে মনে পড়ল। রঞ্জার মুখে কিন্তু তখন কে যেন ছাই মেড়ে দিয়েছে।

পরাশরের কথার উত্তরে প্রায় অস্ফুটে ভীত কণ্ঠে সে বললে, 'এ ব্যাগ আমার নয়, কে বদলে নিয়েছে—'

'বদলে নিয়েছে।' উপস্থিতদের একজন প্রশ্ন করলে, 'নেবার কারণ কী? টাকা ছিল অনেক?'

'না, না, টাকা ছিল না বেশি। কিন্তু—' রঞ্জা ভয়ে দিশাহারা হয়েই যেন আর কিছু বলতে পারলে না।

'কিন্তু কী? অন্য দামি জিনিস ছিল কিছু? গয়না-পত্র দলিল-টলিল?'

অনেকের অনেক প্রশ্নের ভেতর থেকে একরকম জোর করেই রঞ্জার ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে পরাশর প্রায় আদেশের সুরে বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

উপস্থিতদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবাদ জানাতে গেল। কিন্তু তখন রেস শুরু হওয়ার ঘণ্টা দিয়েছে। কোনও একজন [illegible] ব্যাগ বদল হওয়ার রহস্যের চেয়ে সে দৌড়ের আকর্ষণ অনেক বেশি। বিনা বাক্যব্যয়ে পরাশর রঞ্জা ও আমাকে নিয়ে নীচে নেমে গেল। কিন্তু নীচে নেমে পরাশর চলেছে কোথায়? [illegible] থেকে তো বেরিয়েই যাচ্ছে দেখছি।

এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে পরাশর সত্যিই একেবারে বাইরের হাতায় চৌহানের গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির। ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার যেন অপেক্ষা করেই ছিল। আমরা গিয়ে পৌঁছতেই সেলাম করে দরজা খুলে ধরলে। প্রথমে রঞ্জা ও তারপর তারই মতো হতভম্ব আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিজে উঠে পরাশর হুকুম দিলে, 'চলো, সাহেবকা কোঠি—'

'জো হুকুম,' বলে দরজা বন্ধ করে ড্রাইভার তার সিটে গিয়ে বসে গাড়ি ছেড়ে দেবার পর বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাহেবের কোঠি মানে? কোথায় যাচ্ছি আমরা? মি. চৌহানের বাড়ি?'

'তা ছাড়া আবার কোথায়?' পরাশরের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'কিন্তু চৌহানের বাড়ি কেন?' এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়ে রঞ্জা প্রশ্ন করলে।

'কেন?' পরাশর রঞ্জার দিকে ফিরে একটু অপ্রস্তুতভাবে চেয়ে বললে, 'শুনলে অবাক হবে কি না জানি না, কিন্তু চৌহানকে আজ দুপুরে বারোটা নাগাদ কে যেন গুলি করেছে।'

'গুলি করেছে? চৌহানকে?' রঞ্জার স্তম্ভিত গলার মধ্যেই কথাগুলো যেন আটকে গেল। আমার অবস্থাও প্রায় তাই। 'হ্যাঁ, বেলা বারোটা নাগাদ।' পরাশর যেন মেপে মেপে বললে, 'তুমি তো তখন চৌহানের কাছে গিয়েছিলে?'

'আমি! আমি—' রঞ্জার মুখ দিয়ে আর কিছু বার হল না।

'হ্যাঁ, অস্বীকার করবার চেষ্টা কোরো না,' পরাশরের গলা যেমন শান্ত তেমনই দৃঢ়, 'তুমি গিয়েছিলে, তার সাক্ষী আছে ওখানে।'

'কিন্তু আমি তো ' রঞ্জা এবারও কথা শেষ করতে পারল না। পরাশরই তার হয়ে কথাটা পূরণ করে বললে, 'তুমি গুলি করোনি বলতে চাইছ? কিন্তু যে ব্যাগ তোমার বলে হয়েছে বলছ, সেই ব্যাগের ভেতরেই তোমার বিরুদ্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ আছে বলে আমার বিশ্বাস। তোমার অনুমতি না নিয়েই তাই ব্যাগটা খুলছি।'

পরাশর সত্যি সত্যিই এবার ব্যাগটা খুলে ফেলল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে তাই দিয়ে সন্তর্পণে ধরে যে জিনিসটি বার করে আনল সেটি সত্যিই একটি ছোট বাহারি পিস্তল, মেয়েদের হাতেই যা মানায়।

আমি হতভম্ব, আর রঞ্জার মুখে এমন একটা ভীত করুণ অসহায় ভাব যা অভিনয় হলে অতুলনীয়ই বলতে হয়।

অনেক কষ্টে নিজেকে যেন সামলে রঞ্জা বললে, 'কিন্তু ও পিস্তল আমার নয়। কখনও ওরকম কোনও পিস্তল আমার ছিল না।'

'কিন্তু এ পিস্তলে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে, তা যদি তোমার হয়?' পরাশর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রঞ্জার দিকে।

'যদি আমার হয়!' হতাশভাবে বললে রঞ্জা, 'কিন্তু আমার আঙুলের ছাপ তো থাকতেই পারে। প্রথমে না জেনে আমি ব্যাগ হাঁটকাবার সময় পিস্তলটা তো ধরে ফেলি। তবে তাইতেই হঠাৎ ভয় পেয়ে "আমার ব্যাগ" বলে চিৎকার করে উঠি।'

রুমাল দিয়ে ধরা পিস্তলটা আমার ব্যাগের ভেতর রেখে পরাশর একটু যেন নির্মমভাবেই এবার বললে, 'আশা করি তোমার কৈফিয়ত সত্য বলে প্রমাণ হবে।'

'তুমি, তুমি কি আমায় বিশ্বাস করো না, পরাশর?' কাতরভাবে পরাশরের কাছেই যেন শেষ আশ্রয় চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জা।

'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এটা নয়, রঞ্জা।' পরাশর নির্লিপ্ত ভাবে বললে, 'আচ্ছা, একটা কথা সত্য করে আমায় বলবে?'

'নিশ্চয় বলব। এতটুকু মিথ্যা বলব না।' আকুল হয়ে বললে রঞ্জা, 'বলো, কী তোমার প্রশ্ন?'

'চৌহানের কাছে তুমি গিয়েছিলে সে কথা তো অস্বীকার করছ না।' পরাশর বললে, 'কিন্তু সেখানে গিয়েও চৌহানকে সঙ্গে নিয়ে একলা মাঠে এলে কেন?'

'কেন এলাম!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বললে রঞ্জা, 'একলা চলে এলাম রাগে আর অভিমানে। চৌহান ঘরে থেকেও আমার সঙ্গে দেখা করেনি।'

'ঘরে থেকেও তোমার সঙ্গে দেখা করেনি!' পরাশরের গলায় স্পষ্ট সন্দেহের সুর, 'চৌহানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আমার একেবারে অজানা নয়, রঞ্জা।'

'যা জানো তা তো আমি অস্বীকার করছি না।' এবার প্রায় শান্ত স্বরে বললে রঞ্জা, 'কিন্তু জানো না এমন কিছুও আছে। ক-দিন ধরে যে কোনও কারণে হোক আমাদের একটু মন-কষাকষি যাচ্ছিল। আমি আজ সেটা শেষ করে দেবার জন্যেই চৌহানের কাছে যেতে কিছু না জানিয়েই গিয়েছিলাম। ইচ্ছে করে প্রথমে ওর ঘরে যাইনি। ওর বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে বসবার ঘরেই অপেক্ষা করছিলাম। বেয়ারা যাবার পর অনেকক্ষণ বাদেও চৌহান না আসায় ভেবেছিলাম চৌহান বুঝি বাড়িতে নেই। এবার তার ঘরেই কিছু একটু চিহ্ন আর চিঠি রেখে যাব বলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হল এর ভেতর দিয়ে যাবার সময়েই চৌহান ঘরে আছে প্রমাণ পেয়ে তখনই ফিরে চলে আসি। ঘরে থেকেও চৌহান আমায় বসবার ঘরে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে—এ অপমান তখন আমার অসহ্য লেগেছে।'

'চৌহানকে ঘরে থাকতে তা হলে তুমি দেখেছ?' কী যেন ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞাসা করলে পরাশর, 'সে-ও তা হলে তোমায় দেখেছে?'

'না, সে দেখতে পায়নি।' বললে রঞ্জা, 'ঘরের কাঁচের সার্সি বন্ধ ছিল। আমি তার পেছনে ওর

ছায়া দেখেই বুঝেছিলাম যে ও ঘরে আছে। ও আমায় দেখতে পায়নি।'

কিন্তু পরাশরের মুখে একটু অদ্ভুত হাসি যেন ফুটে উঠল। 'ওই বন্ধ কাঁচের জানলা দিয়েই চৌহানকে গুলি করা হয়েছে। আর গুলি যা পাওয়া গেছে তা তোমার আঙুলের ছাপ লাগা ওই পিস্তলের সঙ্গেই মিলবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু চৌহানকে আমি গুলি করতে যাব কেন?' এতক্ষণের অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়ে প্রায় আর্তনাদের সুরে বললে রঞ্জা, 'চৌহান কি আমার শত্রু। চৌহানকে আর কেউই বা গুলি করতে যাবে কেন?'

'কেন তা জানো না?' পরাশর যেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললে, 'গুলি করেছে ওই ভীমরাজের জন্যে।'

'ভীমরাজ মানে ওই ঘোড়াটার জন্যে!' এবার আমিই সবিস্ময়ে বললাম।

'হ্যাঁ, ওই ঘোড়াটাকে নিয়ে একটা মস্ত বড় ব্যাকেট-এর তোড়জোড় অনেকদিন ধরেই চলছিল,' পরাশর ব্যাখ্যা করে বোঝালে, 'ওই ঘোড়াটাকে কাজে লাগিয়ে বিরাট একটা দাঁও মারবার ষড়যন্ত্র। চৌহান মাঠে-টাটে যায়, কিন্তু জাত-জুয়াড়ি যাকে বলে তা ও নয়। ঘোড়া-টোড়া কেনার কোনও বাতিক ওর ছিল না। বন্ধু-বান্ধবের কথায় আর হঠাৎ চোখে লেগে যাওয়ার দরুন অতি সামান্য দামে দিল্লিতে একটা বাচ্চা ঘোড়া একদিন কিনে ফেলে। ঘোড়াটার কোনও কুলের পরিচয় দেবার মতো কিছু নেই, কিন্তু চেহারাটার একটু চটক আছে। দিল্লি থেকে কিনে চৌহান ঘোড়াটাকে এখানকার এক ট্রেনারের জিম্মায় দিয়ে তার কথা প্রায় ভুলেই গেছল। চৌহানের ট্রেনারই একদিন এসে তাকে হুঁশিয়ার করবার চেষ্টা করে বলে যে, ভীমরাজ ঘোড়াটা নিয়ে কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে বলে তার সন্দেহ হয়। তার স্টেবলের সহিস বেয়ারাদের কে তার ভেতর আছে এখনও ধরতে পারছে না বলে সে চুপ করে আছে।

কিন্তু চৌহান যেন ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য না করে, ট্রেনার তো সজাগ থাকবেই, চৌহানও যেন তার দিক দিয়ে এ ব্যাপারের একটা হদিস পাবার চেষ্টা করে।

হদিস যা পাওয়া যায় তা সাংঘাতিক শয়তানির। আজকের রেসেই সে শয়তানি চূড়ান্তভাবে সফল করবার ব্যবস্থা হয়েছিল।'

'কীসের ব্যবস্থা হয়েছিল?' রঞ্জাই জিজ্ঞাসা করলে উৎসুকভাবে, 'ভীমরাজকে দিয়ে বাজি মারার? আজ ভীমরাজ ও রেসে দৌড়োলে জিতত?'

'হ্যাঁ, জিতত নিশ্চিত।' গম্ভীর হয়ে বললে পরাশর, 'কিন্তু চক্রান্তটা তাকে জিতিয়ে দাঁও মারবার মতো অত সরল সোজা নয়। অনেক বেশি গভীর। ভীমরাজ তো দেখেছ আজ অড্স অন ফেভারিট হয়ে গেছল। তার দর যা নেমে গেছল তাতে ভীমরাজের ওপর দিয়ে কত টাকা আর তোলা যেত? তাই ষড়যন্ত্রটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ভীমরাজকে রাখা হয়েছিল শুধু সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে।'

'কিন্তু ভীমরাজ যে জিতত তা তো তুমি নিজেই বলছ।' আমি আমার সংশয়টা প্রকাশ করলাম, 'জিতলে আর চোখে ধুলো বলছ কেন?'

'বলছি, জেতাটা সত্যিই চোখে ধুলো ছাড়া আর কিছু নয় বলে।' পরাশর তিক্তভাবে হাসল, 'ভীমরাজ জিতত ঠিকই, কিন্তু তার পরেই অবজেকশনের সংকেত-সাইরেন বাজত। এবং সে সাইরেনের পর লাল নয়—নীল চোঙা উঠত মাঠে।'

'নীল চোঙা!' রঞ্জা বিস্মিত স্বরে বললে, 'লাল আর সাদা কোন্-ই তো জানি, নীল কেন আবার আছে নাকি?'

'আছে।' জানালে পরাশর, 'আঠারো নম্বর বিধান ধরে স্টুয়ার্ডরা যদি ঘোড়ার দৌড় সম্বন্ধে তখুনি তদন্তের ব্যবস্থা করে তা হলে নীল চোঙা ওঠে। তদন্তে দোষ প্রমাণ হলে নীল চোঙার সঙ্গে সাদা চোঙাও তোলা হয়। ভীমরাজের বেলা তা-ই তোলা হত।'

'কেন?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'কারণ ভীমরাজের মুখের ফেনাতে নিষিদ্ধ ওষুধের এমন নির্ভুল স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেত যে তার জন্যে লম্বা ল্যাবরেটরি টেস্টের দরকার থাকত না।'

'কিন্তু জেতা ঘোড়াকে অমন ভাবে হারিয়ে লাভ?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'লাভ—তার পরে চড়াদরের যে ঘোড়া দ্বিতীয় হবে, সফল নালিশে ভীমরাজ বাতিল হওয়ার দরুন তার প্রথম হয়ে যাওয়া।' পরাশর বোঝালে, 'বাজারে উড়ো খবর রটিয়ে ভীমরাজকে ফেভারিট করার পিছনে ওই প্যাঁচই ছিল। সাধারণকে একটু পথ দেখিয়ে ভীমরাজের জন্যে পাগল করে তুলে আসল টাকা গিয়ে পড়েছে অন্য এক ঘোড়ার ওপর। আমি মালিক হয়ে গিয়ে ভীমরাজকে না কাটিয়ে নিলে সেই ঘোড়াই এতক্ষণে প্রথম বলে ঘোষণা পেয়ে কিছু শয়তানকে বড়লোক করে দিত।'

একটু থেমে কথাগুলোয় যেন দাগ দিয়ে পরাশর আবার বললে, 'চৌহানকে মারবার কারণ এই, যাতে শেষ মুহূর্তে এ ঘোড়ার দৌড় সম্বন্ধে সে কোনও বাধা না দিতে পারে। তা ছাড়া এ খুনটা ভীমরাজকে অন্যায়ভাবে জেতানোর সঙ্গেই জড়ানো মনে হবে, তার পরের ঘোড়াটার শেষ পর্যন্ত যেন পাকে চক্রে উইনার হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্বন্ধ কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারবে না।'

'আমি এরকম ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারি তুমি ভাবতে পারছ?' রঞ্জার কণ্ঠে এবার শুধু বেদনা নয় তার সঙ্গে তীব্র ক্ষোভও মেশানো।

'ভাবা খুব কঠিন', পরাশর স্বীকার করলে। কিন্তু তারপর যেন দ্বিগুণ জোর দিয়ে বললে, 'তবে এ ষড়যন্ত্র যারা করেছে তারা অচেনা অজানা বাইরের কেউ নয়। চৌহানের সঙ্গে যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এমনই অন্তরঙ্গ মহলেরই লোক। সুতরাং তোমাকে একেবারে বাদ দিই কী করে বলো! বিশেষ করে যখন জানা যাচ্ছে যে তুমি ঠিক ওই সময়টিতেই চৌহানের কাছে গেছলে, আর তোমার ব্যাগেই এমন একটা পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে যেটা থেকেই চৌহানকে গুলি করা হয়েছে বলে হয়তো প্রমাণ মিলবে।'

আর কিছু না বলে রঞ্জা নিজের উদ্গত কান্না চাপবার জন্যেই বোধ হয় দু-হাতে মুখ ঢাকল, আর পরাশর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তীব্র অভিযোগের সুরে বললে, 'কিন্তু তোমায় তো রঞ্জার ওপর সমানে নজর রাখতে বলেছিলাম। তাও পারোনি?'

'আমি, আমি, মানে,—' প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে তারপর রেগে উঠেই বললাম, 'কে বললে নজর রাখিনি! তোমার নির্দেশ পাওয়ার পর লিফট থেকে নামবার সময়টুকু ছাড়া আগাগোড়া চোখে রেখেছি। তার জন্যে কষ্ট করতেও হয়নি। রঞ্জা দেবী নিজেই আমায় চিনে নিয়ে সঙ্গী করেছেন।'

'হুঁ।' পরাশরের মুখে যেন বিদ্রূপের আভাস, 'তা সঙ্গী হয়ে লক্ষটা কী করেছ।'

'লক্ষ করবার কিছু থাকলে তো করব!' আমি ক্ষুণ্ণ স্বরেই জবাব দিলাম, 'উনি খানিকক্ষণ আমায় নিয়ে একটা বক্সে বসেছিলেন। তারপর উঠে বার-এ গিয়ে দুটো সফট ড্রিংক অর্ডার দেবার পরই ভীমরাজের নাম কাটবার ঘোষণা আর আনুষঙ্গিক সব ব্যাপার শুরু। তুমি তো তখন সেখানে হাজিরই হয়েছ!'

শেষ কথাটা তাকে একটু খোঁচা দেবার জন্যই বলেছিলাম।

কিন্তু পরাশর সেটা হয় টের না পেয়ে অথবা গ্রাহ্য না করে আগের মতোই একটু বিদ্রূপের সুরে বললে, 'যতক্ষণ সঙ্গে ছিলে তার মধ্যে তুমি লক্ষ করবার মতো কিছুই পাওনি? তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে রঞ্জার দেখা হয়নি, কারও সঙ্গে সে কথা বলেনি?'

'কথা বলবেন না কেন,' পরাশরকে বাধা দিয়ে বললাম, 'প্রথমে যে বক্সে নিয়ে গিয়ে আমায় বসান সেখানেই তো একজন ছিল।'

'কে?' পরাশরের গলা একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আগ্রহে।

'ওই ভীমরাজ কাটিয়ে নেওয়া নিয়ে বার-এ তোমার ওপর যিনি খাপ্পা হয়েছিলেন সেই বৃজলালজি। তিনি অবশ্য খানিক বাদেই আমাকে সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে যান বক্স থেকে।'

'বৃজলালজি!' পরাশর কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, 'বৃজলালজি তাহলে বক্সে ছিলেন?'

'কিন্তু,' সত্যের খাতিরে আমায় বলতে হল, 'রঞ্জা দেবীর ব্যাগ বদলের কোনও সুযোগ তাঁর ছিল না। তিনি শুধু হাতেই বেরিয়ে গেছলেন, আর রঞ্জা দেবীকে বক্স থেকে পরে গিয়ে তাঁর ব্যাগ খুলে পাউডার নিতেও আমি দেখেছি। তখনও পর্যন্ত ব্যাগ বদল হয়নি।'

'ব্যাগটা বদল হয়েছে বলেই তাহলে তুমি ধরে নিচ্ছ!' পরাশরের মুখের হাসিটা একটু যেন বাঁকা ঠেকল, গলার স্বরটাও।

হাতের ঢাকা সরিয়ে এবার মুখ তুলল রঞ্জা। কাতরতার বদলে চোখে তার এখন একটা হতাশ ঔদাসীন্য।

'ধরে নেওয়াটা তোমার বন্ধুর অন্যায় হয়েছে এই তো তুমি বলতে চাও?' ক্লান্ত গলায় বললে রঞ্জা, 'বেশ তা-ই ধরে নাও। কিন্তু এখন আমায় নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, লালবাজার তো এত দূর নয়।'

'লালবাজারে এখনও যাইনি।' একটু অবাকই হতে হল পরাশরের কথায়, 'তোমার আর বৃজলালজির কথা শোনবার জন্যে গাড়িটা নিয়ে গড়ের মাঠেই চক্কর দিচ্ছি।'

'শোনা যদি হয়ে থাকে তা হলে আমার একটা অনুরোধ রাখবে?' রঞ্জা শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'লালবাজারে যাবার আগে, যেখানেই যাও, চৌহানকে আমায় একবার দেখতে দেবে? সে কি বেঁচে আছে এখনও?'

রঞ্জার গলার স্বরটা প্রায় বন্ধ হয়ে এল শেষ কথাটা বলতে গিয়ে।

পরাশরের উত্তর দিতে [illegible] বোধহয় দেরি হল। একটু নীরবে খানিকক্ষণ রঞ্জার দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, 'অন্তত [illegible] আমার বিশ্বাস।'

'তা হলে আমায় [illegible] শেষ দেখা একবার দেখতে দাও। তারপর নিয়ে যেও যেখানে চাও।' এতক্ষণের সংযমের বাঁধ ভেঙে আবার আকুল হয়ে উঠল রঞ্জার কণ্ঠ।

'অত্যন্ত দুঃখিত, রঞ্জা [illegible]' নিরুপায় হয়ে বললে পরাশর, 'চৌহানের কাছে এখন তোমায় নিয়ে যেতে পারছি না। লালবাজারে ওঁরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

চৌহানের কাছে নিয়ে যেতে চায়নি পরাশর, কিন্তু তার সঙ্গেই প্রথম দেখা হল মিনিট দশেক বাদে।

শুধু চৌহান নয়, বৃজলালজি এবং আরও একটি মহিলা। ভদ্রমহিলাকে বেশ চেনা-চেনাই লাগল গোড়া থেকে। নামটা শোনবার পর স্মৃতিটা আর ঝাপসা রইল না। নামটা লালবাজারের একটি কামরাতেই যাবার পর শুনলাম। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কি মেজ কি সেজ জানি না, ওপরওয়ালাই কেউ হবেন। ডাকতে শুনলাম মি. লাহিড়ী বলে পরাশরকে। সেই লাহিড়ীরই একটি ভেতর দিকের নিরিবিলি ঘর লালবাজারে।

সেখানেই একজন সার্জেন্ট পরাশরের সঙ্গে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার পর রঞ্জার মতো আমিও অবাক।

ঘরটার অফিস-অফিস চেহারাই নয়, কোতোয়ালি গন্ধও কোথাও নেই। সোফা কৌচ পাতা মাঝারি আকারের একটা যেন বসবার কামরা। সেখানে পোশাক থেকেই একজনকে পুলিশের

বড় অফিসার বলে বোঝা গেল। নামটা শুনলাম লাহিড়ী। লাহিড়ী ছাড়া আর যে তিনজন সেখানে বসে, তাদের সেখানে দেখবার কথা কল্পনা করিনি। রঞ্জা তো নয়ই।

মহিলা বাদে তিনজনের একজন বৃজলালজি, দ্বিতীয়জন স্বয়ং চৌহান।

'চৌহান!' ঘরে ঢুকে রঞ্জা কৌশল নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে যে চিৎকারটা করে উঠল সেটা চাপা উত্তেজনায় এমন তীব্র যে তা বিস্ময়ের না আতঙ্কের স্পষ্ট করে বলতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।

চৌহানও তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে, একটু হেসে বললে, 'হ্যাঁ—এখনও বেঁচে আছি অক্ষত শরীরে। কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

'আমি আমাকে এরা—' রঞ্জা এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না।

পরাশরই তাকে আর আমাকে সামনের দুটি কৌচে বসতে বলে যেন তার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ করলে।

'রঞ্জা দেবীকে একটি বিশেষ কারণে এখানে আনা হয়েছে। কেন আনা হয়েছে—' বৃজলালজি ও অন্য মহিলাটির দিকে চেয়ে পরাশর বললে, 'আপনাদেরই বা কেন এখানে ডাকানো হয়েছে, মি. লাহিড়ী সবই এবার বুঝিয়ে বলবেন।'

লাহিড়ী তাই বললেন। তিনি যা বললেন গাড়িতে পরাশরের কাছে আগেই তার সবাংশ আমরা শুনেছি। লাহিড়ী সবিস্তারে সেই চক্রান্তের কথা যা জানালেন তাতে বোঝা গেল পরাশর এবং আই. বি. বিভাগ বেশ কিছুকাল আগে থেকেই এ ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েছিল। এই দলের চাঁইদের ধরবার জন্য শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁদই তাই পাতা হল। চৌহান অবশ্য তাতে স্বেচ্ছায় সাহায্য করে।

চক্রান্তটা ছিল পরাশরের কাছে আগেই যা শুনেছি তাই। ভীমরাজ ঘোড়াটিকে ধরা পড়বার জন্য সামনে রেখে পেছন থেকে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা।

'ভীমরাজ ঘোড়াটি নিয়ে কয়েকটা গোলমেলে ঘটনায় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে চৌহান প্রথমে পরাশরকে পরামর্শের জন্য ডাকে। পরাশর তখন থেকেই আই. বি-র সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটার ওপর গোপনে নজর রাখবার ব্যবস্থা করে, চক্রীদের ধরবার একটা ফন্দি আঁটে।

সে ফন্দির প্রথম চাল হল চক্রীদের মরিয়া করে তোলা। কথায় বার্তায় চৌহান তখন থেকে এই ইঙ্গিত দিতে থাকে যে ভীমরাজ ঘোড়াটার কুলজি সম্বন্ধে তার একটু সন্দেহ লাগতে শুরু করেছে। বাপ মা দুইই তার অজানা বলে রেকর্ডটা কতটা সত্যি তাই অনুসন্ধান করার কথা যেন সে ভাবছে।

চক্রীরা এ সব কথায় প্রমাদ গোনে। তারা বোঝে যে ভীমরাজকে কেন্দ্র করে যে জটিল চক্রান্ত তারা করেছে তার কাজ তাড়াতাড়ি হাসিল না করে তুললেই নয়। আজকের তারিখ ছিল ভীমরাজের দৌড়ের প্রথম দিন। এ তারিখের পর আর অপেক্ষা করতে তাদের ভরসা হল না। তাই কোনও রকম বাধা যাতে না আসে তার জন্যে চৌহানকে রেসের আগেই খতম করার ব্যবস্থাও তারা করে। এরকম একটা কিছু হতে পারে অনুমান করে পরাশর এবং আই. বি. আগে থেকেই অবশ্য তৈরি ছিল। চৌহান সকাল থেকে যে ঘরে সাধারণত কাজ করে তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধই থাকে, কিন্তু কাচের বড় জানলার পাশেই চৌহানের কাজের টেবিল এমনভাবে রাখা যে কাচের ভেতর দিয়ে তার চেহারা প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের ভেতরে না ঢুকেও কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে তাকে গুলি করার তাই কোনও বাধাই নেই। চৌহানকে সেইভাবেই গুলি করা হয়েছে, শুধু আগের কাচটার বদলে তার জায়গায় বুলেট প্রুফ কাচ যে বসানো হয়েছে এইটেই খুনি কল্পনা করতে পারেনি।'

'কিন্তু এসব কথা শোনাবার জন্যে আমায় ডাকা হয়েছে কেন?' মি. লাহিড়ীর বিবরণের মাঝে হঠাৎ ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল বৃজলালজির, 'পুলিশ কি যা খুশি করতে পারে?'

'না, তা পারে না, বৃজলালজি।' মি. লাহিড়ী শান্ত স্বরে বললেন, 'শুধু এ চক্রান্তের কয়েকটা জট ছাড়াবার জন্যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে—ভীমরাজের ওপর আপনি কত টাকা খেলেছিলেন?'

'আমি বলব না।' বৃজলালজি প্রায় গণ্ডারের চেহারা নিয়েই বললেন।

'না বললেও বুকিদের খাতা থেকে তা আমরা বার করে নিতে পারব বৃজলালজি,' পরাশর বললে, 'আমরা শুধু জানতে চাইছি হঠাৎ ভীমরাজের জন্যে এত খেপে উঠলেন কেন, আর ভীমরাজ ছাড়া অন্য কোনও ঘোড়া খেলেছেন কি না!'

'অন্য ঘোড়া খেলব!' বৃজলালজি এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন রাগে, আফসোসে, 'টাউটের কাছে চোরা খবর পেয়ে মাঠে গিয়ে তিনের দর পেলাম, তারপর দর নামতে নামতে যখন ইভনস্ হয়ে অডস্ অন-এ পৌঁছল তখন খবর খাঁটি মনে করে পাগল হয়ে খেললাম। বিশ হাজার টাকা আমি খেলেছি, জানেন, বিশ হাজার টাকা! তার কত যে কাটা যাবে কে জানে!'

বৃজলালজির শেষ কথাটায় প্রায় আর্তনাদের সুর। সেটা থামতেই অন্য মহিলাটির একটু আদুরে অভিমানের কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিন্তু আমায় কেন ডেকেছেন তা তো বুঝতে পারছি না—'

'আপনাকে ডেকেছি, লীনা দেবী, শুধু সাক্ষ্য দেবার জন্যে,' বললেন লাহিড়ী।

'সাক্ষ্য!!' লীনা দেবী হতভম্ব হয়ে সকলের দিকে তাকালেন। তখনই নামটা শুনে আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক, এই আহ্লাদী চেহারার লীনা দেবীকেই পেমেন্ট নেবার জানালায় আগে টিকিট ভাঙাবার আবদার করতে দেখেছিলাম, পরে দোতলার বার-এও রঞ্জার সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছি।

'কী সাক্ষ্য আমার কাছে চান?' লীনা দেবী প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে এবার লতানো ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'রঞ্জা দেবীর হাতে ওই ব্যাগটা আপনি আজ কোর্সে দেখেছিলেন কি না!' বেশ একটু যেন কড়া গলায় পরাশরই সোজাসুজি প্রশ্নটা করলে।

'ওই ব্যাগটা!' লীনা দেবী কয়েক সেকেন্ডের জন্যে যেন একটু দ্বিধায় পড়ে তারপর উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই ব্যাগটাই তো ছিল রঞ্জার হাতে।'

'ব্যস, আর কিছু আপনার কাছে জানবার নেই। আপনি যেতে পারেন, লীনা দেবী। আপনিও বৃজলালজি।' মি. লাহিড়ীই অনুমতি দিলেন।

বৃজলালজি আর লীনা দেবীকে যেতে গিয়েও একটু থামতে হল।

'একটু দাঁড়ান, লীনা দেবী!' মি. লাহিড়ীই অনুরোধ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নিজের হ্যান্ডব্যাগটা কোথায়! আপনি কি খালি হাতে মাঠে গিয়েছিলেন নাকি!'

'আমি!—আমি—' লীনা দেবীর মুখটা হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'না, না, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই,' মি. লাহিড়ী যেন আশ্বাস দিলেন, 'হুবহু ঠিক রঞ্জা দেবীর মতোই আপনার হ্যান্ডব্যাগটাই তো ওই ওঁর কাছেই রয়েছে। আর বার-এ কয়েক মিনিট গল্প করবার সময় রঞ্জা দেবীর সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে তাঁর যে হ্যান্ডব্যাগটা বদলে নিয়েছিলেন সেটা সঙ্গে রাখতে সাহস না করে নীচের লেডিজ রুম-এ ফেলে এসেছেন। সে হ্যান্ডব্যাগও আমরা পেয়েছি।' একটু থেমে যেন সুখবর শোনাবার ভঙ্গিতে মি. লাহিড়ী বললেন, 'আপনাকে তাই একটু বসতে হবে, লীনা দেবী। আপনার মতো দামি লিঙ্ক যখন পেয়েছি তখন আপনার সুতো ধরে আপনাদের সমস্ত গ্যাংটাকেই জালে টেনে তুলতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি, বসুন—আপনি বসুন।'

'আর তুমি এবার যেতে পারো, রঞ্জা, অবশ্য তোমার হাতের ওই ব্যাগটাকে রেখে।' হেসে

এবার বললে পরাশর, 'মনে হচ্ছে নতুন একটা বাহারি ব্যাগ তোমায় কিনতে হবে, কারণ তোমার যে ব্যাগটা কোর্সের লেডিজ রুম পাওয়া গেছে, সেটা পুলিশ এখন হাতছাড়া করবে না। আমার মনে হচ্ছে চৌহান নতুন ব্যাগ পছন্দতে তোমায় সাহায্য করতে যেন উদগ্রীব।'

পরাশরের দিকে একটা ঘুসি ছোঁড়ার ভান করে চৌহান রঞ্জাকে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

তারা চলে যাবার পর আমার দিকে ফিরে পরাশর গম্ভীর হয়ে বললে, 'সামান্য একটা ভার দিয়েছিলাম—তা-ও কিন্তু তুমি সামলাতে পারোনি কৃত্তিবাস!'

'কেন! কেন!' আমি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হলাম।

'তোমায় রঞ্জার ওপর নজর রাখতে যে বলেছিলাম সে কি তাকে সন্দেহ করি বলে?' পরাশর এবার হাসতে হাসতে বললে, 'তার সঙ্গে কারা ঘেঁসাঘেঁসির চেষ্টা করে তাই জানবার জন্যে। তুমি বদমেজাজি ও দাম্ভিক বলে বৃজলালজিকে লক্ষ করেছ, কিন্তু লীনা দেবী তোমার চোখের ওপরেই যে রঞ্জার ব্যাগটি বদলেছে তা খেয়াল করোনি।'

এ কথার আর কোনও জবাব খুঁজে পেলাম না।

'কে বললে ব্যাগ আমি বদলেছি? কী তার প্রমাণ?' লীনা দেবী হিংস্র মুখে যেন আমার হয়ে জবাব দিলেন।

pathagar.net